

পরিমল গোস্বামীর  
শ্রেষ্ঠ

ব্যঙ্গ-গল্প



পরিমল গোস্বামী

*If you want to download  
a lot of ebook,  
click the below link*



**Get *More*  
Free  
eBook**

**VISIT  
WEBSITE**

*[www.banglabooks.in](http://www.banglabooks.in)*

**click here**



পরিমল গোস্বামী

শ্রেষ্ঠ

ব্যঙ্গ - গল্প

পরিমল গোস্বামী

বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ

২৫১২, মোহনবাগান মো, কলিকাতা-৪

বহুত্ব প্ৰাৰ্থনা ভবন লক্ ২৫১২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪  
হইতে শ্ৰীশক্তিৰুমাৰ ডাছডী কৰ্ছক প্ৰকাশিত  
প্ৰথম প্ৰকাশ মাৰ্চ, ১৯৫৪

মূল্য : পাঁচ টাকা

শনিৰঞ্জন প্ৰেস, ৫৭ ইন্দ্ৰ বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭  
হইতে শ্ৰীবৰ্জেনকুমাৰ দাস-কৰ্ছক মুদ্ৰিত

## পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গ গল্প

পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গ গল্পের আমি একজন অনুরাগী পাঠক, অবশ্য আরও অনেকে আছেন। পরিমল বাবু ও আমি প্রায় একই সময়ে লিখিতে আরম্ভ করি, তারপরে আমাদের দুজনের রচনার ধারা দুই ভিন্ন দিকে গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার রচনার প্রতি আমার অনুরাগ বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

বর্তমানে হাসির গল্প ও ব্যঙ্গ গল্পের লেখকের অভাব নাই। সকলের উপরে আছেন পরশুরাম। আরও আছেন বনফুল, বিভূতি মুখুজে, শিবরাম চক্রবর্তী, অ-কু-ব বা অজিতকৃষ্ণ বসু। সম্প্রতি গৌরকিশোর ঘোষ বা রূপদর্শী প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই রচনারীতি ভিন্ন। ইহাদের সকলের গল্পেই কিছু কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের মিশাল আছে, কিন্তু পরিমলবাবুই বোধ হয় একমাত্র লেখক যিনি নিছক ব্যঙ্গ গল্প লিখিয়া থাকেন।

পরিমল বাবুর ব্যঙ্গ গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ব্যঙ্গ ইম্পাতের ছোরার ন্যায় অত্যন্ত হৃদকায়, তাই বলিয়া ধার কম নয়, এবং উজ্জলতাও যথেষ্ট। ইম্পাতের ছোরাখানা লেখকের কোমরবন্ধে কোথায় যে লুক্কায়িত সব সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না, হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া আঘাত করে, আবার বিদ্যুতের চমকের মত মেঘাস্তরালে মিলাইয়া যায়। এই জন্তই তাহা ব্যঙ্গের তলোয়ারের চেয়ে বেশি মারাত্মক। যে আঘাত পায় সেই বিভ্রান্ত ব্যক্তি যখন বিশ্বয়ে এদিক ওদিক সন্ধান করে, আর সকলে হাসিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ সতর্কতাও অবলম্বন করে।

অত্যন্ত পরিচিত ও সাধারণ ঘটনাকে উন্টাইয়া লইয়া পরিমলবাবু ব্যঙ্গ গল্পের কারবার করেন। মনে কখন এক সময় লোকে বিলাত-ফেরৎকে 'একঘরে' করিত, এখন কালের বদল হইয়াছে, বিলাতে এখন কে না যায়। এক গ্রামের লোকে সকলেই বিলাত ফেরৎ কেবল একজন ছাড়া। সকলে মিলিয়া তাহাকে 'একঘরে' করিল, বিলাত না মাইবার অপরাধে। তখন সে সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া পুনরায় জাতে উঠিল এবং শীঘ্রই বিলাত যাইবে স্বীকার করিল। এই যে প্রচলিত রীতিকে উন্টাইয়া লইয়া ব্যবহার ইহাই পরিমলবাবুর অধিকাংশ গল্পের সাধারণ কাঠামো। অঙ্গের বৈপরীত্যই ব্যঙ্গ। পরিমলবাবুর প্রায় প্রত্যেক গল্পকে উন্টাইয়া লইলেই একটি 'সিরিয়াস' গল্প হইতে পারে। এ বিষয়ে তিনি বিখ্যাত লেখক স্টিফেন লিককেয় নগোয়ত্র।

পরিমলবাবুর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-গল্প সকলের আবশ্যক ছিল। প্রকাশক সেই কাজটি করিয়া রসিক সমাজের ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। এখানে আশা করিতেছি যে, পাঠক সমাজ বইখানির আদর করিয়া নিজেদের সম্বোধের পরিচয় দিবেন।

## নিবেদন

অধিকাংশ গল্পবই প্রেৰণা সমসাময়িক ঘটনা, সেজন্য গল্পের সঙ্গে তারিখ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে সংকলিত ৩৭টি গল্পের পটভূমি গত কুড়ি বছরের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ব্যাপ্ত। গল্পের ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে পার্থক্য তাতেও লেখকের হয় তো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ছাপ।

রচনাকালের ক্রম অনুযায়ী গল্পগুলি ছাপা হলে ভাল হত, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি, সেই ক্রটি সূচীপত্রে সংশোধন করা হল।

মুদ্রণপ্রমাদ সামান্য দু'চারটে আছে, এটি এদেশে অনিবার্হ। যে দিন নিতুর্ল মুদ্রণে বাংলা বই প্রকাশিত হবে সে দিন জাতীয় উৎসবের দিন।

বিহার সাহিত্য ভবনের শ্রীশক্তিধর ভাড়াই গ্রন্থ নির্বাচনে ব্যঙ্গ কৌতুকের দিকে ঝুঁকেছেন, সেজন্য এই গল্পগুলি বাছাইয়ের ব্যাপারে ব্যঙ্গের লেশমাত্র গন্ধ পেলেও সেটিকে তিনি হাতছাড়া করেন নি। “শ্রেষ্ঠ” নামও তাঁরই দেওয়া।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় শ্রীকালীকির ঘোষ দত্তিদার এবং আক্ষরিক অংশে শ্রীশ্যামদুলাল কুণ্ডুর সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করছি।

কলিকাতা  
বার্চ ১৯৫৫

পরিমল গোস্বামী

श्रीगुरुनेकुमार चठोपाध्याय  
श्रीडिडानेव

## রাসায়নিক ক্রমিক সূচী

গ্যান	১২৩৩	...	২২
মার্কিন সিনেমা-সাব	১২৩৪	...	২২০
সাদু হীরালাল	১২৩৫	...	১
বৈবাহিক বৈচিত্র্য	১২৩৭	...	১২
মৃত্যুভয়	"	...	২৫
রূপান্তর	১২৪৫	...	১০
একটি দেবনৈতিক গল্প	"	...	১৪৬
স্বর্গীয় সমস্তা	"	...	১৭০
বাহার সালের পূজা সংখ্যা	"	...	১৭৬
সর্বানন্দ পরিবারের কথা	"	...	২০০
নারায়ণদার অনশন	১২৪৬	...	৮০
আধাভৌতিক	"	...	৮২
নতুন পরিচয়	"	...	১০২
প্রতিযোগ	"	...	১১২
ফেল	"	...	১২৩
কমন সেন্স	"	...	১৮৩
তিনি	১২৪৭	...	২৮
মুক্তির স্বাদ	"	...	১৪২
আলিবাবা ও ব্রহ্মবিলাস	১২৪২	...	৩৬
একটি অর্থনৈতিক গল্প	"	...	৭২
সেকাল ও একাল	"	...	২৩২
আগস্তকের ডায়ারি	"	...	২৩৮
মতাই কি প্রয়োজন	১২৫০	...	৬৪
বাটখারা	"	...	৬৮
ডেলকি	"	...	১২২
বিবাহে চ ব্যতিক্রম:	"	...	১৬২
আমাদের "জন্মস্থল"	"	...	১৬৭
অমরত্বের পর্যতাল্লিশ বৎসর	"	...	১২২
বাস্তবহারা	"	...	২১৩
প্রায়শ্চিত্ত	১২৫১	...	১৫২
প্রথম দৃশ্য	"	...	২৮২
কাউকে বলো না	১২৫২	...	৪৫
দান প্রতিদান	"	...	৬০
ক্যা হ্যা	"	...	৮৫
বহুরূপী	"	...	১৩৮
বুমেরাং	১২৫৩	...	৫১
নতুন দাওয়াই	"	...	২৩৫



# সাধু হীরালাল

১

হীরালাল যখন স্কুলে পড়ে, তখন সে মনে করিয়াছিল বড় হইয়া উকিল হইতে হইবে, কারণ তাহার পিতা উকিল ছিলেন। উক্ত হীরালাল যখন স্কুল ছাড়িয়া কলেজে ভর্তি হইল তখন তাহার মত বদলাইয়া গেল, কারণ সে তখন বিজ্ঞান পড়িতেছে। তাহার মনে হইল, এম. এস-সি. পাস করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবে। কিন্তু আই. এস-সি. পাস করিয়া তাহার সে মতও পরিবর্তন হইয়া গেল। কারণ এই সময়ে তাহার বিবাহ হইল।

হীরালাল বি. এস-সি. পড়িতে পড়িতে স্থির করিল, কোনো রকমে পাসটা করিয়া ফেলিতে পারিলে মন দিয়া একবার সংসার করিয়া দেখিবে। স্ত্রীকে ছাড়িয়া বৎসরের মধ্যে ছয় মাস বিদেশে কাটানো তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য বোধ হইল। বিজ্ঞানের ছাত্র হইলেও হীরালালের মনটা ছিল অত্যন্ত নরম। এই কাহিনীটা উপমা প্রয়োগ করিয়া ইয়ার্কি করিতে কবিত্তে বলিবার মতো হইলে বলা যাইত—মনটা ছিল তাহার জমানো শর্কবার একটি খণ্ড। তাহার এক প্রান্ত তরল পদার্থে ডুবিয়া গলিয়া যাইতেছে, অপর প্রান্তটি এখনও কঠিন আছে। কিন্তু কাহিনীর গুরুত্ব উপমা প্রয়োগের উপযুক্ত নহে, সেজন্য পাঠক ক্ষমা করিবেন।

হীরালাল যথাসময়ে বি. এস-সি. পাস করিয়া একবার পশ্চাতে চাহিল। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-টিঙ্কিত পথ সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে তাহার দিকে চাহিয়া সে একটু হাসিল মাত্র। হানিয়া সম্মুখে চাহিল। দেখিতে পাইল, সম্মুখভাগে মাসে তিন শত টাকা উপার্জনকারী পিতা বৈতরণী পার হইতেছেন।

হীরালাল মুহূর্তকাল চোখ বুলিয়া অগ্র এবং পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিল, এবং দেখিয়াই বুলিতে পারিল চাকুরি চেষ্টায় পথে পথে ঘুরিতে হইবে, মন দিয়া সংসার করা আর তাহার হইবে না। কিন্তু কথাটা হীরালালের নিজের কাছেও কেমন হাস্তকর বোধ হইল। কারণ সে অহরহ গুণিতেছে, মেন্স্যাক্সি দশটা-পাঁচটা অফিসে থাকে সে সংসারী, আর যে-ব্যক্তি বাড়িতে বসিয়া থাকে সে বিবাগী। হীরালাল যেটা সংসার মনে করিয়াছিল, সর্বজনীন ভাষায় সেটা আশ্রম। আশ্রম!—কি নিষ্ঠুর পৃথিবী!

যথাসময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া হীরালাল চাকুরির চেষ্টায় দিন কাটাইতে লাগিল। চাকুরি কিছুতেই মিলিল না। কাগজের 'অন্টোড'-কলম দেখিয়া দরখাস্ত দিলে চাকুরি মেলে না ইহা সে জানিত, তবু একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। অপরপক্ষে বাড়িতেও তো আর বসিয়া থাকা যায় না। হীরালাল তথাপি বাড়িতে বসিয়াই কিছু কিছু লেখা অভ্যাস করিতে লাগিল। মফঃসালের সংবাদদাতা হইয়া মাস তিনেক 'বিশ্বদূত' নামক বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ বিনামূল্যে লাভ করিল, তাহার বেশি কিছু হইল না।

একটি কঙা তাহার এখনও বাকি ছিল। এমন দেখা যায়, লোকে কোনো একটা কিছু লাভ করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই তাহা লাভ করিতে পারিতেছে না। তখন লোকে মবীয়া হইয়া ওঠে। এবং দেখা যায় মবীয়া হইয়া উঠিলেই প্রার্থিত বস্তু লাভ করিতে পারে। হীরালালের এই কৌশলটি জানা ছিল। সে এখন এই কৌশলটিই প্রয়োগ করিল। সে মবীয়া হইয়া শহরে চলিয়া আসিল এবং মবীয়া হইয়া 'বিশ্বদূত'-সম্পাদকের কাছে কাঁদিয়া পড়িল—যে কোনো একটা কাজ দিতেই হইবে।

সম্পাদক মহাশয় সামান্য পঁচিশ টাকা বেতনে সংবাদ-অনুবাদের কাজে হীরালালকে নিযুক্ত করিলেন। ইহা ছাড়া সপ্তাহে একটি কবিতা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা সংবাদ ইংবেজী পত্রিকা লইতে সফলনের ভারও সে পাইল। ক্রমশঃ তাহার কাজের উন্নতি হইল। বেতন বাড়িয়া ক্রমশঃ চল্লিশ হইল এবং বিজ্ঞাপন বিভাগও তাহার হাতে আসিতে লাগিল।

কাজ যখন কোথাও ছোটে না, তখন পঁচিশ টাকার কাজ দুর্লভ বলিয়া বোধ হয়, পরে চাকরিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে চল্লিশ টাকা তুচ্ছ হইয়া যায়। তাহাদেরই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া কত অশিক্ষিত লোক কত টাকা উপার্জন করিতেছে, আর সে বি. এস-সি পাস কবিতা সামান্য চল্লিশ টাকা উপার্জন করে। এক মিনিটের চিন্তার ফলে চাকরিতে তাহার দিক্কার আসিল।

এমন সময় সেই শহরে হিম সাধু নামক এক সাধুর আবির্ভাব হওয়াতে সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। সাধু হিমালয় হইতে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হিম সাধু। হিম সাধু অলৌকিক ক্রিয়ায় সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহার সংবাদ প্রতি সপ্তাহে বড় বড় আন্দরে 'বিশ্বদূতে' ছাপা হইতে লাগিল। হিম সাধু দশ হাত শূণ্ডে ঝুলিয়া থাকিতে পারেন, ষতদিন

ইচ্ছা অনাহারে বাঁচিতে পারেন ; হিম সাধু কুকুরকে বিড়াল এবং বিড়ালকে ইঁদুর বানাইতে পারেন। তিনি স্বয়ং ময়ূর হইয়া পঞ্চম তুলিয়া নাচিয়া হাজার হাজার লোককে মুগ্ধ করিতেছেন একরূপ সংবাদ 'বিশ্বদূতে' ছাপা হইল। প্রফ দেখিতে দেখিতে হীরালালের হঠাৎ মনে হইল, হায়, সেও যদি ময়ূর হইয়া নাচিতে পারিত !

হীরালালের মন টলিতে লাগিল। একটিমাত্র নিদ্রাহীন রজনী ভোর করিয়া হীরালাল হিম সাধুব সঙ্গে দেখা করিয়া আসিল। হিম সাধু এক মাস শহরে ছিলেন, হীরালাল প্রতিদিন একবার করিয়া দেখা করিল। সাধু খুশি হইয়া বলিলেন, আগামী চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে হিমালয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিস, তোকে দীক্ষা দেব।—বলিয়া তাহাকে তাঁহার ঠিকানা লিখিয়া দিলেন।

আগামী চৈত্র সংক্রান্তি। সে যে পুরা এক বৎসর ! কিন্তু এদিকে যে হীরালালের মন উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে—টাকার কল্পনায় সে চঞ্চল—সে যে আর চাকরি করিতে পারিবে না। শর্করাথণ্ডেব যে দিকটা গলিবার উপক্রম হইয়াছিল সেই দিকটা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিল। আব তো বাঁশীব আওয়াজ নয়, সে এবারে চৈত্র-সন্ন্যাসীর শিঙার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছে।

হীরালাল কিছুদিন হইতে অসাধা কিছু করিবাব কল্পনা করিতেছিল বটে, কিন্তু কল্পনা একপ স্পষ্ট রূপ লইয়া ইতিপূর্বে আর দেখা দেয় নাই। যদি কার্ঘ্য পরিণত হয় তাহা হইলে তাহাব উচ্চাশা কিছু পূর্ণ হইতে পাবে। হীরালাল সম্পাদকের সঙ্গে পাঁচ-ছয়দিন ধরিয়া নানাকরূপ পরামর্শ করিল। সম্পাদক অবশেষে বুঝিলেন হীরালালের প্ল্যানে লাভ ছাড়া লোকসান নাই এবং তাহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

৩

পর-সপ্তাহেই 'বিশ্বদূতে' একটি অভিনব সংবাদ বাহির হইল :—

“পুনরায় অলৌকিক সাধুর আবির্ভাব। বিশ্বস্তমূত্রে জানা গিয়াছে যে, শহর হইতে দুই মাইল দক্ষিণে যে জঙ্গল আছে সেখানে রজনী-বাবা নামক বিখ্যাত সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে ! তিনি দিনে ষোল আনা অদৃশ্য হইয়া যান, রাত্রে দেখা দেন। রাত্রে দেখা দেন বলিয়াই তাঁহার নাম রজনী-বাবা। রাত্রি বারোটায় পর জঙ্গলের কেন্দ্রস্থলে আগুন জলিবে। সেইখানে গেলে তাঁহার দর্শন মিলিবে। এই সাধুর বিশেষত্ব এই যে, ইহার কাছে যে যাহা প্রার্থনা

করিয়ে ইনি তাহাকে তাহাই দিবেন। ইনি মস্তপুত একটি দ্রব্য দান করেন। এই দ্রব্য কবচে ধারণ করিলে এক বৎসর পরে কামনা পূর্ণ হয়।

“ইনি স্বদীর্ঘ এক শত বৎসর আমেরিকায় ছিলেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক ইহারই রূপায় কোটিপতি হইয়াছে। ইহার সংবাদ এতদিন প্রকাশ করা নিষেধ ছিল, এখন আর সে নিষেধ নাই। এক শত বৎসর আমেরিকায় বাস করিলেও ইনি খাঁটি বাঙালী। বাংলা কথা সবই বুঝিতে পাবেন, কেবল বলিতে পারেন না। মস্তপুত দ্রব্যের মূল্য বাবদ মাত্র চারি আনা দিতে হয়।

“সাবধান। সাবধান।।

“সাবধান, কেহ রাত্রি বারোটোর পূর্বে কিংবা রাত্রি তিনটার পরে জঙ্গলে থাকিতে পারিবে না। থাকিলে তাহার কামনা ব্যর্থ হইবে। বজ্রনী-বাবার বয়স কেহ অনুমান করিতে পারে না, কেহ বলে দুই শত, কেহ বলে তিন শত বৎসর। কেহ ইহা অপেক্ষাও বেশি মনে করে। সাবধান, দুই শতের কম কেহ অনুমান করিও না, করিলে কামনা ব্যর্থ হইবে।”

‘বিশুদ্ধ’ প্রতি শুক্রবারে বাহির হয়, সূত্রাং সম্পাদক অনুমান করিলেন, শুক্রবার রাত্রি হইতেই সাধুদর্শনের ভীড় আরম্ভ হইবে। সেজন্য যথারীতি বন্দোবস্ত করা হইল। হীরালাল বুবার রাত্রি হইতেই জঙ্গলে গিয়া আগুন জ্বালাইতে লাগিল। সে বৈজ্ঞানিক রীতিতে মাটির নীচে লুকাইয়া থাকিবার একটি গর্তও প্রস্তুত করিল। গর্তের উপরে খড়ের ঢালা উঠিল, গর্তটা সে গোপনে নিজ হাতে খুঁড়িল। এই সব প্রাথমিক কাজেব জগ্ন সম্পাদক তাহাকে তিন দিনের ছুটি দিয়াছিলেন। কোনো হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিলে আত্মরক্ষা করিতে হইবে,” গর্তের উদ্দেশ্য ইহাট।

বন্দোবস্ত পাকা বৈজ্ঞানিক রীতিতে হওয়ায় সম্পাদক নিশ্চিত হইলেন। হীরালাল যথারীতি শুক্রবার রাত্রি দশটার সময় জঙ্গলে গিয়া বসিল। সঙ্গে ঘড়ি ছিল। ঘড়িতে এগারোটা বাজিল, হীরালাল মুখে দাড়ি এবং মাথায় চুল পরিল। ঘড়িতে সওয়া এগারোটা বাজিল, হীরালাল নিজের কাপড় জামা গর্তে লুকাইয়া রাখিয়া কোপীন পরিল। ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজিল, হীরালাল গায়ে ভস্ম মাখিয়া সংগৃহীত কাঠের স্তূপে আগুন জ্বালাইয়া দিল। বারোটা বাজিয়া পনেরো মিনিট হইতে না হইতে প্রার্থীদের কোলাহলে জঙ্গল মুখরিত হইয়া উঠিল।

পরদিন সকাল আটটার মধ্যেই সম্পাদকের সঙ্গে হীরালালের দেখা হইয়া লভ্যাংশ ভাগ হইয়া গেল। মোট আয়ের পরিমাণ ৫০ টাকা। প্রাথমিক খরচ বাদ গেল ১০ টাকা। রিজার্ভ ফণ্ডে গেল ১০ টাকা। বাকী রহিল ৩০ টাকা। ৩০ টাকা দুই ভাগে ভাগ করিয়া হীরালাল নিজের ১৫ টাকা আর সম্পাদককে ১৫ টাকা দিল। সম্পাদক প্রথম দিনেই ১৫ টাকা পাইয়া পরবর্তী দিনগুলির কথা স্মরণ করিলেন। তাঁহার এত আনন্দ হইল যে, হীরালালকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া তিনি তাহার গণ্ডস্থলে চুম্বন করিলেন। এইরূপে 'বিশ্বদূত'র প্রচারগুণে প্রত্যেকের প্রতি রাতে পঞ্চাশ-ষাট টাকা করিয়া লাভ হইতে লাগিল।

কিন্তু কবি বলিয়াছেন, মানুষের চিরদিন সমান যায় না। কবি এ কথা কেন বলিয়াছেন, তাহার কারণ অজ্ঞাত। মনে হয়, না বলিলেই ভাল করিতেন। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। বৈচিত্র্য এখন মানুষের 'চিরদিনে' একরূপ জোর করিয়াই প্রবেশ করিতেছে।

হীরালালের অদৃষ্টে এই স্তব্ধ টিকিল না। সে ক্রমাগত অসাধু উপায়ে সাধু সাজিয়া নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। বিরক্তির প্রধান কারণ লাভের অর্ধেক অংশ অকারণ সম্পাদককে দিতে হয়। ব্যবসায়ের মূল নীতি অনুসারে ইহা অগ্ৰায় নহে, কিন্তু দুইজনের ব্যবসায় দুইজনেই ম্যানেজিং এজেন্ট ইহা তাহার ভাল লাগিল না। তদুপরি রজনী-বাবা সম্পর্কে যাবতীয় প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্র তাহাকেই লিখিতে হয়, সম্পাদক কিছুই লেখেন না। একজন কর্মী একজন উপস্থিতভোগী ইহা তাহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সে ভুলিয়া গেল যে 'বিশ্বদূত' কাগজ তাহার নিজের নহে, অথচ এই কাগজের প্রচারের ফলেই তাহার এই ভাগ্য পরিবর্তন।

হীরালাল কর্তব্য স্থির করিল। অর্থাৎ সে একদিন আর জঙ্গল হইতে ফিরিল না। সে সেদিন পূর্বার্জিত সমস্ত টাকা (সমস্তই নোটে রূপান্তরিত) এবং সেই রাত্রেই উপার্জিত প্রায় চারি শত সিকি লইয়া রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় নিরুদ্ধেশ হইয়া গেল। নিরুদ্ধেশ হইবার দিন যাহা ঘটয়াছিল তাহা এই—

বৃহস্পতিবার রাত্রে জঙ্গলে যাইবার পূর্বে হীরালাল লিখিল, "ভয়ানক সংবাদ! রজনী বাবা কোনো অজ্ঞাত কারণে অন্তর্ধান করিয়াছেন। আবার কবে ফিরিবেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। দুই শত বৎসরের পূর্বে ফিরিবেন

•

## পরিমল গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-গল্প

একপ আশা নাই।” (কম্পোজিটারগণ ইহা ছাপিতে গিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু হীরালাল বলিয়াছিল, বঙ্গনী বাবার নিজস্ব সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন, এবং বলিয়া দিয়াছেন কাগজে ছাপার আগে এ সংবাদ যেন প্রকাশ না হয়। এ কথা শুনিয়া তবে কম্পোজিটারগণ আশ্বস্ত হয়।)

হীরালাল লেখার শেষ প্রফ দেখিয়া ছাপিবার অর্ডার দিয়া তবে অফিস হইতে বাহির হইল, এবং ঐ তাহার শেষ বাহির হওয়া।

হীরালাল সোজা নিজের গ্রামে গিয়া উঠিল। পথে তাহার মনে হইয়াছিল এইবার কিছুদিন শান্তিতে থাকা যাইবে, কিন্তু দুই দিন যাইতেই হীরালাল বুঝিতে পারিল সংসার মরুভূমি এবং শান্তি মরীচিকা।

টাকার পথে সে যে আলো দেখিয়াছিল, গৃহের পথে সে আলো নাই। গৃহ ছায়ায়, অর্থাৎ বিষাদময়, অর্থাৎ বিষময়। তাহার খাসবোধ হইবার উপক্রম হইল। বন্ধনে তাহার মুক্তি মিলিল না। সে হিমালয়ের সাব্ব কথা চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে তাহার মন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং ক্ষিপ্ততার উগ্রতায় সে একদিন ধুমন্ত স্ত্রীকে ফেলিয়া চৈতন্যদেবের মতো গৃহত্যাগ করিয়া গেল।

গ্রামে প্রচার হইয়া গেল, হীরালাল মল্ল্যাসী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক মাস পরে হীরালাল নিজে ঠিকানাহীন একখানা চিঠি দিয়া জানাইল, সে মাধু হইয়াছে। চিঠিখানা অবশ্য চৈত্র সংক্রান্তির পরে লেখা।

৫

কছুদিন পূর্বে শিলিগুডি অঞ্চলে অতিকায় মানুষের পায়ের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ শঙ্কিত হইয়াছিলেন, এবং ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, উহা কিং-কংএর পদচিহ্ন। কিন্তু কিং-কংএর পদচিহ্ন যে নহে তাহার একটি কারণ কিং-কং বলিয়া বাস্তব জগতে কোনো অতিকায় প্রাণী নাই। সিনেমা-জগতে কিছুদিন আগে এক কিং-কংএর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, কিন্তু সে কিং-কংএর পা ছিল না এবং পা ছিল না বলিয়া পদচিহ্নও ছিল না। সিনেমায় ঐহারা কিং-কং দেখিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না—যখন কিং-কংএর বিরাট মূর্তি দেখানো হইতেছিল, তখন তাহার পায়ের দিকটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য ছিল। হাঁটু পর্যন্ত স্পষ্ট ছিল তাহার নীচের অংশ স্বচ্ছ হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ সিনেমার কিং-কং অতিকায় মানুষ নহে, অতিকায় হুম্মান। তৃতীয়তঃ কিং-কং শব্দটির উৎপত্তি-স্থল চীন দেশ এবং চীন দেশের কোনো মানুষই অতিকায় নহে, তাহারা বেঁটে। সূত্রাং শিলিগুড়ি অঞ্চলের অতিকায় মানুষের পদচিহ্ন সম্বন্ধে 'আনন্দবাজারে'র সন্দেহ অমূলক।

আসল ব্যাপার কি তাহা বলিতেছি। হীরালাল যে দিন হিম সাধুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া রূপান্তরী বিচার কিয়দংশ আয়ত্ত করিল, সেদিন সে ঠিক করিল, এইবার তাহার দেশে ফিরিবাব সময় হইয়াছে। কারণ এইবার সে তাহার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ প্রকাশে দেখাইতে পারিবে। এইবার সে দর্শনী লাভ করিয়া কোটিপতি হইবে এবং অবশেষে একদিন সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট হইয়া মহামুখে কালযাপন করিবে। ইহা সে একপ্রকার স্থির করিয়া ফেলিল। কিন্তু দেশের একটি সংবাদ সে জানিতে পারিল না। সে জানিতে পারিল না যে, যে-‘বিশ্বদূত’ একবার তাহার উন্নতিব পথ পরিষ্কার কবিয়া দিয়াছিল, তাহার পলায়নের পব সেই ‘বিশ্বদূত’ ধীরে ধীরে তাহার সব শঠতার কথা কৌশলে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে। সে জানিল না যে, এতদিন সপ্তাহের পব সপ্তাহ ‘বিশ্বদূত’ তাহার জুবাচুবিব কথা প্রকাশ করিয়া গ্রাহক সংখ্যা চার-পাঁচগুণ বাড়াইয়া ফেলিয়াছে। কি করিয়াই বা জানিবে? হীরালাল সংবাদ-পত্রের জগৎ দূরের কথা, এতদিন সে মানুষের জগতেরই বাহিরে পড়িয়া ছিল। এতদিন সে ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘাব কয়েক হাজার ফুট নিচে হিম সাধুর আশ্রমে।

৬

হীরালাল মানুষের পৃথিবীর সংবাদ কিছুই না জানিয়া, একদিন কাঞ্চন-জঙ্ঘার জঙ্ঘা-প্রদেশ হইতে দেশের পথে যাত্রা করিল। মাটির পথে নহে, আকাশের-পথে। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির সূত্র অনুসারে সে নিজেব দেহকে এতদূর বাড়াইয়া লইল যাহাতে সেই বিশেষ ওজনের দেহটি আকাশপথে বিনা আয়াসে ঘণ্টায় এক শত মাইল উড়িয়া আসিতে পারে। তাহার দুইখানি হাত ডানায় পরিণত হইল। তারপর হীরালাল উড়িল। গভীর রাত্রে আকাশে কেহ চাহিয়া দেখিল না, আর দেখিলেও হয়তো মনে করিত বিমান উড়িতেছে।

শিলিগুড়ির কাছাকাছি আসিয়া হীরালালের বড় ইচ্ছা হইল একবার দেশের মাটি স্পর্শ করে। বহুদিন সে মাটি স্পর্শ করিতে পারে নাই। এক

জন্মের ধারে নামিয়া হীরালাল কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইল। মাটির স্পর্শ তাহার কাছে বড় মনোরম বোধ হইল। (এই স্থানের মাটিতেই সে তাহার অজ্ঞাতসারে পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল এবং এই পদচিহ্ন লইয়াই সংবাদপত্রে আলোচনা হইয়াছে।)

অবশেষে হীরালাল দেশে পৌঁছিল। হীরালাল ছাত্রজীবনে একদিন গৃহের প্রতি আকর্ষণ বশতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, মন দিয়া সংসার করিবে, অর্থাৎ একাগ্র মনে বাড়ি বসিয়া থাকিবে। কিন্তু সংসারের স্পর্শ পাইয়াই বুঝিয়াছিল সংসারের মায়া সম্পূর্ণ না কাটাঠলে সংসার করা দুঃসাধ্য। কিন্তু আজ তাহার অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। আজ সে হীরালাল নহে, সাধু হীরালাল। আজ সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সাধু হীরালাল। আজ সে পৃথিবীর সত্রাটের পদে অ্যাপ্রেণ্টিস হীরালাল, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই সত্রাট হীরালাল। স্মতরাং গৃহের প্রতি তাহার আকর্ষণও নাই, বিকর্ষণও নাই— আছে শুধু নবলক ক্ষমতা ব্যক্ত করিবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা।

সে আজ শুধু তাহার স্বীর উপর নহে, জগতের উপর প্রভুত্ব কবিত্তে আসিয়াছে। সে আজ লক্ষ লোকেব সম্মুখে মথর হইয়া নাচিবে, বিডাল হইয়া স্বীর কোলে বসিবে।

কিন্তু গৃহে পৌঁছিয়া এ সব কিছুই করিবার দরকার হইল না। দেখা হইবামাত্র স্বী নির্বোধের মত চিৎকান করিয়া কাঁদিয়া বলিল, “ওগো তোমাকে পুলিশে ধরবে গো—” ইত্যাদি। গ্রামস্থ লোক কাহ্না শুনিয়া জানিয়া গেল সাধু হীরালাল ফিরিয়া আসিয়াছে। স্মতরাং কথাটা পুলিশের কানে যাইতে দেবি হইল না। পুলিশ হীরালালকে ধরিতে আসিল। হীরালালের হাতে আর সময় নাই। এক মিনিটে কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। একবার মনে হইল পাখী হইয়া উড়িয়া যাইবে, একবার মনে হইল কীট হইয়া মাটিতে লুকাইবে। কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইবে? পুলিশ জানিবে হীরালাল অলৌকিক ক্ষমতাবশতঃ ফাঁকি দিল এবং কাঁচিয়াই রহিল—কোথাও শাস্তিতে থাকা যাইবে না। স্মতরাং পুলিশের আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিল, এবং পুলিশ যখন পাঁচশ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িল তখন তাহাদের সম্মুখে দিয়া হীরালাল ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। পুলিশ তাড়া করিল, হীরালাল ছুটিয়া গিয়া নদীতে ডুবিয়া গেল, আর উঠিল না। পুলিশ চেষ্টা করিয়াও আর তাহার সন্ধান পাইল না। সকলেই জানিল হীরালাল মরিয়াছে।

কিন্তু হীরালাল কি সত্যই মরিল? না, হীরালাল মরিল না, হীরালাল



কুমীর হইয়া জলে দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার স্ত্রী জলে স্নান করিতে গেলে একদিন মাত্র সে তাহাকে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এ-কথাও তাহার স্ত্রী সকলকে বলিয়া ফেলিল। তখন আবার দেশময় হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে দিনাজপুর জেলায় এক নদীতে কুমীর দেখা গেল, সকলে বলিল ঐ হীরালাল। একটা কুমীর মারা গেল, সকলে বলিল ঐ হীরালাল মারা গেল। এ দুইটি সংবাদই পাঠক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় পড়িয়াছেন।

আমল ব্যাপার কি, তাহা কেহ জানে না। হীরালাল মরে নাই। সে কুমীর অবস্থায় প্রায় সাত দিন জলে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিয়া পুলিশকে জব্দ করা যায়! একবার তাহার মনে হইল সম্ভ্রাসবাদী হইয়া ক্রমাগত পুলিশ ধরিয়া খাইবে। কিন্তু ইহা তাহার মনঃপুত হইল না। একবার ভাবিল কমুনিষ্ট হইয়া কলওয়ালাদের ধরিয়া ধরিয়া খাইবে। ইহাতে পুলিশ প্রকৃত অপরাধী ধরিতে না পাইয়া অপদস্থ হইবে। কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল সে মাধু হইয়াছে, সুতরাং যদি প্রতিশোধ লইতে হয়, মহৎ প্রতিশোধ লওয়াই ভাল। তাহার মাথায় একটা বুদ্ধিও খেলিয়া গেল, এবং নিজের বুদ্ধিতে খুশী হইয়া কুমীর অবস্থাতেও হীরালাল খানিকটা হাসিয়া লইল। ইহা এইবার ঠিক হইয়াছে! এইবার হীরালালকে তাড়া করা দূরে থাক, পুলিশ খতির করিয়া অস্ত পাইবে না। শুধু পুলিশ নহে, স্বয়ং বড়লাট তাহাকে খতির করিবেন। ইহাকেই বলে প্রতিশোধ।

হীরালাল জল হইতে এক লাফে স্টাড বুল হইয়া ডাঙায় উঠিয়া আসিল।

## রূপান্তর

বিজ্ঞান এসে ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত অনেক জিনিসই আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে অলৌকিক বলে মনে হয়। এই রকম একটি অলৌকিক কাহিনীর কথাই বলছি।

বেশি দিনের ঘটনা নয়।

বেভারেঞ্জ কিং আমাদের পাড়ায় থাকেন। একেবারে খাঁটি ইংরেজ এবং খাঁটি খ্রীষ্টান। সেবাস্বর্মে, অহংকারহীনতায়, বিনয়ে, আদর্শ পুরুষ। তাঁকে ভাল না বাসে এমন লোক আমাদের গড়িয়াহাটা অঞ্চলে নেই।

একটি দোতলা বাড়িতে তিনি থাকেন, কিন্তু নীচের তলাটি একটি গরিব পরিবারকে অতি শস্যায় ভাড়া দিয়েছেন—তত শস্যায় কলকাতায় এ রকম একতলা পাওয়া যায় না।

তিনি বিশেষ করে গরিবদের রক্ষা। তাঁর চোখে ছোটবড় ধনীদরিদ্রে ভেদ নেই, ভারতবাসী বলে কাউকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখেন না, সবাইকে বুকে টেনে নেন। রোগীর সেবা করেন নিজহাতে। বস্তী অঞ্চলে সবাই তাঁকে দেবতা বলে জানে।

প্রথম প্রথম আমরা ক'জন বন্ধু তাঁকে সন্দেহ করেছি, সেবাস্বর্মের আধরণে আসলে তিনি খ্রীষ্টানধর্ম প্রচার করতে চান। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সে ভুল আমাদের ভেঙেছে।

তাঁর সরল মনে কোনো কু-অভিপ্রায় থাকতে পারে না, আমরাও তাঁর কাছে আমাদের মনের কথা খোলাখুলি ভাবেই বলতাম। তিনি যে আসলে সেবাপ্রাপ্ত লোকদের খ্রীষ্টান করতেই চান, আমাদের মনের এই সন্দেহের কথাও একদিন তাঁকে বললাম।—

আপনি আমাদের এত উপকার করছেন, গরিব রোগীকে ওষুধ দিচ্ছেন, সহায়হীনকে আর্তকে নিজহাতে সেবা করছেন—এ পর্যন্ত বেশ ভালই, এ জগতে আমরা আপনার কাছে বিশেষভাবে ঋণী, কিন্তু শেষে যদি দেখি আমাদেরই কোনো বন্ধুকে আপনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন, তা হলে আপনার উপর আমাদের সবার শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাবে।

বেভারেঞ্জ কিং এ কথা উত্তরে হেসে বললেন, সে ভয় আপনার নেই, আমি থাইস্টের বাণী আমার কাজের ভিতর দিয়ে প্রচার করি—জনসেবার

ভিতর দিয়ে আমি তাঁরই সেবা করি, তার বেশি তো আমি কিছুই চাই না। আমার ধর্মে দীক্ষিত ক'রে অকারণ খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমি গৌরবের মনে করি না।

তিনি আরও বললেন, ধর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্তরের জিনিস, বাইরে একটা নাম তার থাকে বটে কিন্তু পৃথক ভাবে তার কোনো দামই নেই। কোটি কোটি খ্রীষ্টান আজ হিংসায় মত্ত, তারা খ্রীষ্টান হয়ে পৃথিবীর কি লাভ হ'ল ?

বেভারেণ্ড কিং-এর কাছে আমাদের মাথা নত হ'ল। এ রকম কথা একজন খ্রীষ্টানের মুখে এই প্রথম শুনলাম। আমরা তাঁর ভক্ত মাত্র ছিলাম, এবারে তাঁর অনুগত হয়ে পড়লাম। আমাদের মধ্যে শ্রীতি এবং অন্তরঙ্গতা এত বেড়ে গেল যে, শেষ পর্যন্ত আমরা কয়েকজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে রীতিমতো সেবার কাজ আরম্ভ করলাম।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে কাজ ক'রে আমরা পারব কেন ?

তাঁর শাদা চুলের নিচে যে শুভ বুদ্ধি এবং শাদা দাড়ির নিচে যে সহৃদয়তা ছিল, তা আমাদের প্রতিপদে লজ্জা দিতে লাগল। তাঁর ষাট বছর বয়সেও যে উদ্যম এবং কর্মপটুতা ছিল তাও আমাদের মতো যুবকদের মধ্যে কারো ছিল না।

তবু আমরা যতদূর সম্ভব তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর কাজে সাহায্য করতে লাগলাম। আমাদেরই প্রতিবেশীরা কি রকম দুঃস্থ অবস্থায় দিন কাটায় তা আমরা এতদিন দেখেও দেখি নি। অসুস্থ হ'লে তারা বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে মারা পড়ে—তা আমরা এতদিন এমন ক'রে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাই নি।

আমরা তাঁর জনসেবার রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে তাঁর কাছে কত কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। বলেছি, আপনি এদের জীবন দান করেছেন।

কিন্তু তার উত্তরে তিনি বলতেন, একজনকে দু'জনকে বাঁচিয়ে আপনাদের বিরাট ভারতবর্ষের দুঃখ ঘোচাব কি ক'রে ? আমি যে সেবা করছি, এ সেবার মধ্যে আমি সম্পূর্ণ গৌরব অনুভব করতে পারি না।

কেন ?—আমরা প্রশ্ন করি।

এদের যেমন সেবা করছি, তেমনি সেই সঙ্গে আপনাদের সবাইকে যদি এদের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে পারতাম তা হ'লেই আমার সেবা সার্থক হ'ত।

তারপর একটু থেমে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। বোধ হয় বুঝতে চেষ্টা করলেন—আমরা তাঁর কথাটির মর্ম ঠিক মতো গ্রহণ করে তপেয়েছি কি না। আমাদের দিকে চেয়ে তিনি কি বুঝলেন জানি না, তবে তিনি বলতে

লাগলেন, আপনাদের দেশের লোককে আপনারা অস্পৃশ্য ক'রে যেখেছেন, অথচ এ দেশের লোক তারা। আপনাদের কাছে তারা কিছুই পায় না। আমরা দু'র দেশ থেকে এসে আপনাদের অপরিচিত আদিবাসীদের মধ্যে গিয়ে যিশি, তাদের সেবা করি, তাদের সঙ্গে আধুনিক জগতের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করি, তারপর যখন আপনারা দেখেন ওরা আমাদের ভালবাসতে শুরু করেছে, তখন আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে লাগেন। কিন্তু বলুন তো আমাদের দোষ কি? আপনারা কোনো দিন যাদের স্পর্শ করেন না, চেনেন না, তারা যে আপনাদের দেশের লোক, একথা বলতে আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকের লজ্জা পাওয়া উচিত নয় কি?

লজ্জা যে পাওয়া উচিত এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না।

বেভাবেও কিং শুধু সেবকই নয়, তিনি মানুষ হিসাবে সব দিক দিয়েই মহৎ। তাঁর সঙ্গে কাজ ক'রে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করেছি। মানুষের সেবা করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি, এ কাজটি সহজ নয়। পদে পদে অসুবিধা আছে। যাদের সেবা করতে যাওয়া যায়, তাবা সন্দেহ কবে, তারাই অনেক সময় বাধা দিতে চায়। চারিদিকে সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে। উৎসাহ কমে যায়, মনে হয় কি দায় পড়েছে এ সব করবার!

কিন্তু যখনই উৎসাহ নিবে যায়, বেভাবেও কিং-এর কথা মনে পড়ে। তিনি সকল সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে মাথাটি সর্বদা তুলে ধ'রে আছেন। শিশুর মতো সরল হাসি তাঁর মুখে লেগে আছে। সে হাসি তাঁর অন্তরের পবন আনন্দের প্রতিফলন। সেই ছবিটি মনে জাগে। তখন আমরা আবার উৎসাহ পাই।

একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা জনসেবা আবশ্য কবেছিলাম, আমাদেরই বালিগঞ্জ অঞ্চলের এক বস্তীতে, কিন্তু আমাদের কর্মক্ষেত্র অল্পদিনের মধ্যেই বিস্তৃত হ'য়ে পড়ল।

তার কারণ জাপানী বোমা পড়তে শুরু করল কলকাতাবাসীদের মাথায়। দলে দলে লোক পালাতে লাগল শহর ছেড়ে। মানুষ ভয়ে যে কি পরিমাণ দিশাহারা হয়ে পড়ে, তার ব্যাপক ছবি দেখলাম এই প্রথম; যার যা কিছু ছিল—তাই নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু ট্রেনে চাপার পর দেখে, সম্পত্তির বারো আনাই নেই। ঘোড়ার গাড়ি, ট্যান্ডি, রিকশা সবাই দশগুণ বেশি ভাড়া নিয়েছে, তারপর টিকিট করার ব্যাপারে যার যা সাধ্য ঘুস দিয়েছে;

ট্রেনে একটু জায়গা-পাওয়ার জন্তেও প্রচুর টাকা দিতে হয়েছে, উপরন্তু কুলিরা মালপত্র নিয়ে স'রে পড়েছে। ট্রেনে ছেলেমেয়ে সবাই মিলে পদদলিত এবং নিষ্পিষ্ট হয়ে দেশে গিয়ে যেটুকু অবশিষ্ট রইল, তাও গেল সেখানে চোবের হাতে।

রেভারেণ্ড কিং একবার মাত্র বলেছিলেন, অসহায় লোকদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে এদেশের ভদ্র অভদ্র সবাই একসঙ্গে চোর হ'য়ে ওঠে—পৃথিবীতে আর কোনো দেশে এ রকম নেই।

তাঁকে এবারে অত্যন্ত বিচলিত দেখা গেল। আমাদের ক'জনের সাধো যতদূর কুলোয় ঝগড়া মারামারি ক'রেও পলায়মান যাত্রীদের ট্রেনে ওঠায় সাহায্য করতে লাগলাম।

সেদিন রাত নটা আন্দাজ সময় আমরা হাওড়া থেকে ফিরছি। আমরা ডালহৌসী স্কয়ারের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি আমরা যে যেখানে পারলাম গর্তে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোমা পড়তে শুরু হ'ল। মনে হ'তে লাগল বোমা সব আমাদের কাছেই পড়ছে—মৃত্যু অনিবার্য। ভাবতে ভাবতেই আমাদের গর্তের খুব কাছেই ভীষণ এক আওয়াজ!

রেভারেণ্ড কিং আশ্রয়ে ঢোকান আগেই বিপদের কথা ভেবে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলেন। কত লোক হয়তো মরবে, অথচ সে সময় বেরিয়ে কিছু করার উপায় নেই।

সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা পরে অল ক্রিয়ার বাজল। তখন বেরিয়েই নিজেদের কে কোথায় আছে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, সর্বনাশ হয়েছে। রেভারেণ্ড কিং অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন। এ-আর-পীর তৎপরতায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হ'ল, ডাক্তার বললেন, 'শক' পেয়েছেন, অবস্থা অনিশ্চিত।

উপায় কি? আমরা ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলাম।

ডাক্তার বললেন, দেখা যাক। বলেই চিকিৎসা শুরু করলেন।

রেভারেণ্ডের সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে বেশ কিছুদিন লাগল। হাসপাতাল থেকে তাঁকে বাড়িতে এনে আমরা দীর্ঘদিন তাঁর শুশ্রূষা ক'রে তাঁকে সবল ক'রে তুললাম এবং তিনি সবল হওয়া সহেও আমরা তাঁকে আরও দু'এক মাস বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলাম। তিনিও সহজেই রাজি হলেন এবং বললেন, কিছুদিন শুয়ে থাকতেই চাই, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে আর ইচ্ছে করছে না।

এ কথার অর্থ তখন বুঝতে পারি নি, কিন্তু পরে পেরেছি। তখন ভেবেছিলাম এত বড় একটা দৈহিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে তাঁর মনে অবসাদ

এসেছে। তাই মনে হ'ল তাঁকে নিয়ে যোজ্ঞ একটু একটু বেড়ানো দরকার। তিনি এতে সহজেই রাজি হলেন।

বেভারেও কিংকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেদিন ট্রামে উঠলাম। একটা খালি সীট পেয়ে আমরা দু'জনে একসঙ্গে তাতে বসলাম। বেভারেও কিং বসলেন জানালার ধারে, আমি তাঁর পাশে। ইতিপূর্বে ট্রামের মধ্যে কখনও তাঁকে বিশেষ বসতে দেখি নি, কেননা অল্প কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তিনি আসন ছেড়ে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন। সে দিন ট্রামে লোক বেশি ছিল না, শহরের লোক প্রায় খালি হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ চলতেই হঠাৎ অসুভব করলাম, বেভারেও কিং তাঁর দুটি হাঁটু জাপানী পাখার মতো ছড়িয়ে আমাকে ঠেলে রাখলেন। তাঁর পাশে আমার আসন এমন সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এলো যে, তৎক্ষণাৎ সতর্ক না হ'লে আসন থেকে নিচে পড়ে যেতাম।

আমাকে তিনি এমন ঠেলে রাখলেন যে, হঠাৎ আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ জেগে উঠল। কেননা এমন স্বার্থপর ব্যবহার তাঁর কাছ থেকে যে কখনও আশা করা যায় না। তবে কি তাঁর চরিত্রে কোনো গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেল? আর এই কি সেই পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণ?

আমি মনোযোগের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এবং চালচলন লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম। ক'দিনের মধ্যেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের সমস্ত মত বদলে গেল। তাঁর ব্যবহারে ক্রমেই মর্মান্বিত হ'তে লাগলাম।

তিনি সেবার্গের নামও আর করেন না। ট্রামে উঠলে তাঁর মতো স্বার্থপর আর দেখা যায় না। ভিডের মধ্যে সীট থেকে কেউ উঠে গেলে সেই সীটের কাছের লোকের দাবী অগ্রাহ্য করে তাদের ঠেলে বিদ্যুৎ গতিতে গিয়ে সেই খালি আসন দখল করেন। শুধু তাই নয়, যার পাশে বসেছেন তাকে হাঁটু দিয়ে ঠেলে রাখতে চেষ্টা করেন। তখন দু'জনে রীতিমতো ঝগড়া লেপে যায়।

ক'দিন পরে আরও একটি খবর শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। আমাদেরই সৈবকদলের একজন এসে বলল, বেভারেও কিং বস্ত্রীতে গিয়ে, সেখানকার লোকদের কাছে এতদিন যে গুণ্ডা এবং পথ্য দেওয়া হয়েছে, তার জন্তে নাকি কিছু কিছু টাকা আদায় করছেন। বস্ত্রীর লোকেরা প্রায় ক্লেপে গেছে। বলছে, আগে জানলে তারা গুণ্ডাপত্র কিছুই নিত না।

আমাদের এক বন্ধু একদিন এসে বললেন, এ সব কি সত্যি ?

কি ?

বেভারেণ্ড কিং-এর নামে নানা রকম কুৎসা রটাচ্ছে সবাই ।

তুমি কি শুনেছ ?

শুনেছি যা, তা শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না ।

এখন আর পৃথিবীতে অবিশ্বাস করবার কিছুই নেই, তুমি নির্ভয়ে বল ।

বন্ধু বলতে লাগলেন, বেভারেণ্ড কিং-এর নিচের তলার ভাড়াটেদের সঙ্গে তাঁর ভয়ানক ঝগড়া চলছে । তিনি তাদের উঠে যাবার জন্তে নোটিস্ দিয়েছেন ।

কেন ?

কেন বুঝলে না ? পনেরো টাকা ভাড়া পাচ্ছিলেন, কিন্তু ও বাড়ির ভাড়া এখন আশি টাকা সহজেই পাওয়া যাবে । যারা আছে তাদের কাছ থেকে তো আর বেশি ভাড়া নিতে পাচ্ছেন না, চক্ষুলাজ্ঞাতেও আটকায় । তাই ওদের তুলে দিতে পারলে নতুন ভাড়াটে পাওয়া যাবে বেশি টাকায় ।

যারা আছে তারা যদি না ওঠে ?

উনি নিজের জন্তেই নিচের তলাটা চান, এইভাবে নোটিস্ দিয়েছেন ।

কিন্তু যারা আছে তারা নতুন বাড়ি না পেলে উঠে যেতে পারছে না । বেভারেণ্ড কিং তাদের নানা ভাবে অস্থবিধায় ফেলেছেন সে জন্তে । উপর থেকে জঙ্গাল ফেলছেন, সব উড়ে গিয়ে লাগছে তাদের গায়ে ।

বল কি ?

আমিও তো অবাক হচ্ছি এসব শুনে । আচ্ছা, এর মানে কি বলতে পার ? ভদ্রলোক হঠাৎ এমন ভিগবাজি খেলেন কেন ?

কেন, সেই কথাই তো ভাবছি ।

একথা শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না । বেভারেণ্ডের কাছে গিয়ে বললাম, এ সব কি শুনছি ?

তিনি বললেন, এতদিন ভবিষ্যতের কথা ভাবি নি, এখন ভাবতে হচ্ছে । ছোটলোকেরা বিনা পয়সায় সব পেয়ে পেয়ে মাথায় চড়ে বসেছে । বেটারা এতদিন ওষুধ আর ভাল ভাল পথ্য খেয়েছে বিনা পয়সায়, এখন তার কিছু দাম দিক । ভিখারীর জাত বেটারা, ওদের আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয় ।

এর উত্তরে একটি কথাও আর বলতে প্রবৃত্তি হ'ল না । তাঁর আশা একেবারে ছেড়ে দিলাম । আমাদের সেবাসজ্ঞও ভেঙে গেল । কিন্তু মনে যে আঘাত লাগল তা থেকে মুক্তি পেলাম না ।

মাসখানেকের মধ্যেই দেখি রেভারেণ্ড কিং চালের ব্যবসা শুরু করেছেন এবং চোরা বাজারের পথে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু টাকা ক'রে ফেলেছেন। চোরা বাজারের চাইরা রেভারেণ্ড কিং-এর নামে চমকে ওঠে; বলে, বাপ! এর মতো খুপু লোক আর দেখা যায় না। লোকটা এ বছরে কোটিপাত হবে।

আমার মনে কেবলই প্রশ্ন জাগতে লাগল, এর মানে কি? রেভারেণ্ড কি এতদিন ভণ্ডামি করেছেন? সেবাধর্মের ছলে নিজের ব্যবসার পথ পরিষ্কার করেছেন এতদিন—না, তাঁর হঠাৎ মাথা খারাপ হয়েছে?

যদি মাথা খারাপ হয়ে থাকে তা হ'লে আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা চলে না।

মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের কাছে যাতায়াত করতে লাগলাম। কেউ বললেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কেউ বললেন, বোমার 'শক' পেয়ে ওর ভিতর থেকে দ্বিতীয় আর একটি ব্যক্তিত্ব জেগে উঠেছে। এবং এ রকম হওয়া যে অসম্ভব নয়, তা তাঁরা বহু নজির দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। আমার বন্ধুরা এই কথা সহজেই মেনে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু তবুও আমার মনে কিছু সন্দেহ থেকেই গেল। এমন মহৎ লোকের 'দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব' এমন ছোটলোক হয় কি ক'রে—এ প্রশ্নের উত্তর আমি পেলাম না। সবটাই একটা অনৈতিক ব্যাপার বলে বোধ হতে লাগল।

এমন সময় শোনা গেল, বিলেত থেকে ডক্টর স্ট্রান্ নামক এক প্রশিক্ষিত প্যাথলজিস্ট বিশেষ একটা কাজে বোম্বাইতে এসেছেন।

অবশেষে মানসিক অশান্তি দূর করার জন্তে আমাকে বোম্বাই পর্যন্তই যেতে হ'ল। এতখানি উৎসাহের জন্তে, এবং আমি 'দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব' খিওরিটি কেন মানতে পারছি না, এ জন্তে বন্ধু বা বিদ্রূপ করতে লাগল।

বোম্বাইতে গিয়ে ডক্টর স্ট্রানের সঙ্গে দেখা করলাম। ডক্টর স্ট্রান সদাশয় লোক, তাঁর সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কাহিনী শুনলেন। শুনতে শুনতে তিনি বহু প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তাঁকে বললাম। তা ছাড়া বাঙালীর চরিত্র সম্বন্ধেও তিনি অনেক তথ্য আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন।

তিনি আগাগোড়া সব শুনে হেসে বললেন, এ রকম কেস আমার একেবারে অজানা নয়। বিলেতেও এ রকম একটা ঘটনা আমি দেখেছি। 'শক'-চিকিৎসার সময় যে সিরাম ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল, সেটা বাঙালীর রক্তের সিরাম। সেই ইনজেকশনের পর থেকেই রেভারেণ্ড কিং-এর চরিত্রে বাঙালীর



বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তার প্রথম লক্ষণ আপনি শ্বলছেন, ট্রামে বসে পাশের যাত্রীকে হাঁটু দিয়ে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা। তা নয়। এটা একটা প্রধান লক্ষণ হ'লেও ওর আগেই লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম লক্ষণ ফুটেছে রেভারেণ্ডের কথায়। তিনি বলেছেন, "ঘরের খেয়ে আর বনের মোষ তাড়াতে ইচ্ছে করে না।"

ভেবে দেখলাম ডক্টর স্ট্রনের কথাই ঠিক। এ ছাড়া একটা মহৎ লোকের পরিবর্তন আর কিছুতে হওয়া সম্ভব নয়।

রেভারেণ্ডের উপর মনে মনে যে ঘৃণা জেগেছিল, তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল, তাঁর জন্তে বড় দুঃখ হ'তে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

না, কোনো প্রতিকারই নেই।

সিরামের জাতিভেদে কি সবারই এই বকম হয়?

না। লাখে একজনের হয় কিনা সন্দেহ। বিলেতেও মাত্র একটি কেসের রেকর্ড আছে, এবং কালক্রমে কাহিনীটি কৌতুকগল্পে পরিণত হয়েছে।

ডক্টর বলতে লাগলেন, একবার এক ইংরেজের দেহে রক্ত ইনজেক্ট করার দরকার হয়েছিল, সেজন্য রক্তদাতাকে তিনি উপযুক্ত ফী দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু তার দেহে রক্ত প্রবেশ করানোর পর তিনি ফী দিতে অস্বীকার করলেন, দিলেন শুধু ধন্যবাদ। কারণ রক্তদাতা ছিলেন রূপণতায় প্রসিদ্ধ স্কটল্যান্ডবাসী, তাই রূপণের রক্ত ইংরেজের দেহে গিয়ে ইংরেজকে রূপণ করে তুলল, তাঁর কাছ থেকে আর টাকা আদায় করা গেল না। বেভারেণ্ড কিংও এইভাবে বাঙালীর চরিত্র লাভ করেছেন।

বিষন্ন মনে বোম্বাই থেকে ফিরে এসে রেভারেণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি চালের বাজার নিয়ে কয়েকজন মকেলের সঙ্গে তিনি গোপন আলাপ করছেন। আমাকে দেখেই চূপ করে গেলেন, কোনো কথাই বললেন না।

ফিরে এলাম। ভাবলাম, ভবিষ্যৎ শুধু রেভারেণ্ডেরই নেই, আমারও আছে।

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম, আমি অত্যন্ত নির্বোধের কাজ করেছি, অর্থাৎ আমার ভবিষ্যৎ হারাতে বসেছি। রেভারেণ্ডের মতো টাকা এবং প্রতিষ্ঠাওয়াল লোকের সঙ্গে করছি বিবাদ! এতে আমার লাভ কি? ছাত্রজীবনের একটা মূল্যহীন আদর্শ আমাকে কি দিতে পারে? আমি

নিরুচ্ছিতাবশত তাঁর মতো একজন সহায়ককে পরিত্যাগ ক'রে একা ঘরে ব'লে  
জলেপুড়ে মরছি।

পবন অন্ততপ্ত হ'য়ে বিনীতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে একদিন আমার নিবেদন  
পেশ করলাম।

বেভারেণ্ড কিং আমার প্রস্তাব শুনে আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে আমাকে প্রায়  
জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, এ তো উত্তম কথা, আপনাকে আমি অংশীদার  
ক'রে নেব।

\* \* \*

এর পর দু'বছর কেটে গেছে, আমি আজও তাঁর অংশীদার হতে পারি নি।  
তিনি এই দু'বছর ধ'রে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর ঘোরাচ্ছেন।  
বলছেন, এই ব্যাশন পদ্ধতিটি উঠে গেলেই তিনি আমাকে নিয়ে নেবেন, কেননা  
এখন নাকি কিছুই লাভ হচ্ছে না।

## বৈবাহিক বৈচিত্র্য

বাগবাজারের কোনও এক রাস্তায় এক বাড়ির বৈঠকখানায় বসিয়া ১৩৩৪ সালের ১লা চৈত্র বেলা দশটার সময় শশধর চক্রবর্তী সিউড়ি হইতে আগত নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করিলেন।

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

মহাশয়ের পত্র পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। আপনার পুত্র শ্রীমান্ জলধর আমার কণ্ঠার মাতুলের সহযোগিতায় কলিকাতাতেই আমার কণ্ঠাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর নাই। পত্রযোগে আপনাদের বিষয় আমি সমস্তই অবগত আছি। আপনাদের ব্যবসায়ের কথা এবং ব্যবসায়ের সততার কথা সর্বজনবিদিত। আমাদের এই মফঃসল শহরেও আপনাদের খ্যাতির সংবাদ পৌঁছিয়াছে। সুতরাং আপনারা যে আমার কণ্ঠাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ইহাতে আমি আপনাদের প্রতি যে কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ হইয়াছি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে অক্ষম। শ্রীমান্ জলধর এম্-এ পাস করিয়া ব্যবসায়ের নিযুক্ত হইয়াছে ইহা তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষা বা উন্নতি ছাড়াও আমি পারিবারিক এবং বংশগত আচার-ব্যবহার এবং সংস্কৃতির উপরেই অধিক আস্থা বান। সুখের বিষয় সেদিক দিয়াও আমি নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতেছি। সুতরাং এইক্ষণে আমার কর্তব্য, মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপাদি করিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা। আমি স্থির করিয়াছি আগামী ৫ই চৈত্র রবিবার সকালে কলিকাতা পৌঁছিব এবং সোজা গিয়া আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করিব। ইতি

ভবদীয়

শ্রীসাদুচরণ মুখোপাধ্যায়

শশধর চক্রবর্তী পত্রখানা দুই বার পাঠ করিলেন এবং অস্তিত চারি বার গৌণে তা দিলেন। তারপর আর একবার চিঠিখানি সম্মুখে ধরিয়া, যেখানে লেখা ছিল “কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষা বা উন্নতি ছাড়াও আমি পারিবারিক এবং বংশগত আচার-ব্যবহার এবং সংস্কৃতির উপরেই অধিক আস্থা বান”—সেই স্থানটির উপর কিছুকাল নিবন্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া ফাইল-জাত করিলেন।

এই চৈত্র বেলা অন্তমান দশটার সময় সিউড়ি হইতে কলিকাতা পৌছিয়া সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় নির্দিষ্ট গলিতে কোচম্যানের সাহায্যে বাড়ির নম্বর মিলাইতে মিলাইতে চক্রবর্তী-গৃহে আসিয়া পৌছিলেন।

মুখুঙ্ক-মহাশয় প্রাচীন ডাক্তার, সকলের কাছে কামানের গোলা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু তাহা তাঁহার কেশবিরল গোলাকৃতি মস্তকের জন্মই নহে। শহর হইতে একটু দূরে ছোট্ট পাহাড়ের মতো উঁচু জায়গায় তাঁহার বাড়ি। তাহারই এক দিকে একটি গাছ জন্মাবধি ভূমির সমান্তরাল ভাবে হেলিয়া গিয়া সেই ভাবেই বর্ধিত হইয়াছিল, শাখাপ্রশাখা অবশ্য আকাশমুখী ছিল। কিন্তু অনেক দিন হইল গাছটির উপরার্ধ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, এখন শুধু কাণ্ডটি কামানের মতো তাঁহার বাড়ির এক পাশ হইতে শহরের দিকে মুখ বাড়াইয়া আছে। এই কারণে তাঁহার বাড়ির নাম হইয়াছে কামানওয়াল বাড়ি এবং তাঁহার নাম হইয়াছে কামানের গোলা। তাহার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কামানের আওয়াজের কিছু সাদৃশ্য আছে। কথা বলিবার সময় তিনি মাঝে মাঝে এমন অতর্কিতে গর্জন করিয়া ওঠেন যাহাতে সাধারণ বোগীর সর্বাঙ্গ এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্তের প্রাণ চমকিত হয়।

বহু আশায় বক বাঁধিয়া এই কামানের গোলা সেদিন চক্রবর্তী গৃহে আসিয়া ফাটিয়া পড়িলেন। এরূপ চঞ্চল প্রকৃতি অল্পবয়স হইলে মানাইত, কিন্তু মুখুঙ্ক-মহাশয় আটচল্লিশ বৎসর বয়সেও যেন শিশুটিই রহিয়া গিয়াছেন। এই শিশুর সারল্য শুধু হাত পায়ের চাকল্যে নয়, খাওয়া-দাওয়া বিষয়েও তিনি শিশুর মতোই লোভী। কিন্তু বিশেষ দুর্বস্বার মধ্যে বর্ধিত হইলে শিশুও যেমন সংসারবিষয়ে অনেকখানি অভিজ্ঞ হইয়া ওঠে, তেমনি এই প্রোট শিশুটি কল্যাণায়গ্রস্ত হইয়া চক্রবর্তী-গৃহে এমন সব বিষয়ীজনোচিত ব্যবহার করিলেন যাহা তাঁহার পক্ষে সহজও নহে, কারণ তাহা প্রায় পরিপক লোকের ব্যবহার।

চক্রবর্তী-গৃহে পৌছিয়া তাহার প্রথমে জলধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মুখুঙ্ক-মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম চক্রবর্তী-মহাশয়ই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মুখুঙ্ক-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া জলধর নিজের পরিচয় দিল। মুখুঙ্ক-মহাশয় তাহার সৌম্য আকৃতি এবং সপ্রতিভ ব্যবহারে আনন্দে গদগদ হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং অন্য কোনো আলাপ না করিয়াই বৈঠকখানা-ঘরের চারিদিক ঘুরিয়া, ভিতরের দিকের দরজায় উকি মারিয়া, গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “চমৎকার বাড়ি তো!”

সে গর্জনে জলধরের আপাদমস্তক কাঁপিয়া গেল। সে একদল প্রস্তুত ছিল না,

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া শ্মিতহাস্তে বলিল, “আলো-হাওয়াটা একটু শাওয়া দায়।”

মুখুঞ্জ-মহাশয় ধেন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “একটু কেমন? বলি, হোয়াট ডু ইউ মীন?—এ যে একেবারে ঝড়ের মতো হাওয়া!”

একটু আবেগেই মুখুঞ্জ-মহাশয়ের ভাষা ইংরেজী-মিশ্রিত হইয়া পড়ে। তাই তিনি বলিতে লাগিলেন, “আর এ না হ’লে কি আমাদের মনে ধরে?—আমরা খোলা জায়গায় থাকি—ফর নাথিং খানিকটা আলো আর হাওয়া আমাদের চাই-ই, তবে আলোটা শীতকালে এবং হাওয়াটা গ্রীষ্মকালে।” বলিয়া তিনি এইবার গা হইতে চাদর এবং জামা খুলিয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, “কিন্তু তোমার বাবার কথা তো এতক্ষণ জিজ্ঞাসাই করিনি, তিনি বাড়িতে আছেন তো?”

ভৃত্য উপস্থিত ছিল। সে চাদর ও পাঞ্জাবী যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল, “বাবু পূজো করছেন, পূজো শেষ হ’লেই চলে আসবেন, তিনি সব শুনেছেন।”

জলধর কিঞ্চিৎ বিশ্বয়ে ভৃত্যের দিকে চাহিয়া বলিল, “যা, তাড়াতাড়ি চায়ের কথা ব’লে আয়।”

মুখুঞ্জ-মহাশয় পূজোর কথা শুনিয়া কিছু ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাঁহার ক্র কুঞ্চিত হইল এবং কপালের উপর তিনটি ভাজের উপরে আরও চারিটি দেখা দিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আত্মচেতন হইয়া বলিলেন, “তা চলবে না—স্নানের আগে তো কিছু খাওয়া চলবে না। বলিতে বলিতে অস্থিরভাবে উঠিয়া ঘরের মধ্যে অবস্থিত বইয়ের আলমারির কাছে গিয়া একে একে বই টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

জলধর সঙ্কচিত ভাবে বলিল, “তা হ’লে ততক্ষণ স্নানের বন্দোবস্ত”—কিন্তু সে কথা তাঁহার কানে প্রবেশ করিল না। তিনি বই দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আনন্দে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “স্ট্রেঞ্জ! এ যে দেখছি আমারই সব খোরাক!—মায় বন্ধিমচন্দ্র পর্যন্ত!” তারপর হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এই একমাত্র খাদ্য যা স্নানের আগে খাওয়া চলে” বলিয়া এক খণ্ড বন্ধিমচন্দ্র হাতে লইয়া আসনে আসিয়া বসিলেন।

জলধর পুনরায় স্বরণ করাইয়া দিল, “তা হ’লে স্নানটাই সেবে নিলে হ’ত—চা পর্যন্ত খেলেন না।—

মুখুঞ্জ-মহাশয় এলোমেলো ভাবে বলিলেন, “তাড়াতাড়ি কিসের? চা অবশ্য খাওয়া দরকার—কিন্তু কি জান রাবা, সংস্কারটা তো আর ছাড়া যায়

না...কিন্তু ভিতরের তাগিদও কম নয়!—আচ্ছা বরঞ্চ স্নানের আগে এক গ্লাস জল—সাদা জল আমাকে দাও, হাত মুখ টেনেই ধুয়েছি, আর্হিকটাও বর্ধমান স্টেশনে সেরে নিয়েছি।” কথাগুলি যে একটু অসংবদ্ধ হইল তাহা তিনি নিজেরে বুঝিতে পারিলেন।

জলধর বলিল, “শুধু জল খাবেন?”

মুখুঞ্জ-মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, “গলাটা শুকিয়ে গেছে ব’লেই জল খাচ্ছি, নইলে ওটাও তো ঠিক চলে না, খাওয়া তো বটে!” এইবারের কথাটা দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

ভৃত্য জল আনিয়া দিল। মুখুঞ্জ-মহাশয় জল লইতে গিয়া হঠাৎ হাত শুটাইয়া বলিলেন, “ঐ দেখ, সাংঘাতিক ভুল হয়ে গিয়েছিল—জুতো পায়েরেই গেলাস ধরতে গিয়েছিলাম!” বলিয়া তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া এক গ্লাস জল উদরস্থ করিলেন। তারপর বই ছাড়িয়া দেওয়ালে-টাঙানো ছবিগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। একখানা রাজারানীর ছবি, একখানা চক্রবর্তী মহাশয়ের এক ইংরেজ বন্ধুর ছবি, আর সব বিলিতি নিসর্গ দৃশ্য। ছবিগুলি খুব মনোযোগের সহিত দেখিয়া মুখুঞ্জ-মহাশয় বলিলেন, “চমৎকার সব ছবি, কিন্তু এর মধ্যে কোথাও বাবা, একখানা দেবদেবীর ছবি ঝুলিয়ে দাও না!—মনে বেশ একটা পবিত্র ভাব জাগবে।”

জলধর কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা শুনিবার পূর্বেই মুখুঞ্জ-মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, “না না না, ওটা আমারই ভুল—বৈঠকখানা-ঘরে দেব-দেবতার ছবি রাখা ঠিক নয়, এখানে ওই সব ছবিই ভাল।” বলিয়াই ইলেকট্রিক ল্যাম্পের বিচিত্র শেডের দিকে চাহিয়া তাহার রূপ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন। জলধর কোনোমতেই কোনো দিক দিয়া মুখুঞ্জ-মহাশয়কে আর্ত্ত করিতে না পারিয়া বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

পারিবারিক আবহাওয়ার পরিচয় লইতে আসিয়া মুখুঞ্জ-মহাশয় প্রথমেই চক্রবর্তী-মহাশয়ের ধর্মবিষয়ে নির্ভার পরিচয় পাইলেন। স্মতরাং তিনি নিজেকে চক্রবর্তী মহাশয়ের আদর্শের উপযুক্ত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

চক্রবর্তী-মহাশয়ও মুখুঞ্জ মহাশয়ের পক্ষে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তিনি পারিবারিক আচার-ব্যবহারের পরিচয় লইতে আসিয়াছেন, স্মতরাং তিনি পুত্রের পিতা হইয়া কন্যার পিতার চোখে কোনক্রমেই যাহাতে ছোট না হন এই চিন্তা অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন, কাহেই কোথাও কোনও ক্রটি ধরা

না পড়ে সেদিকে তিনিও যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্মৃত্যং চক্রবর্তী এবং মুখুজে মহাশয়ের মিলনে চক্রবর্তী-গৃহে ঘেন একটা নূতন পরিমণ্ডল সৃষ্টি হইল।

চক্রবর্তী মহাশয় কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পায়ে খড়ম এবং পরনে গরদ। প্রথম সাক্ষাতে উভয় পক্ষ হইতেই আনন্দের যে উচ্চাস বহিন তাহার অর্থ বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু তাহার শব্দ বাড়ি কাঁপাইয়া তুলিল। সে শব্দে আকৃষ্ট হইয়া পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা চারি ধারের জানালায় উঁকি মারিয়া একটা বিশেষ রকম নূতনত্বের স্বাদ গ্রহণ করিতে নিযুক্ত হইল।

ট্রেন-ভ্রমণের কথা দিয়া মুখুজে মহাশয় আলাপ জমাইয়া তুলিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পর ট্রেন-প্রসঙ্গের পরিণতিস্বরূপ খাণ্ডের অনাচার-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল এবং আত দ্রুতগতিতে আলোচনা প্রাচীন ভারতে গিয়া পৌঁছিল। ঐ সময়ে চক্রবর্তী-মহাশয় গড়গড়া এবং মুখুজে-মহাশয় চুরুট টানিতে লাগিলেন, এবং উভয়ের শাস্ত্রালাপে এবং তামাকের ধোঁয়ায় চক্রবর্তী-মহাশয়ের বৈঠকখানা-গৃহে একটা অভিনব কল্প-জগৎ রচিত হইল।

মুখুজে-মহাশয় চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন, “ধরুন, চাবন মুনি যে”—বলিয়া পুনরায় চুরুটে মুখ গুঁজিলেন।

চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, “জাতিভেদের কথা বলছেন তো?”

মুখুজে-মহাশয় উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, “হ্যাঁ, জাতিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন, তার অর্থ এ কালের লোকে ভুলেছে ব’লেই না—।”

চক্রবর্তী-মহাশয় আনন্দে প্রায় দিশাহারা হইয়া বলিলেন, “ধরুন না কেন, শঙ্করাচার্য যে”—বলিয়া ঘন ঘন গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

মুখুজে-মহাশয় বলিলেন, “আপনি বোধ হয় স্বপাক আহারের কথা বলছেন?”

চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, “হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। শঙ্করাচার্য স্বপাক আহারকেই প্রশস্ত ব’লে গেছেন, কিন্তু দেখুন তো আমরা তা ক’জন মানি? আমরা যা করছি এটা কি স্নেচ্ছাচার নয়?”

জলধর আর পারিল না, সে বাহিরে গিয়া কিছু হাসিয়া মনটাকে সহজ করিয়া লইল।

মুখুজে-মহাশয়ের মতবাদ ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর ধ্বনিতে ঘর কাঁপাইতে লাগিল। জলধর পুনঃ প্রবেশ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিল, স্নানের সময় হইয়াছে। চক্রবর্তী-মহাশয় ঘেন আকাশ হইতে পড়িলেন। “কি আশ্চর্য!

অকিঞ্চিৎকৰ স্নানাহাৰ কুলে শুধু কথা বলে মাছি। ছি ছি ছি—ভাৰি অস্তায় হয়ে গেছে—আৰ নয়, আৰ নয়, এবাৰে উঠুন” বলিছা নিজে উঠিলেন।

মুখুঙ্কে-মহাশয়ৰ উঠিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি বলিলেন, “নট অ্যাট অল্—কিছুমাত্ৰ অস্তায় হয় নি, আপনি আমাৰ জন্তে ব্যস্ত হবেন না।”

চক্ৰবৰ্তী-মহাশয় বলিলেন, “অপরাধ নেবেন না, কিন্তু এ-সব বিষয়েই দোষ—আবস্ত করলে পুরনো কথা সব মনে পড়ে”— বলিতে বলিতে তাঁহাৰ চোখ ছলছল কৰিয়া উঠিল।

মুখুঙ্কে-মহাশয় তাহা দেখিয়া অস্থিরভাবে বলিলেন, “না না, স্নানাহাৰ বৰক এখন থাক, কিন্তু এ সব কথা বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, আবস্ত করা গেছে, শেষ করতেই হবে।”

কিন্তু শেষ কৰিবার পূৰ্বেই একটা দুৰ্ঘটনা ঘটয়া গেল। মুখুঙ্কে-মহাশয় যখন বলিতেছিলেন, আলোচনা শেষ করতেই হবে, ঠিক সেই মুহূৰ্তে তাঁহাদেৱ কানৈৰ পাশে এক ঝাঁক মূৰগী সমস্বৰে কোঁ কোঁ কৰিয়া উঠিল। চক্ৰবৰ্তী-মহাশয় এক লাফে উঠিয়া পড়িলেন। দেখা গেল একটা লোক বাঁকে কৰিয়া দুই খাঁচা মূৰগী আনিয়া জানলাৰ পাশে দাঙাইয়াছে। চক্ৰবৰ্তী-মহাশয় উন্মাদপ্ৰায় চীৎকাৰ কৰিয়া উঠিলেন, “মূৰগী। মূৰগী আনতে কে বলেছে? আৰে হাঁস—হাঁস—হাঁসেৰ স্বপ্ন খেতে বলেছে ডাঙাৰ, বেটা মূৰগী এনে হাজিৰ—ধেন আমাৰ চোফ পুৰুষ উদ্ধাৰ করতে এসেছে। পাল!, পাল!, এখুনি পাল!—ছি ছি ছি—।”

মূৰগীওয়াল। কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু চক্ৰবৰ্তী-মহাশয় তাহাকে কিছু বলিতে না দিয়া সোজা তাহাকে রাস্তা পৰ্যন্ত তাড়া কৰিয়া লইয়া গিয়া আৰও অনেকগুলি কথা শুনাইয়া দিয়া আসিলেন।

মুখুঙ্কে-মহাশয় এই সব দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কাৰণ চক্ৰবৰ্তী-মহাশয়ৰ এই আচরণে সাম্প্ৰদায়িক দাঙ্গা বাধিবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু মনোভাব গোপন কৰিয়া তিনিও চক্ৰবৰ্তী-মহাশয়ৰ সূৰে সূৰ মিলাইয়া বলিতে লাগিলেন, “লোকটাৰ তো স্পৰ্ধা কম নয়। বাড়িৰ উপৰ মূৰগী নিয়ে আসে!”

চক্ৰবৰ্তী-মহাশয় মহা বিয়ক্তিৰ সূৰে বলিলেন, “দেখুন তো কাণ্ড! আৰে যে কাড়িৰ কৰ্তা মাছ পৰ্যন্ত স্পৰ্শ করে না, সেই বাড়িতে মূৰগী।—ছি ছি ছি—।”

মুখুঙ্কে-মহাশয়ৰ উৎসাহ এইবার স্বসীমা পাব হইয়া গেল। তিনি চক্ৰবৰ্তী মহাশয়কে আনন্দে প্ৰায় আলিঙ্গন কৰিয়া বলিলেন, “তা হ’লে আমাৰ সৰ্ব্ব হবহ মিলে গেছেন—আমিও মিৰামিৰ, আপনিও। ষ্ট্ৰেঞ্জ কয়েনসিডেল!”



চক্রবর্তী-মহাশয় বিস্মিতভাবে বলিলেন, “কি আশ্চর্য!—আরে হতেই হবে, হতেই হবে। নিরামিষ না হ’লে সস্ত্রম রাখাই দায়। যেখানেই যান, নিরামিষকে লোকে এখনও একটু মানে। মাছ খেলেন কি তার সঙ্গে পেঁয়াজ খেতে হবে, এবং মাংসের সঙ্গে রসুন।”

মুখুঞ্জ-মহাশয় বলিলেন, “অত্যন্ত সত্য কথা। নিরামিষ একেবারে নিরাপদ, যেখানেই যান সম্মান রাখবার পক্ষে ও একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। তবে অনেকে আবার নিরামিষ ব’লে একেবারে বিধবার খাণ্ড দিয়ে বসে!”

চক্রবর্তী-মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “সে কথা মিথ্যা নয়— তবে এ-বাড়িতে সে ভয় নেই।”

মুখুঞ্জ-মহাশয় এ-কথায় গর্জন করিয়া হাসিলেন।

এই সময় জলধর আসিয়া স্নানের জন্ত জোর তাগাদা দেওয়ায় আলোচনা ঐখানেই থামিয়া গেল। তখন তেল মাখিতে মাখিতে মুখুঞ্জ-মহাশয় আলোচনাটা রাষ্ট্র-বিষয়ের দিকে টানিয়া আনিলেন এবং স্বরাজ সম্বন্ধে তিন-চারি মিনিট ঘোর আলোচনা চলিল। তাহা ছাড়া আহারের সময় আব যে যে প্রসঙ্গ বাকি ছিল সে সমস্তই উত্থাপিত হইল এবং ঠিক হইল রাত্রিকালে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

কলতঃ উভয়েই উভয়েব প্রতি মতের গভীর ঐক্যহেতু একপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে দুই জনের মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই হাস্যপরিহাস আরম্ভ হইয়া গেল। চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, “বুঝলেন মুখুঞ্জ-মশাই, আমাব ধারণা ছিল মেয়ের বাপ সাধারণত ঘৃণু-চরিত্রের হয়, কিন্তু আপনাকে দেখে আমার ধারণা বদলে গেছে।”

মুখুঞ্জ মহাশয় বলিলেন, “আব ছেলের বাপ যে কসাই হয় সেই ধারণা ছিল আমাব, কিন্তু ব্যতিক্রম তো। চোপের সামনেই দেখছি।”

শেষ পর্যন্ত মুখুঞ্জ-মহাশয়ের কথ্যা চক্রবর্তী-গৃহে আসিলে যে পরম স্বেধ হইবে এবং চক্রবর্তী-গৃহে মুখুঞ্জ মহাশয়ের কথাকে পাঠাইয়া যে মুখুঞ্জ-মহাশয় নিশ্চিন্ত হইবেন উভয়েই এ কথা স্বীকার করিলেন।

আহারান্তে নিত্রার পর বিবাহ সম্বন্ধ একরূপ পাকা হইয়া গেল।

বেলা তখন পাঁচটা। মুখুঞ্জ-মহাশয় বলিলেন, “চক্রবর্তী-মশাই, আমি একটু বেরতে চাই—বহুকাল পরে কলকাতা এসেছি, দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা না ক’রে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।”

চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ স্বচ্ছন্দে—আপনি স্বচ্ছন্দে দেখা ক’রে

আহ্ন। আর দেখুন, ঐ সঙ্গে আমিও একটু ঘুরে আসি না? চলুন আমাদের গাড়িতে একসঙ্গেই বেরনো যাক, চৌরঙ্গীতে আমার একটু কাজও আছে।”

“না না, তা হ'লে আর একসঙ্গে গিয়ে কাজ নেই—আপনার অসুবিধা হবে, আমি স্বরূপ ট্রামেই যাবি।”—মুখুঙ্কে-মহাশয় ব্যস্তভাবে কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

কিন্তু চক্রবর্তী-মহাশয় ছাড়িলেন না, উভয়ে একসঙ্গেই বাহির হইলেন।

মুখুঙ্কে-মহাশয়ের নির্দেশে গাড়ি ভবানীপুর অভিমুখে চলিল। ভাবনীপুরের একটা রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরিয়া একটা বাড়ির সম্মুখে গাড়ি থামাইতে বলিয়া মুখুঙ্কে-মহাশয় সেখানে নামিলেন এবং বলিলেন, “আমি ঘণ্টা দুই পরেই ফিরছি।”

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, “দেখবেন, দেবি করবেন না যেন, আমাদের আলোচনা ঢের বাকী আছে।”

গাড়ি চলিয়া গেল। মুখুঙ্কে-মহাশয় ছুটন্ত গাড়ির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, এবং গাড়ি অদৃশ্য হইবামাত্র দ্রুত পদচালনা করিয়া রসা রোডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে বাড়ির সম্মুখে গাড়ি থামিয়াছিল সে-বাড়ির সঙ্গে তাঁহার যে কোনো সম্পর্ক ছিল সেরূপ বোধ হইল না।

সেদিন সন্ধ্যা ছয়টায় চৌরঙ্গীর একটা রেস্টোরাঁয় পাশাপাশি দুইটি পর্দা-ঢাকা কুঠরিতে বসিয়া দুইজন ভদ্রলোক মনের আনন্দে রোস্ট-চিকেন এবং অন্যান্য নানারূপ মাংসের রান্না উপভোগ করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে ‘বয়’ ‘বয়’ বলিয়া হাঁকিতেছিলেন। কুঠরি দুইটির একটির নম্বর তিন, অপবটির চার। মাঝখানে মাছুষ-সমান উঁচু পার্টিশন।

এই দুই ভদ্রলোক অত্যন্ত মাংসপ্রিয়, এবং গৃহে প্রায় প্রত্যহ মাংস খাইয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, পথেঘাটে যখন যেখানে সুযোগ পান সেইখানেই লোভে পড়িয়া মাংসের স্বাদ গ্রহণ করেন। গৃহের রান্নার একঘেয়ে স্বাদ হইতে দূরে থাকিয়া মাঝে মাঝে ইঁহার। এইভাবে রমনাকে তৃপ্ত করেন।

তিন নম্বর প্রথম উৎসাহে যতটা পারেন দ্রুত উদরস্থ করিয়া ধীরে ধীরে একধণ্ড অস্থি চর্বণ করিতেছিলেন, এমন সময় চার নম্বরের কণ্ঠস্বরে তাঁহার মন সচকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল এ কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত, কিন্তু কোথায়, কবে শুনিয়াছেন তাহা মনে পড়িল না। তিনি কোতূহলবশবর্তী হইয়া মনে করিলেন ভদ্রলোককে একবার দেখা প্রয়োজন। তিনি হঠাৎ ঐখানেই আহার সমাপ্ত করিয়া ‘বিল’ দিবার ছদ্ম বয়কে ডাকিলেন।

এই কণ্ঠস্বর এইবার চার নম্বরের ভঙ্গলোকেবঁ কানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উত্তলা করিয়া তুলিল। তিনি সহসা আহার বন্ধ করিলেন। কার কণ্ঠস্বর ? অতিপরিচিত অথচ কিছুতেই মনে পড়ে না।

যুগল ভঙ্গলোকেবঁ যুগপৎ কৌতূহল, অথচ কৌতূহল মিটাইবার উপায় মাত্র একটি। পার্টিশনের উপর দিয়া লুকাইয়া দেখা ছাড়া উপায় নাই। দরজা দিয়া ঢোকা অসম্ভব, অহুমান যদি ভুল হয়। সুতরাং চেয়ারে দাঁড়াইয়া একটু দেখিয়া লইলেই সন্দেহের অবসান ঘটবে।

তিন নম্বর চেয়ারে দাঁড়াইয়া অতি সন্তর্পণে পার্টিশনের উপর মাথা বাহির করিলেন। ঠিক সেই সময় চার নম্বরও চেয়ারে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে পার্টিশনের উপর দিয়া মাথা বাহির করিলেন। দুই মাথা নাকে-নাকে ঠেকিয়া গেল। চার নম্বর ভীতিজনক শব্দ করিয়া উঠাইয়া পড়িলেন। তিন নম্বর কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

ম্যানেজার অকারণ ভয় পাইয়া উভয় ঘরেই তাড়াতাড়ি বিল পাঠাইয়া দিলেন। বিলের পাওনা টাকা মিটাইয়া মুখুঞ্জ-মহাশয় ও চক্রবর্তী-মহাশয় দুই কুঠরি হইতে নিষ্কাশিত হইয়া নীরবে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চক্রবর্তী-মহাশয়ের গাড়ি একটু দূরে ছিল, তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুখুঞ্জ-মহাশয় মন্থমুগ্ধবৎ তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন এবং গাড়ির ভিতরে নীরবে তাঁহার পাশে গিয়া বসিলেন। উভয়েরই হাতে এবং মুখে তখনও মাংসের ঝোল লাগিয়া রহিয়াছে।

গাড়ি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়া ছুটিয়া চলিল। প্রায় তিন মিনিট নির্বাকভাবে চলিবার পর মুখুঞ্জ-মহাশয় শুনিতে পাইলেন চক্রবর্তী-মহাশয় আপন মনেই থিক্ থিক্ করিয়া হাসিতেছেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার মন হইতে এক গুরু ভার নামিয়া গেল, তিনিও থিক্ থিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। চক্রবর্তী-মহাশয় পুনরায় গম্ভীর হইয়া গেলেন। মুখুঞ্জ-মহাশয়ের মনে পুনরায় আশঙ্কা জাগিল। তিনিও গম্ভীর হইয়া গেলেন। প্রায় দুই মিনিট নীরবে চলিবার পর চক্রবর্তী-মহাশয় চাদরে মুখ ঢাকিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মুখুঞ্জ-মহাশয়ও হকার দিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দুই জনের মিলিত হাসিতে ডাইভার চঞ্চল হইয়া গাড়ি থামাইয়া ফেলিল এবং পথে নামিয়া হাসিতে লাগিল।

চক্রবর্তী-মহাশয় হাসিতে হাসিতে মুখুঞ্জ মহাশয়ের ভুঁড়ি চাপড়াইতে লাগিলেন। মুখুঞ্জ মহাশয় হাসিতে হাসিতে চক্রবর্তী মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিলেন।

মিনিট দুই এই ভাবে কাঁটিবার পর চক্রবর্তী মহাশয় গাড়ি ঘুরাইয়া গঙ্গার ধারে বাইতে আদেশ করিলেন। গাড়ি প্রায় গ্রে স্ট্রিটের কাছে আলিঙ্গাছিল, সেখান হইতে ঘুরিয়া পুনরায় চৌরঙ্গীর দিকে আসিতে লাগিল।

গাড়ি একেবারে কোর্টের কাছে গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌঁছিল। গঙ্গার ধারে বসিয়া উভয়ে উভয়ের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করিলেন।

মুখুঞ্জ মহাশয় বলিলেন, তা হ'লে মুরগীওয়ালার ব্যাপারটাও—

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, “সব ঠিক, ঐ লোকটাই প্রতিদিন আমাকে মুরগী সাপ্লাই করে।—আর আপনার স্নান না ক'রে খাওয়া?”

মুখুঞ্জ মহাশয় বলিলেন, “আপনার পূজো করার কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, পাছে কোনো অপরাধ নেন। খাওয়া তো বর্ধমানেরই সেরে নিয়েছিলাম।”

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, “পূজো-ফুজো সব মিথ্যা,—তবে কোঁকের মাথায় নিরামিষ খাই বলাটা একটু বাডাবাডি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি ভবানীপুর থেকে বেস্টোরা'য় এলেন কি ক'রে?”

মুখুঞ্জ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, “ভবানীপুরের ব্যাপারটাই একটা ব্রাফ—শ্রেফ ঠিক। নিরামিষ খাওয়া মোটে সহ হয় না তাই আপনার হাত থেকে ছাড়া পাবার কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছিল।”

দুই জনের প্রাণখোলা আলাপে এবং হাস্তে গঙ্গার ঘাট আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কত কথাই হইল। আমিস ও নিরামিষ খাওয়ার তুলনা মূলক আলোচনা হইল, আধুনিক সমাজের কথা, আধুনিক সভ্যতার কথা, আধুনিক বিজ্ঞানের কথা বিস্তারিত আলোচিত হইল এবং অবশেষে আধুনিক যাবতীয় কিছুই নিন্দা করিতে করিতে উভয়ে উঠিয়া পড়িলেন, বলা বাহুল্য, আহারের অনাচার সম্বন্ধে ইহাদের পূর্বে যে মত জানা গিয়াছিল, এক ঘণ্টা আলাপের পর দুই জনে তাহাতে আরও দৃঢ়বিশ্বাসী হইলেন।

বাড়ি ফিরিয়া যাবে দুই জনে নিরামিষই খাইলেন। চক্রবর্তী মহাশয়ের পরামর্শ মতো এ যাত্রার অভিনয়টা অভিনয়ই রহিয়া গেল।

পরদিন বিদায় গ্রহণ। সকালেই ফিরিবার ট্রেন। ঘাইবার সময় চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, “উভয় পরিবারের চালচলনে যখন এতখানি মিল, তখন এ বিয়ে যে ভগবানের অস্তিত্বের সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।”

মুখুঞ্জ-মহাশয় কামানের গোলার মতই বিদীর্ণ হইয়া তাঁহার শেষ কথাটি উচ্চারণ করিলেন, “কোমও সন্দেহ নেই—নট দি লীস্ট।”

## প্ৰাণ

নিৰ্বিবাদে মাৰ্গাৰি কৰিতেছিলাম, কিন্তু ক্ৰমে উহা অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। বালা-জীৱনেৰ অস্বহীন উচ্চাশাকে খণ্ড খণ্ড কৰিয়া কাটিয়া তাহাৰই কোনো একটা বিকলাঙ্গ খণ্ড গলায় বুলাইয়া দিনেৰ পৰ দিন স্কুলে হাজিৰা দেওয়া— ইহাৰ চেয়ে বিড়ম্বনা আৰু কি আছে ?

অনেক বকম চিন্তা কৰিলাম। পৈতৃক টাকা কিছু ব্যাহে আছে—বেশি নহে, মাত্ৰ পাঁচ হাজাৰ। আমাৰ চল্লিশ টাকা আয় হওয়া সত্ত্বেও ঐ পাঁচ হাজাৰে হস্তক্ষেপ কৰি নাই, তাহাৰ কাৰণ আছে। নিজস্ব বাড়ি থাকোৱা দৰুন বাড়িভাড়া লাগে না, এও সংসাৰে আমি ছাড়া উদ্ভক্ত লোকেৰ মধ্য আমাৰ একটা স্ত্ৰী আছে। একটা বি আছে বটে, কিন্তু তাহাকে মাহিনা দিতে হয় না, সে শিশুকাল হইতে আমাদেৰ বাড়িতে থাকিয়া বৃদ্ধা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ওই পাঁচ হাজাৰেৰ কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়া যায়।

কিন্তু আৰু তো অল্লেখ্য সুখী হওয়া চলে না, ওই পাঁচ হাজাৰ টাকায় যে-কোনো একটা ব্যবসা আৰম্ভ কৰিয়া দিতে হইবে, অধ্যবসায় থাকিলে উন্নতি অনিবাৰ্য ইহা আমি বিশ্বাস কৰি।

সন্ধ্যায় আমাদেৰ একটা আড্ডা জমিত, একদিন সেখানেই কথাটি উত্থাপন কৰিলাম। মসকোচে বলিলাম আমি একটা ব্যবসা কৰতে চাই।

আড্ডায় আকাশ-পাতাল কত কি আলোচনা হইতেছিল—আমাৰ কথা শুনিবামাত্ৰ সকলেই সম্বন্ধে প্ৰশ্ন কৰিল, কিসেৰ ব্যবসা ?

সেটা এখনো ঠিক কৰি নি।

দীনবন্ধুবাবু বলিলেন, ব্যবসা যদি কৰতে চান ঘিয়েৰ ব্যবসা কৰুন, পাঁচশ টাকা ফেলতে পাৰলে লাভ হইবে যাৰে দুচাৰ মাসেৰ মধ্য।

ভবতারণবাবু বাধা দিয়া বলিল, না হে, অত মোজা নয়।

মোজা নয় কেন ?—দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা কৰিলেন।

কাৰণ ঘিয়েৰ ব্যবসায় জোচ্চুরি না কৰলে কিছু হয় না, কিন্তু জোচ্চুরি কৰতে হ'লে অভিজ্ঞতা দৰকাৰ। মাৰ্গাৰ মশাই জোচ্চুরিৰ কি জানেন ?

দীনবন্ধুবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিল, ক'খনো নয়, জোচ্চুরি কৰবাৰ দৰকাৰ নেই। মৰু'সলে ঘিয়েৰ সেৱ এক টাকা, কলকাতায় দুটাকা, খৰচা বাদে সেৱে আট আনা, মণ পিছু বিংশ টাকা। মোজা হিসাব।

ভবভারণবাবু বিক্রমের খরে বলিলেন, সোজা হিসাব হলে আর কেউ তিরিশ টাকার দশ ঘণ্টা কলম ঠেলত না।

ভবভারণবাবু বলিলেন, ব্যবসা করাও যেমন শক্ত, সে সম্বন্ধে কিছু ঝগাও তেমনি কঠিন। মাস্টার মশাই, আমার একটি পরামর্শ শুনুন, আপনি যি ভুলে যান, ব্যবসা যদি করতে হয়, মাছের ব্যবসা করুন। ভোরে উঠে শিয়ালদ, বাসু। ভোরে উঠলেই টাকা। গোয়ালন্দে মাছ, কষ্ট করেছে ভেলেরা, কষ্ট করেছে কুলিরা, কষ্ট পেয়েছে মাছ, আপনার কোনো কষ্ট নেই, এ বিষয়ে আমার একটি প্ল্যান আছে।

নরেনবাবু বিড়িতে একটা টান মারিয়া ড্যাম-ইওর-মাছ বলিয়া কাছে আসিয়া বসিলেন।

ভবভারণবাবু নরেনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন, মাছ ড্যাম কেন? মশাই মাছের কি জানেন?

দাঁতে বিড়ি চাপিয়া বিকৃতস্বরে নরেনবাবু জবাব দিলেন, মাছের আমি কি জানি? কিন্তু মশায়ের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি জানি সেটা মনে রাখবেন। আপনি মাছের যেটুকু চেনেন আমি তার চেয়ে বেশি চিনি মাছের বদ্বেরকে। মাছ এ যুগে অচল। ব্যবসা যদি করতে হয় সিনেমাই হচ্ছে সব চেয়ে সেবা। দশ হাজার টাকা ছাড়ুন, লাখ টাকা উঠে আসবে এক মাসের মধ্যে। একটা লোক তার পরিবারের জন্তে মাসে ক টাকার মাছ কেনে? বড জোর দশ টাকা। কিন্তু একটা পরিবার মাসে সিনেমা দেখে—কি বল হে আশুতোষ—কত টাকার?

আশুতোষ ভয়ানক সিনেমা-ভক্ত, সে ভাবিয়া বলিল, মাছের চেয়ে বেশি বটে।

ভূপতিবাবু কথা আরম্ভ করিলে কেহ কথা বলিবার ফুরসুৎ পায় না কিন্তু তিনি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এইবার আর তাঁহার চুপ করিয়া থাকা পোষাইল না—

আমার একটা অদ্ভুত প্ল্যান আছে—মাছ সিনেমা ওসব বাজে একেবারে বাজে।

আজডায় প্রায় পনের জন লোক উপস্থিত ছিল, এইবার তাহারা সকলে এক সঙ্গে কথা কহিয়া উঠিল, বোঝা গেল সকলেরই একটি করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট প্ল্যান আছে। আমাকে বিরিয়া লইয়া সকলে সমস্বরে নিজের নিজের প্ল্যান সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিয়া দাঁতেরে লাগিল। ইতিমধ্যে দুই দিক হইতে দুইজন

আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া চেঁচাইতে শুরু করিয়াছে, অন্তান্ত সকলে হাত নাড়িয়া সম্মুখে পশ্চাতে গম্ভীর ভাবে আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছে, আমি স্পষ্ট করিয়া কিছুই শুনিতে পাইতেছি না, সকল কথা মিলিয়া মিশিয়া ষেটুকু মনে আছে তাহা এই—

মাছ হছে লিজার্ডস্কিন দশ হাজার ফুট তুলে চার হাজার পোল্টি ট্যানিং শিখতে আনু পটোল চিংপুর বাজারে লণ্ডিতে ভীষণ চায়ের দোকান এই দেখ না ইনশিওর্যান্স ইণ্ডিষ্ট্রির চেয়ে শিমূল তুলো মার দিয়া কোল্ড ষ্টোরেজ ফ্রুট সিরাপ মাত্রেই ছাপাখানার ব্যাপারে ফুটবল ম্যাঙ্কফ্যাকচার অপটুডেট চিনির কলে কেমিষ্ট জোগাড় করতে মাইকামাইন বিশেষ মনোহারি দোকানে মুরগীর চাষে কলের লাঙল জুড়ে মাসিক পত্র চালানো সেন্ট পারসেন্ট তামাক পাতার খাবারের দোকানে ঐ ত মুঞ্চিল—

মিলিত চীৎকারে কান ঝালাপালা হইয়া গেল, আমিও ঐ সঙ্গে চীৎকার শুরু করিলাম, ব্যবসা করব না, করব না, আপনারা থামুন—

কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হয় না, অগত্যা আমি জোড় হাতে সকলকে নমস্কার করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইলাম। কিন্তু তথাপি নিস্তার নাই, চারজন আমার সঙ্গে ক্রমাগত বকিতে বকিতে চলিল, আমি দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম, তাহারাও দৌড়াইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া তিনজন মধ্যপথ হইতে রণে ভঙ্গ দিল, মাত্র একজন থাকাতে অনেকটা সাহস পাইয়া দৌড়ান বন্ধ করিলাম। তখন সে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল, আমার প্ৰানটা—

তোমার মাথাটা—আমি ব্যবসা করব না।

সে কি হয়, ব্যবসার চেয়ে—

কি হে বিপিন!

চমকিয়া চাহিয়া দেখি আমার এক বন্ধু গাড়ি হইতে ডাকিতেছেন। গাড়ি কাছে আলিল; বন্ধু আমার ভয়ানক মুখ দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন। আমি বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, আমাকে দেখে যতটা মনে করছ ততটা না হ'লেও খানিকটা বিপদে পড়েছি, কিন্তু মনে হছে বাঁচা গেল। চল তোমার সঙ্গে যেদিকে হোক খানিকটা যাওয়া থাক।

আমার সঙ্গে যিনি প্ৰান আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন তিনি দ্রুত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। গাড়িতে উঠিয়া বন্ধুকে সংক্ষেপে বিপদের কথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন; আমার সঙ্গে দেখা হয়ে সত্যি বেঁচেছি

বে-সব ব্যবসার কথা শুনলাম ওতে তোমার সর্বনাশ হ'ত, ব্যবসা সবকে আমার একটা অদ্ভুত প্লান আমি ঠিক ক'রে রেখেছি, যদি লাগে তোমার কাছেই লাগুক।

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, কতদূর এসেছি ?

হাওড়া স্টেশনের কাছে।

তা হ'লে খামাও আমার একটা গুরুতর কাজ আছে, এক্ষুনি নামতে হবে, প্লান অল্প দিন শুনব। গাড়ি খামিবামাত্র নামিয়া গেলাম। গাড়ি অদৃশ্য হইল, আমিও ট্রামে উঠিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রে ঘুমটা ভালই হইয়াছিল, কিন্তু গোলমালে ভোরের বেলাই ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ফটক খুলিতেই দেখি পূর্ব দিনের কয়েকজন এবং আরও নূতন কয়েকজন লোক নিজেদের মধ্যে কোন্ ব্যবসা শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া তুমুল তর্ক আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র দুই তিন জন থপ্-করিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল।

একজন বলিল, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আমার কথা যদি । আর একজন বাধা দিয়া বলিল, তোমার গ্যারান্টির মূল্য কি ?

ইহার পর আর ইহাদের তর্ক অন্তসরণ করিতে পারি নাই, কেন না পূর্ব দিনের মতো দশ-বাঘো জন সমন্বরে চীৎকার করিয়াছে।

আমি তর্কের মধ্যে ফস্ করিয়া উহাদের হাত ছাড়াইয়া ভিতবে ঢুকিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম, আমার হিতৈষিগণ চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল।

অগ্ন্যাগ্ন দিন সাধারণত বেলা নয়টায় গঙ্গা-স্নান করি। সে দিন ভয়ে ভয়ে আঠটায় স্নান করিতে গিয়াছি। জলে নামিয়া একটিমাত্র ডুব দিয়াছি, আমার পাশে কে স্নান করিতেছিল পূর্বে খেয়াল করি নাই, ডুব দিয়া উঠিতেই সেই অপরিচিত লোকটি হঠাৎ বলিল, ও আপনি! ভাল কথা, আপনি নাকি ব্যবসা করবেন? আমাকে আপনি চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি—সে যা হোক, আপনি যদি টাকা নষ্ট করতে না চান তবে ইন্শিওর্যান্স—

আমি ভাল সঁতার জানিতাম। ইন্শিওর্যান্সের কথা শেষ হইবার আগেই ডগবান বাটাও" বলিয়া ডুবিয়া গেলাম। প্রায় এক মিনিট জলের ভিতর চলিয়া মাথা তুলিতেই দেখি আমার নিকট হইতে তিন হাত দূরে সেই লোকটিও মাথা তুলিল। প্রায় এক মিনিট দম বন্ধ করিবার পর তৎক্ষণাৎ আবার ডুব দেওয়া সম্ভব নহে, কাজেই নির্বোধের মত ভাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।



সে একটু কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল, আমাদের কম্পানির নাম ইন্ফ্যান্ট বেঙ্গল লাইফ, পলিসি কণ্ডিশানগুলো যদি—

কিন্তু যতই কষ্ট হউক, ইহার পর আমি আর মাথা তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার ডুবিয়া সেখান হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলাম ; তারপর যেমনি মাথা তুলিয়াছি দেখি ইন্ফ্যান্ট বেঙ্গলও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র সে বলিতে আরম্ভ করিল, আমাদের H. M. System— 6 years' rating up—রিজার্ভের সঙ্গে লাইফ ফাণ্ডের অল্পপাত—

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম, বুঝতে চাই না।

ভদ্রলোক বাধা দিয়া বলিলেন, না বুঝে কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া উচিত নয়, আপনাকে বুঝতেই হবে।

“হে মধুসূদন” বলিয়া আবার ডুবিলাম। কিন্তু দশ সেকেন্ডের মধ্যে এক ভীষণ কাণ্ড ঘটিল। জলের ভিতর দিয়া ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতে মাথায় কিসের সঙ্গে ভয়ানক গুঁতা লাগিয়া গেল। শুশুক মনে করিয়া ভয়ে তাড়াতাড়ি মাথা তুলিতেই দেখি, শুশুক নহে, ইন্ফ্যান্ট বেঙ্গলের মাথা। মাথাটি যেন কথা বলিতে বলিতেই উঠিল,—শেষ পর্যন্ত ইনশিওর্যান্সে আপনাকে নামতেই হবে, এর থেকে পরিত্রাণ নেই।

কথাটা আমার অনেকটা বিশ্বাস হইল। বলিলাম, আপনার মতো অধ্যবসায় তো আমার নেই।

বলেন কি, আপনার অধ্যবসায় যা দেখছি আমি তো তার কাছে শিশু। অল্প মূলধনে যদি ব্যবসা করতে হয়—

ব্যবসার কথা শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম। পরিত্রাণ পাইবার জন্য শেষ চেষ্টা করিতে হইবে। আবার ডুবিলাম। এবারে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া অপর পারে দিকে ছুটিতে লাগিলাম, পূরা এক মিনিট তীর বেগে ছুটিবার পর যখন উঠিলাম তখন দেখি আহিরীটোলা-ঘাটের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। ইন্ফ্যান্ট বেঙ্গল আমার গতি অনুমান করিতে না পারিয়া উন্টা দিকে চলিয়া গিয়াছে, না হইলে নিশ্চয় লাইফ ফাণ্ড কিংবা এক্সপেন্স্ রেশিও সম্বন্ধে কথা তুলিত।

ভীষণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। পুনরায় সাঁতার দিয়া অপর পারে যাওয়া সম্ভব নহে। তীরে উঠিয়া ভিজা কাপড়ে জেটির দিকে চলিতে লাগিলাম। অবসন্ন দেহ, ধীরে ধীরে পা ফেলিতেছি, এমন সময় কে ধপ্ করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, কি বিপিন্দা, একেবারে দেখতেই যে পাচ্ছেন না!

ইনি আমার শ্রালক ।

আমি খুশী হইবার চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না, গম্ভীর ভাবে বলিলাম, ভাই, হাটজের বড় কষ্ট হচ্ছে—ওপার থেকে সাতার কেটে এসেছি, তোমার গায়ে একটু ডর দিয়ে চলি ।

কোথায় ?

স্ট্রিমারের জেটিতে । সঙ্গে পয়সা নেই, একটা টিকিট কিনে দাও ।

আমিও যে আপনার বাড়িতেই যাচ্ছি ।

কি মনে ক'রে ?

আজ এইমাত্র শুনলাম, আপনি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে যাচ্ছেন । যা-তা ব্যবসায় পয়সা নষ্ট না ক'রে চাকরি করাই কি ভাল নয় ?

এইবার ষথার্থ খুশী হইয়া বলিলাম, ব্যবসা আমি করব না, চাকরি বেঁচে থাক ।

যদি করতেন, তা হ'লে কিসের করতেন বলুন তো ?

কিছু মনে করবার সময় পাইনি ভাই, মনে করব ব'লে মনে করছিলাম ।

যদি নেহাৎই ব্যবসা করতে হয় তা হ'লে আমি একটি ভাল প্র্যান—

তুমিও প্র্যান ? দেখ, আমার প্র্যান-ট্যান কিছু দরকার নেই ।

বলেন কি । ব্যবসার গোড়ার কথাই হচ্ছে প্র্যান, যে ব্যবসা করবেন—

আমি বিনা প্র্যানে ব্যবসা করব ।

তা হয় না, আপনি একটা অসম্ভব কথা বললে আমি শুনব কেন ? কিসের ব্যবসা করবেন, কত টাকা ফেলবেন, কিনে বেচা না ম্যানুফ্যাকচার, কমিশন এজেন্সি না আমদানি রপ্তানি, কত টাকা খাটবে, কত ব্যাঙ্কে থাকবে,—ধরুন যদি দশহাজার টাকা এন্টিমেট ক'রে থাকেন তা হ'লে প্রথমেই অন্তত পাঁচ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রাখা চাই, আরো বেশি রাখতে পারলে আরো ভাল হয় ।

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম, ভগবান !

শ্রালক তৎক্ষণাৎ বলিল, ভগবান প্রথম অবস্থায় কিছুই করেন না, ডাকতে হয় শেষ কালে ডাকবেন ।

শ্রালকের মুখে বক্তৃতার খই ফুটিতে লাগিল, আমি নিরুপায়, স্ত্রিমার হইতে লাফাইবার শক্তি নাই, চুপ করিয়া রহিলাম ।

চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে ক্লাস্তিবশত চোখ বুজিয়া আসিয়াছে— আধ-জাগ্রত অবস্থায় এক বিভীষিকা দেখিলাম । সমস্ত শালিখার লোক বাধাঘাটে আমাকে স্ত্রিমার হইতে নামাইয়া লইবার জন্য আসিয়া ডিফ করিয়া

দাঁড়াইয়াছে। আম ঘাটে পৌছিলামাত্র হাজার হাজার লোক 'আমার প্ৰান, আমার প্ৰান' বলিয়া চীৎকার করিয়া চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। তাহার মধ্যে আমার স্ত্রীকেও দেখা যাইতেছে, সেও তাহার এক প্ৰান লইয়া আসিয়াছে; আমাদের বৃদ্ধা ঝি তাহার পশ্চাতে 'পেলান পেলান' করিয়া চীৎকার শুরু করিয়াছে। তাহার দাঁত নাই এবং সেই জগুই তাহার স্বর কোনো বাধা না পাইয়া সকলের স্বরকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আমি ভয়ে আতঁনাদ করিয়া উঠিলাম। এইটুকু পৰ্যন্ত বেশ মনে আছে, ইহার পবের ঘটনা আর কিছু মনে পড়ে না। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখি, আমি হাঁসপাতালে শুইয়া এবং পাশে আমার স্ত্রী এবং শালক বসিয়া। স্ত্রী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে এবং শালক তাহাকে নানা বকন সাশ্বনা দিতেছে।

হঠাৎ একটি শব্দ আমার কানে প্রবেশ করিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। পাশের বিছানা ঘিরিয়া যাহারা বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কি আলোচনা হইতেছিল এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু কথার ভাবে স্পষ্ট বোঝা গেল তাহাদের সমস্তা ফাইভ ইয়ার প্ৰানে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—কোনো কথার অর্থগ্রহণ করিবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। প্ৰান কথাটি শুনিবামাত্র আবার উন্মাদ হইয়া উঠিলাম। উঠিয়া বসিলাম।

আমাকে জাগ্রত দেখিয়া শালক হঠাৎ তাহাব যাবতীয় দাঁত বাহির করিয়া বলিল, বিপিন দা, আমাব প্ৰানটা তাহ'লে এবারে বলি ?

আর থাকিতে পারিলাম না, বিছানা হইতে আচম্বিতে লাফ দিয়া উঠিয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

\* \* \*

আজ সাত দিন হইল মামা-বাড়িতে লুকাইয়া আছি এবং আরো কিছুদিন থাকিব বলিয়া মনে করিতেছি। চাকরিটি থাকিবে না এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যবসা করিয়াই থাইতে হইবে কিন্তু সে ব্যবসা অন্য কাহারো প্ৰানে নহে।

সেৰূপ অবস্থা হইলে মৃত্যুর প্ৰান চিন্তা করিতে হইবে।

# আলিবাবা ও ব্রজবিলাস

১

আলিবাবা দস্যদের বস্ত্র-গৃহ আবিষ্কারের পর থেকে যা-যা করোছল তা সকলেরই জানা, সুতরাং তার পুনরুক্তি নিশ্চয়োজন। কিন্তু তৎকালীন বাদশার আদেশে আলিবাবা-আখ্যানের একটি বড় অংশের প্রচার বন্ধ থাকতে সেই অংশটি অগ্ণাবধি কেউ জানেন না। বাদশার হুকুম ছিল কড়া, কেউ সে কাহিনী প্রকাশ করলে তার প্রাণদণ্ড হ'ত, অনেকেই প্রাণ দিয়েছে এ জন্তে। তার পর থেকে ধীরে ধীরে লোকের মন থেকেও তা লুপ্ত হয়ে গেছে এবং তার বদলে প্রচারিত হয়েছে এক অসম্ভব কাহিনী যা আরব্যরজনী গ্রন্থে সবাই পড়েন।

মাত্র একটি লোক, অলকরিম তাঁব নাম, তিনি বাগদাদ থেকে পালিয়ে তুরস্কে যান এবং সেখানে গিয়ে সেই কাহিনীটি গোপনে লিখতে শুরু করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, লেখা-শেষে একটি লৌহ পেটিকায় বন্ধ করে তাঁব বংশধরদের ভবিষ্যৎ সম্পত্তি হিসাবে সেটি লুকিয়ে রাখবেন এবং কয়েক পুরুষ পরে তারা তা বিক্রি করে লাভবান হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অলকরিমের একমাত্র সন্তানের আর কোনো সন্তান না থাকতে উক্ত লৌহ পেটিকাটি বংশাধিকারমূলক ভাবে হস্তান্তরিত হওয়া আর সম্ভব হয়নি, এবং অলকরিমের পুত্র অলকরিমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পেটিকার অস্তিত্বও লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু গত আনুমানিক মাসে তুরস্কে ভূমিকম্পের ফলে যে বৃহৎ ফাটলটি দেখা দেয়, সেই ফাটল থেকে এত কাল পরে সেই লৌহ-পেটিকা এবং তৎসহ সেই সমস্ত-রক্ষিত কাহিনীটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কাহিনীটি পৃথিবীর সকল ভাষাতেই প্রচারিত হবে, কিন্তু আমি প্রাচীন আরব্য ভাষায় পণ্ডিত, এবং বাংলা দেশের সঙ্গে কাহিনীটির সম্পর্ক আছে, সে জন্তে আমিই প্রথম প্রচারের ভার পেয়েছি।

কাহিনীটি এই—

আলিবাবা মাত্র তিনটি গাধার সাহায্যে দস্যদের গুপ্ত গুহা থেকে ধনরত্ন বয়ে আনছে। তার ঘর ভরে উঠছে বহুমূল্য হীর-জহরতে। ওজন করে করে মাটিতে পুঁতছে কতিমা। এক দিন যায়, দু'দিন যায়, কিন্তু তৃতীয় দিনে বাধা উপস্থিত হল। সে এক অভাবিত কাণ্ড। তিনটি গাধা বেকে দাঁড়াল, তারা বোঝা পিঠে নিয়ে আর নড়ে না, আলিবাবা তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও তাদের এক পা সরাতে পারল না। তার সোনার স্বপ্ন

যে ভেঙে যায় ! কি সর্বনাশ ! চার দিকে মণি-মুক্তার পাহাড়, লাল নীল সবুজ আলোর বিছাৎ খেলে যাচ্ছে চারি দিকে, চোখ ঝলসে যায় তার ছাতিতে, কিন্তু সেই দিন সেই আলো আলিবাবার চোখে নিশ্চিভ হয়ে এলো, তার মাথা ঘুরে উঠল, সে হতাশ ভাবে সেই মণি-গুহার মাঝখানে পড়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। আর সময় নেই, একটু পরেই দস্যুরা ফিরে আসবে, এসে যদি দেখতে পায়, তাদের ভাঙারে সিঁদ কেটে আর এক দস্যু প্রবেশ করেছে, তাহলে আর রক্ষা নেই। আলিবাবা উন্মাদের মতো দাঁড়িয়ে উঠে আবার ঠেলতে লাগল গাধাদের, কিন্তু আগের মতোই এবারেও কোনো ফল হল না। আলিবাবা করণ চোখে চেয়ে রইল তাদের দিকে। এমন সময় আলিবাবাকে স্তম্ভিত করে একটি গাধা মানুষের ভাষায় বলে উঠল, বোঝা বইব, যদি বোঝার অর্ধেক আমাদের দাও।

আলিবাবা নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না, তার মনে হচ্ছিল সে যেন আরব্য উপন্যাসের এক নায়ক, সে যেন এই রূপকথার মায়া রাজ্যের কোনো মানুষ, আর গাধাগুলো সব রূপকথার গাধা। এ কি ভৌতিক কাণ্ড। এ কি কঠিন সমস্যা !

গাধাটি আবার বলে উঠল, অর্ধেক ভাগ না দিলে শুধু যে আমরাই বইব না তা নয়, বাইরের কোনো গাধাকেও বইতে দেব না ; ভুলে যেয়ো না, আমাদের বোঝা বওয়ার উপরেই তোমার ভাগ্য নির্ভর করছে।

কিন্তু এ প্রস্তাবে আলিবাবা রাজি হয় কি করে ? তার লোভ দুর্দাম হয়ে উঠছে। তিনটি মাত্র গাধাতেই তার দুঃখের সীমা ছিল না, হাজার গাধা দরকার ছিল, কিন্তু লোকে সন্দেহ করবে ভয়ে সংখ্যা বাড়াতে পারে নি। এর উপর আবার অর্ধেক ভাগ দিতে হবে ? আলিবাবা উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল—না না না বলে ঝড়ের মতো। বেগে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে গাধারাও বোঝা ফেলে তাকে অনুসরণ করল।

আলিবাবার মনে ভয় জেগেছে, সন্দেহ জেগেছে—এ কার মন্ত্রপূত গাধা—কোন অপদেবতার খেলা—না এ ডাকাত দলের কোনো ফাঁদ ! সে বুঝতে পারলে, আর যাই হোক, তার ভাগ্যপথে এইখানেই কাঁটা পড়ল।...কিন্তু সে যা পেয়েছে তাও যদি ভূতের খেলা হয় ?...

তার হঠাৎ মনে পড়ল অলকেমির কথা। অলকেমি বৈজ্ঞানিক, তাঁর কাছে গেলে হয়তো এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। হয়তো রহস্য ভেদ একমাত্র তাঁর হাতেই হতে পারবে।

কিন্তু আলিবাবাকে নিরাশ হতে হ'ল। সে গিয়ে দেখতে পেল, অলকেমির শিসেকে সোনা বানাবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় উন্মাদ। এই উন্মাদ যদি টের পান যে, আলিবাবা বিনা পরিশ্রমে সোনা বানাবার কৌশল আবিষ্কার করেছে, তা হ'লে হয়তো তিনিই আলিবাবার অংশীদার হতে চাইবেন।

মরুভূমির পথে চলা কি দুঃসাধ্য কাজ! যখন সে অলকেমির কাছে ছুটে এসেছিল, তখন তার মনে ছিল উৎসাহের আগুন, তাই পথের দুঃখকে সে দুঃখ মনে করেনি, কিন্তু এখন? এখন সে কিরে চলেছে হতাশ হয়ে, তার মনের আগুন নিবে গেছে, তাই এখন সে আগুন অনুভব করছে পায়ের নিচে। দিগন্ত-বিহীন মরু-বালুকা পাহাড়ের মতো তরঙ্গায়িত হয়ে একের পর এক মাথা তুলে আছে, চলতে চলতে পথ আর শেষ হয় না। এমন সময় সে দেখতে পেল, তারই মতো আর এক হতভাগ্য চলেছে সেই তপ্ত পথে একা পায়ে হেঁটে। মুখ তার আকাশে তোলা, দৃষ্টি উদ্ভ্রমুখী, আকাশের প্রচণ্ড অগ্নিগোলক তার চোখে-মুখে অগ্নিবর্ষণ করছে, কিন্তু সেদিকে তার জ্ঞেপ নেই।

আলিবাবা আরও এগিয়ে দেখতে পেল, মুখে তার এক তামাকের পাইপ। এ রকম অদ্ভুত মানুষ দেখে তার কৌতূহল তুর্গিবার হয়ে উঠল, জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে?

—আমি? আমি এক জন বাঙালী বৈজ্ঞানিক, নাম ব্রজবিলাস।

—বৈজ্ঞানিক? আপনি কি অলকেমির শিষ্য?

—না। আমি ডক্টর থর্নডাইকের শিষ্য। আগে অবশ্য আমার গুরু ছিলেন শার্লক হোমস, কিন্তু থর্নডাইকের বিশুদ্ধ ল্যাবরেটরি মেথড আমার খুব পছন্দ।

—তিনি কে?

—তিনি ডিটেকটিভ, আমার গুরু।

—ডিটেকটিভ কাকে বলে?

—খাটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যিনি রহস্যভেদের কাজ করেন, তাকে ডিটেকটিভ বলে।

আলিবাবা যেন হাতে স্বর্গ পেল এই কথা শুনে। বলল, আমি একটি মহা রহস্যে পড়ে যারা যেতে বসেছি, যদি একবার মেহেরবানি করেন আমার প্রতি।

—এখন আমার সময় নেই, দেখছ না, আমি অন্য একটি রহস্যভেদে নিযুক্ত আছি। আপাতত আমি উদ্বেকিস্তানের ধূলা লংগ্রহ ক'রে কিরছি।

—ধূলা কেন?

—মাইক্রোস্কোপে দেখব ব'লে। কয়েক জন অপরাধী তেহরানের জেল ভেঙে পালিয়েছে। সেখানে তাদের ফেলে-মাওয়া জামা ঝেড়ে যে ধূলো পেয়েছি, তার মধ্যে এক জাতীয় সিঁকের আঁশ পাওয়া গেছে, এই সিঁক এক মাত্র উজবেকিস্তানে পাওয়া যায়। তাই মিলিয়ে দেখব ঐ লোকগুলো উজবেক কি না। অথচ জেলে তারা পরিচয় দিয়েছিল ফিলিস্টাইন ব'লে।

তা হ'লে উজবেকিস্তানের সিঁক না এনে ধূলো আনলেন কেন ?

আগেই বলেছি ল্যাবরেটরি মেথড আমার পছন্দ। “ইন্ডাকশন বাই সিম্পল এনিউমারেশন” রীতিকে আমি অবৈজ্ঞানিক মনে করি। স্থূল চোখে দেখা জিনিসে আমি ভরসা করি না। আমার পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং খাঁটি বৈজ্ঞানিক।

আলিবাবা এ-সব শুনে বিশ্বয়ে বিষ্ট হয়ে গেল। ব্রজবিলাসের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছেগে উঠল। সে কাতরভাবে বলল, দোহাই আপনার, আপনি আমার রহস্যটি আগে ভেদ করুন, আমি আপনাকে প্রচুর হীরে-জহরৎ দেব।

হীরে-জহরতের কথায় ব্রজবিলাস চমকিত হয়ে বলল, কি রহস্য তোমার ?

আমার তিনটি গাধা হঠাৎ আমার কাজ করতে অস্বীকার করেছে, আর সব চেয়ে মজার কথা এই যে, তারা মানুষের ভাষায় কথা বলছে, তারা বলছে, মজুরি না বাড়ালে তারা কাজ করবে না।

ব্রজবিলাস লাফিয়ে উঠল এই অদ্ভুত কথা শুনে। বলল, সত্যি বলছ ?— তা হ'লে রাজি আছি তোমার রহস্যভেদ করতে।

## ২

বাগদাদের কাছেই ব্রজবিলাস তার ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। ঠিক হ'ল, সে ঘাঁটিতে গিয়ে তার সহকারী শত্রুকে কয়েকটা জরুরী নির্দেশ দিয়ে আলিবাবাকে অনুসরণ করবে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। টাইগ্রিস নদীর ধার দিয়ে, খেজুর-বীথির মাঝখান দিয়ে চলেছিল দু'জন, এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। অতর্কিতে অজ্ঞাত স্থান থেকে একটি অতি ধারালো ফলাকায়ুক্ত তীর বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে ব্রজবিলাসের পিঠে লাগল এবং বুকের ঠিক মাঝখানটা ভেদ করে বেরিয়ে সম্মুখস্থ একটি খেজুর গাছে গিয়ে বিঁধল। আলিবাবা ভয়ে লাফিয়ে উঠল। ব্রজবিলাস হেসে বলল, ভয় পেয়ো না, শত্রুপক্ষ অনুসরণ করেছে, ভয় মানে আমাকে তারা ভয় করেছে।

আলিবাবা কিছুতেই ভেবে পেল না, ব্রজবিলাস এত বড় আঘাতেও চকল হটছে না কেন। তার মুখে আর কথা নেই, ছুঁনেই চলছে চুপচাপ। এমন সময় হঠাৎ তিন চার জন ভীষণ আকৃতির লোক তাদের দিকে ছুটে এসে ব্রজবিলাসের গলাটি তরবারির আঘাতে একেবারে কেটে ফেলল এবং মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্রজবিলাসের মূণ্ডটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

শুশ্রুত আলিবাবা ভয়ে চীংকার ক'রে উঠল। এতখানি আশার পর হঠাৎ এই নৈরাশ্রে তার হাত-পা অমাড় হয়ে এলো, মনে হ'ল সে-ও মাটিতে পড়ে যাবে।

এমন সময় ব্রজবিলাসের হুলুস্থিত ছিন্নমুণ্ড মূহূ হেসে ব'লে উঠল, এ ভালই হ'ল, ভেবে দেখলাম এতে আমার কাজের সুবিধাই হবে।

আলিবাবার সমস্ত দেহ ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠল। এ কি তবে সবই ভৌতিক খেলা? গাধা, ব্রজবিলাস, আলিবাবা—কিছুই সত্য নয়—সব মায়া, সব ভোজবাজী? কোন্ ষাদুকরের হাতে পড়ল সে?

ব্রজবিলাসের মূণ্ড বলল, ভয় পেয়ো না, তোমার কাজ আমি ঠিক ক'রে দেব। আলিবাবা কল্পিত কণ্ঠে বলল, কিন্তু আপনি তো মারা গেছেন।

মূণ্ড বলল, আদৌ না। বিশ্বসৃষ্টির বিধানে প্রাণিজগতে একমাত্র আমিরা ও ডিটেকটিভ এই বিশেষ সুবিধাটি ভোগ করে থাকে।

আলিবাবা কিছুই বুঝতে পারল না। সে বিশ্বয়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখল, ব্রজবিলাসের একখানা হাত আপন মূণ্ডটি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যথাস্থানে লাগিয়ে দিল। তার পর হাসতে হাসতে বলল, এখন সব বুঝিয়ে বলাব সময় নেই, শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, ডিটেকটিভ সম্প্রদায় কোনো আততায়ীর হাতে মরে না, এটা আমাদের স্পেশাল প্রিভিলেজ। হয়তো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবেই এটি আমরা বিধাতার কাছ থেকে পেয়ে থাকব।

কথাটা আলিবাবার বোধ হয় বিশ্বাস হল, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, কেননা এ রকম অদ্ভুত ঘটনা তার কল্পনারও অতীত ছিল। সে সমকোচে জিজ্ঞাসা করল, মূণ্ডটি মাটিতে পড়ে গেলে আপনি বলেছিলেন, ওতে আপনার সুবিধা হল, তার স্থানে কি?

ব্রজবিলাস বলল, মানে এই যে, যেখানে শুধু দৈহিক শ্রম, বুদ্ধির দরকার নেই, সেখানে অকারণ মাথাটিকে বহন করি, আবার যেখানে শুধু চিন্তা দরকার সেখানে অকারণ মাথাটির সঙ্গে হাত-পাগুলোকে আটকে রাখি। এই বিষয়



অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম। এখন থেকে আমি যখন ভেদচিন্তায়—অর্থাৎ রহস্যভেদ-চিন্তায় ডুবে থাকেব, তখন আমার দেহটিকে পাঠাব নানা তথ্য-সংগ্রহের কাজে।

—চিন্তা ও কাজ একসঙ্গে দরকার হলে ?

—মাথাটি সঙ্গে নিয়ে যাব।

৩

ব্রজবিলাস আলিবাবার রহস্যভেদের কাজ শুরু করেছে। অর্থাৎ সে গাধাগুলোর যথাবীতি মাপ নিয়ে তাদের খুর থেকে পাশ্চাত্য সাহায্যে সামান্য কিছু ধূলা সংগ্রহ করে মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলেছে পরীক্ষার জন্য।

গাধাগুলোর মাপ-জোক নিয়ে এবং গায়ে দু-একটা গুঁতো মেবে যেটুকু বোঝা গেছে তা এই যে ওরা অত্যন্ত শাস্ত্রী তাতে প্রমাণ হয়, ওরা মনিবের হাতে ভাল ব্যবহার পায়। কিন্তু একটু বেশি শাস্ত্রী বলে, সন্দেহ হয়, গাধাগুলো মতলবাজ, এবং গাধার ঘতটা বুদ্ধি থাকা দরকার তার চেয়ে ওদের বুদ্ধি কিছু বেশি আছে। আরব, সৌরিয়্যা এবং ইজিপ্ট, এই তিন দেশের গাধাই ভদ্র, কিন্তু আলিবাবার গাধা অতিভদ্র।—কিন্তু কেন?... এই প্রশ্নের জবাব পেলেই সব রহস্য ভেদ হবে।

ব্রজবিলাস চিন্তা করে চলেছে। ইতিমধ্যে শত শত স্লাইডগুলো নন্দন করে মাইক্রোস্কোপের নীচে সাজিয়ে রেখেছে—ব্রজবিলাস সেইখানেই এসে বসল। কিন্তু এক বেলা ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে সে যা পেল তাতে রহস্য তার কাছে আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। গাধার খুরের ধূলা বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাচ্ছে চালের গুঁড়ো, সিল্কের আঁশ এবং গাঁজ-পাতার টুকরো। এ তিনটি জিনিসই বাংলা দেশে পাওয়া যায় এবং উজবেকিস্তানেও পাওয়া যায়। তবে কি এগুলো বাংলার দেশের গাধা ?

ব্রজবিলাস আবার পরীক্ষা শুরু করল, এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষা করতে করতে অবশেষে তার মুখে হাসি ফুটল, কারণ এখন যে সিল্কের আঁশ দেখা যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে উজবেকিস্তানের।

কিন্তু এ হাসি বিজয় লাভের হাসি নয়।...কারণ লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে। ...উজবেকিস্তানের পলাতক আসামী! উজবেকিস্তানের গাধা!...তবে কি এর মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে? তবে কি আসামীরা এই গাধায় চড়ে

তেহেরানে এসেছিল ?... হয় তো তাই। ব্রজবিলাস ভাবতে লাগল। কিন্তু কিছু পরেই বুঝতে পারল এ ঘটনা সত্য হলেও আসামীদের সন্ধান-সূত্র এর মধ্যে নেই। কিন্তু তবু নিশ্চিত হওয়া দরকার। সে আলিবাবাকে জিজ্ঞাসা করল তার গাধাগুলো কত দিনের, এবং জানতে পারল, সেগুলো তার বাচ্ছাকাল থেকে পালিত গাধা।

—তুমি হলফ করে বলতে পার এ কথা ?

আলিবাবা হলফ করে বলার আগে গাধা তিনটিকে ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলো। ব্রজবিলাসের প্রশ্নে তার মনে সন্দেহ জেগে থাকবে, কিংবা সত্যই সে দেখতে পেল যেন এ গাধাগুলো তার পরিচিত গাধাগুলোর চেয়ে কিছু অল্প রকম। কিন্তু পার্থক্যটা যে কোথায় তা সে ঠিক বুঝতে পারল না।

ব্রজবিলাস খনী হয়ে বলল, বাস্, ওতেই হবে।

কিছুক্ষণ পরে ব্রজবিলাস আলিবাবাকে বলল, আমার শুধু মুণ্ডটা আর একবার গাধার কাছে নিয়ে যাও, আমি আর একটু দেখব। দেখার বিশেষ কিছুই ছিল না, কেননা যন্ত্রের দেখা ভিন্ন তার কাছে অল্প দেখাব কোনো অর্থ নেই। তবু সে গাধাদের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। এমন সময় সে হঠাৎ লক্ষ্য করল, তিনটি গাধার ছয়টি চোখ যেন হাসছে। সে হাসি সাধারণ হাসি নয়, বিদ্রুপের হাসি। ব্রজবিলাস মনে মনে বলল, এই চ্যালেঞ্জের উত্তরে সে দেবে।

### ৪

ব্রজবিলাস তিন দিন ধরে কেবল ভাবছে। মুখে পাইপ, কিন্তু তার ধোঁয়া মুখের ভিতরে দিয়ে গিয়ে কর্ণপথে বেরিয়ে যাচ্ছে, কাবণ চিন্তা করছে শুধু তার মাথাটি। দেহটিকে সে আজ ক'দিন হল পাঠিয়েছে তেহেরানে কতকগুলো তথ্য সংগ্রহের কাজে। চিন্তা করছে সে অবিরাম, কারণ কোনো বাধা নেই, খাবার চিন্তা নেই, যাচ্ছে তেহেরানে বসে তার দেহটি—তরল খাদ্য গলার নালি দিয়ে পেটে নেমে যাচ্ছে। তারই অনীত খবরে জানা গেল, পলাতক আসামীরা পূর্বে গাধার ব্যবসা করত।

উদ্ধৃত-ব্রজবিলাস নিম্ন-ব্রজবিলাসকে বলল—তুমি পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক, দরকার হলে ডাকব, তবে দিন পাঁচেকের আগে বোধ হয় আর দরকার হবে না তোমাকে।

ব্রজবিলাসের বিচ্ছিন্ন শির নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চিন্তা করে ছিন্ন চিন্তাসূত্রগুলিকে একত্র মেলাবার চেষ্টা করে চলছে। (১) উজ্জবেকিস্তানের গাধা! (২) উজ্জবেকিস্তানের পলাতক আসামীর গাধার ব্যবসা। (৩) আলিবাবার গাধার মুখে মানবীয় ভাষা! (৪) মানবীয় বিক্রপের হাসি!

সব যেন মিলতে মিলতে মিলছে না, কোথায় যেন খেই হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মেলাতেই হবে, কারণ, তাহ'লে দুই পৃথক রহস্য একই খরচে ভেদ হয়ে যাবে। যত চিন্তা করে, ততই তার মনে হয়, ঘোর অন্ধকারে একই পথে সে চলছে দু'টি দরজা পার হয়ে।

সাত দিন কেটে গেল, কিন্তু কোথায় দরজা? অবশেষে অষ্টম দিনও যখন প্রায় কাটে, তখন তার চোখে পড়ল এক জোড়া মোজা। বহু দিন আগে পা থেকে মোজা-জোড়া খুলে রেখেছিল, সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে। একটি সত্য তার মনে জেগে উঠল। মোজা-জোড়া খোলার সময় উন্টে গিয়েছিল, ঐ ভাবেই পড়ে আছে। তার মনে হল, সে-ও বোধ হয়, সব উন্টো ক'রে ভাবছে, সোজা ক'রে ভিতরের দিকটা বাইরে টেনে আনলেই হয়তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

কিন্তু কি আশ্চর্য কাণ্ড। সত্য সত্যই তাই ঘটে গেল? হঠাৎ সব রহস্য জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, যেন একটি বিদ্যুত আঘাতে,— হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন বিদ্যুতের আঘাতে যেমন জল হয়! ব্রজবিলাসের ছিন্ন শির থেকে চিন্তার গুরুভার নেমে যাওয়াতে অত্যন্ত লম্বা ভাবে মুণ্ডটি টেবিলের উপর আনন্দে লাফাতে লাগল।

শব্দ—শব্দ—

শব্দ ছুটে এলো ঝড়ের মতো, দেহটিও ছুটে এসে মুণ্ডটি হাতে তুলে নিল। ব্রজবিলাস চঞ্চল ভাবে শব্দকে বলল, অবিলম্বে একখানা ছুরি চাই, ছুরি নিয়ে এখনি চল আমার সঙ্গে আলিবাবার বাড়ি। আমি নিজেই গাধা, তাই এত দিন উন্টো পথে চলেছিলাম—হায় রে, এতগুলো দিন আমার বৃথা নষ্ট হয়েছে!

আলিবাবার বাড়িতে পৌঁছে ব্রজবিলাস চীৎকার ক'রে বলল, কোথায় গাধা?

গিয়ে দেখল, গাধাগুলো তারই পূর্ব-নির্দেশ অনুযায়ী খুব শক্ত ক'রে বাঁধা আছে। সে সেখান থেকে আর সবাইকে সরিয়ে দিয়ে ছুরি বের করল এবং ছুরি দিয়ে উন্মাদের মতো পর পর তিনটি গাধার পেট—গলা থেকে পিছনের পা পর্যন্ত চিরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে তিনটি লোক বেরিয়ে এলো—

তিনটি নাম-করা কমিউনিষ্ট। এরাই তেহেরানের জেল ভেঙে পালিয়েছিল।  
হাতে তাদের এক গাদা করে ইস্তাহার।

বিষম্বন্ধ লোক অবাক হয়ে গেল ব্রজবিলাসের আশ্চর্য ক্ষমতায়। দুনিয়ার  
কৌতূহল নিবৃত্তির অগ্নে তাকে একটি বিবৃতি দিতে হল, কিন্তু বুদ্ধি করে খুব  
সংক্ষিপ্ত আকারে দিল। বলল, সমাধান অত্যন্ত সহজ! গাধা মজুরি বৃদ্ধির  
দাবীতে ষ্ট্রাইক করেছিল, ঐখানেই আমার সন্দেহ জাগে। ওরা নিজেদের  
স্বভাব গোপন রাখতে পারে না দু'দিনের বেশি।

ব্রজবিলাসের কুতিত্ব-কথা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র, শুধু আলিবাবার কোন বিশেষ  
কাজটি করতে গাধার। অস্বীকার করেছিল সেটি ব্রজবিলাসও জানে না, পৃথিবীর  
লোকেও জানতে পারল না।

## কাউকে ব'লো না!

কিছুদিন পূর্বে একখানা কাগজে একটি গল্প লিখেছিলাম। তাতে একটি মস্তব্য করেছিলাম এই যে, ভূত গল্প লিখতে পারে না। সেই গল্প পড়ে এক মহিলা তার প্রতিবাদে জানিয়েছিলেন,—ওটি আপনাব ভুল, কারণ ভূত সবই পারে।

কথাটা তখন অবশ্য হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ আমাকেই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। কারণ আমি এখন আর জীবিত নেই। তবে ভয় নেই, ভূত কি ক'রে গল্প লেখে তা প্রমাণ করতে যাচ্ছি না, কি ক'রে ভূত হয়েছি সেটাই আমার বলবার বিষয়।

স্বাস্থ্য আমার বাল্যকাল থেকেই খারাপ। বহুকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি—বহুকাল মানে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে। কত ওষুধ যে খেয়েছি! আগেকার দিনে কুইনিন যে ম্যালেরিয়ার ওষুধ তা জানা মত্বেও কুইনিন কতদিন কি পরিমাণ খেতে হবে, কোনো ডাক্তারের কাছে তার ঠিকমতো নির্দেশ পাওয়া যায় নি। সেজন্য বার বার জবে ভুগেছি এবং ক্রমে তার আনুসঙ্গিক অনেক রকম উপসর্গ এসে জুটেছে। বিচিত্র রকম ওষুধ আমি খেয়েছি—পেটেন্ট ওষুধ, কবিরাজী ওষুধ, হোমিওপ্যাথি। তারপর অনেকদিন কলকাতা-বাসের ফলেই হোক বা বহুদিনের ওষুধের যোগফলেই হোক, ম্যালেরিয়াতে আব ভুগি নি, কিন্তু পাকস্থলীটি স্থায়ীভাবে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি ঠাণ্ডা লাগা নামক ব্যাধিটি আমাকে এমন কঠিন ভাবে চেপে ধরল যে, এটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ব'লে বোধ হ'ল। লুচি মাংস যি পোলাও প্রভৃতির পরিবর্তে বার্লি বা সাদামিদে ভাত মাছেব ঝোল খেয়ে বাঁচা যায়, কিন্তু মাসে একবার ক'রে সর্দি-জরের আক্রমণ হ'লে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে পড়তে হয়। হয়েছিলামও তাই। চাকরি ক'রে যেতাম, তাই অসুখ বহন ক'রেই কাজ করতে হত। শেষে এমন হল যে কোনো দিকই আর রক্ষা করতে পারি না। ফলে যা অনেক আগে করা উচিত ছিল তাই শেষ অবস্থায় করলাম। অর্থাৎ দীর্ঘ দিনের জন্ম বিনা বেতনে ছুটি নিয়ে হাওয়া পরিবর্তনে গেলাম।

গেলাম ভাল জায়গাতেই। এবং এটাই যে বাঁচবার একমাত্র উপায় এ বিষয়েও সন্দেহ ছিল না। বহুদিন এক জায়গায় থাকলে কতকগুলো অসুখ স্থায়ী হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কোনো ওষুধের সাধ্য নেই যে সে সব অসুখ সারায়। সর্দি তার মধ্যে একটি। যে-কোনো তুচ্ছ উপলক্ষে সর্দির আক্রমণ চলতে থাকে।

স্থানভ্রমণ না করলে ভাল হবার কোনো আশা থাকে না এবং করলে ভাল হবার নিশ্চিত আশা থাকে।

যে কায়গায় গেলাম তার নামটি নানা কারণে গোপন রাখতে হল। এবং সেখানে ষাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল, তাঁদেরও নাম গোপন রেখে এই কাহিনী বলছি। কারণ তাঁরা এখনও জীবিত আছেন। আমি চাই না যে তাঁদের কোনো অনিষ্ট হোক। তাঁরা প্রত্যেকে ভাল মানুষ, তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কোনো হিংসাও নেই, তাঁদের ঘাড় মটকাবারও আমার কোনো মতলব নেই।

বাঙালী-অধ্যুষিত পশ্চিমদেশের ছোট শহর, স্বাস্থ্যের পক্ষে মনোরম স্থান। সেখানে আমি নবাগত। সেইজন্য প্রাথমিক একাকিত্ব কষ্টদায়ক হ'লেও তিনচার দিনের মধ্যেই অনুভব করতে পারলাম যে আমার স্বাস্থ্য উন্নতির পথে নিশ্চিত যাত্রা করেছে। স্বাস্থ্য আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য একই আছে, কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে অভিনব সজীবতার হাওয়া বইতে শুরু করল। কিন্তু সে যে কি তা বুঝিয়ে বলা যায় না।

তিনচার দিন পরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনি কাছাকাছি থাকেন, বেশ সদাশয় লোক, প্রবীণ এবং বিজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন ধরে কত আলাপ হ'ল। আমার অসুখের সমস্ত ইতিহাস তাঁকে শোনালাম। তিনি বললেন, “খুব ভাল করেছেন এখানে এসে। অতি চমৎকাব জায়গা এটি। তিনমাসে আপনি নতুন মানুষ হয়ে ফিরে যেতে পারবেন। তবে একটি উপদেশ আপনাকে দিচ্ছি”—বলেই খুব গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে প্রায় কানের কাছে মুখ এনে একটি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলেন।

আমি তো শুনে অবাক। এটি কি ক'রে সম্ভব—ভাবতে লাগলাম। কিন্তু তাঁকে তখন কিছু বলতে পারলাম না।

মহেশ্রবাবু তাঁর নাম, তিনি চলে গেলে, তাঁর কথাটা বিবেচনা করে দেখতে লাগলাম। তিনি বলেছেন, “আপনার অসুখের কথা আমি যা শুনলাম তাতে আপনার ক্ষতি হবে না, কিন্তু আর কাউকে বলবেন না।”

এ কথার অর্থ কি? তবে কি আমার অসুখের ইতিহাস শুনে তিনি বিরক্ত হয়েছেন? তিনি কি ভেবেছেন আমি শুধু নিজের কথাই বলতে ভালবাসি? অর্থাৎ আমি আত্মসর্বস্ব? আত্মকেন্দ্রিক? আত্মপ্রেমিক?

কিন্তু তা তো নয়। আমি এখানে নবাগত, অসুস্থ অবস্থায় এসেছি, যিনিই আসবেন আলাপ করতে তিনি নিজেই হয়তো আমার অসুখের কথা তুলবেন। তা তিন্ন আলাপ চলারই বা আর কি নিয়ে? আমার ব্যাধির ইতিহাস ভয়ানক

ইন্টারেক্টিং, অপরের পক্ষে শিক্ষাপ্রদও বটে। তা ছাড়া এখানে আমার জমিদারি নেই যে জমি সংক্রান্ত আলাপ করব। স্বাস্থ্যলাভের জন্য এসেছি, আলাপটাও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব বৃথা হল মহেন্দ্রবাবুর উপদেশ।

কিন্তু হায়, যদি ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি এতটুকুও থাকত!

এর পর যার সঙ্গে আলাপ হ'ল তিনি রামবাবু। তিনি আমার সব কথা আগাগোড়া মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন, “কুইনাইনের ক্রিয়া। সমস্ত ব্যাধি আপনার ঐ কুইনাইন আটকে রেখেছে। জানেন না কি সাংঘাতিক চীজ ঐ কুইনাইন।”

“বলেন কি!”

“হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।”

আমি অস্থখে ভুগে ভুগে অস্থখ এবং ওষুধ সম্পর্কে মোটামুটি একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলাম। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সেজন্য আমাকে কগী না বলে হাফ ডাক্তার ব'লে ডাকত। সুতরাং কুইনাইন আমার সকল ব্যাধির মূলে—এ কথাটায় শুধু ভদ্রতার খাতিরেই সায় দিয়ে গেলাম, মন থেকে নয়।

রামবাবু বললেন, “ভয় নেই।” বলে চলে গেলেন।

পরদিন সকালেই দেখি তিনি এক ঝাঁক গাছগাছড়া এনে হাজির। বললেন, “উলুন কোথায়?” তারপর চাকরের সাহায্যে ঘণ্টা দুই পরিশ্রমের পর তিনি আমাকে এক বাটি ‘সুধা’ খাইয়ে দিলেন। বললেন, “এ এক অদ্ভুত পীচন, এর এমন জোরালো শক্তি যে চব্বিশ ঘণ্টার আগে দ্বিতীয় মাত্রা খাওয়া নিষেধ। এর মধ্যে যদি বুকে কান পাতেন, তা হ'লে শুনতে পাবেন আপনার দেহের বিশ বছরের জমা কুইনাইন বাপ্ বাপ্ ক'রে চীৎকার করছে। আমি আবার কালই আসব।”—

অভিভাবকের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেই তিনি বিদায় নিলেন। বিষাক্তস্বাদে ভরে রইল আমার মুখ।

অতঃপর আলাপ হ'ল শ্রামবাবুর সঙ্গে। তিনি এসে অস্থখের কথা সব শুনলেন এবং বললেন, “মাসুঘের দুঃখ ভোগ কপালে লেখা থাকে। ভোগস্বস্ত ঘটে ঠিক সময়টি এলে। তার আগে কেউ কিছু করতে পারে না। দেখুন না কেন, আপনি যে এককাল ভুগলেন, কারো সাধ্য ছিল আপনাকে সারানো? ছিল না। এই যে আপনি এককাল পরে হঠাৎ এখানে এলেন, এর কোনো কারণ

আপনি আশুমান করতে পারেন? পারেন না। এর কারণ হচ্ছে আপনার ভোগান্তির ঠিক লয়টি এসে গেছে। দৈব যোগাযোগ। হেঁয়ালি মনে হচ্ছে? হবেই তো। বৃষ্টি দিয়ে বুঝতে চাইবেন না। পারবেন না। আজ সন্ধ্যায় বুঝিয়ে দেব।”

সেইদিন সন্ধ্যায় তিনি এসেই ইষ্টনাম জপ করতে করতে আমার কোমরে এক মাদুলি বেঁধে দিলেন। বললেন, “মাত্র এক মাস। বাস্। ইচ্ছে করলে দিন পনেরো পরেও বাড়ি কিরে যেতে পারেন। রেলগাড়ি ফেলে পায়ে হেঁটে যেতে ইচ্ছে হবে। লাফাতে ইচ্ছে হবে। দৌড়ঝাঁপ করতে ইচ্ছে হবে। কুলকুগুলিনী ফেপে উঠবে। বেশি কিছু বলতে চাই না। এক মাস পরে এসে আপনাকে মুক্ত ক’রে দেব। তবে সাবধান, মাদুলি বেশিক্ষণ জলে ডুবিয়ে রাখবেন না।”

শ্রামবাবু বিদায় নিলেন।

আমার তৃতীয় বন্ধু হরিবাবু। সাক্ষ্যভ্রমণের সময় পথে তাঁর সঙ্গে আলাপ। তিনি খপ ক’রে আমার হাত ধ’রে নাভী পরীক্ষা ক’রে বললেন, “কফ প্রবল। আপনি ভুল চিকিৎসায় এতদিন কষ্ট পেয়েছেন। প্রতিকার অতি পূর্বনো, কিন্তু প্রয়োগ নতুন। অর্থাৎ গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখতে হবে দৈনিক বাবো ঘণ্টা। আর কিছুই করতে হবে না। ভাবছেন এ তো সাধারণ ব্যাপার, সবাই জানে। আমি গোড়াতেই সে কথা বলেছি। কিন্তু বাবো ঘণ্টা দৈনিক পা ডুবিয়েছেন কখনো? এটি আমার আবিষ্কার।”

আমি বললাম, “আমার কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে যে।” বলার সঙ্গে সঙ্গে হরিবাবু বললেন, “সে কথা কি আর আমি ভাবি নি? একা থাকেন চাকরের আশ্রয়ে। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।”

তিনি নিজের চাকর পাঠিয়ে ব্যবস্থা ক’রে দিলেন পরদিনই। চাকরটি বিশালকায়। কথা কম বলে। সে নিজে চারটি মাটির হাঁড়ি এনে নিজ হাতে আমার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করল।

চতুর্থ বন্ধু যদুবাবু। তিনি বাড়িতে এসে আলাপ করলেন। আমার কথা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে ছোট্ট শহরটিতে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এঁরা আসছেন।

যদুবাবু বললেন, “জলই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ঠিক ওভাবে নয়।” হাঁড়িতে নিমজ্জিত আমার দুখানা পারের দিকে চেয়ে তিনি কথাটি বললেন।



আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম তাঁর দিকে ।

ষড়্বাবু বললেন, “পেটটি ঠাণ্ডাজলে ডুবিয়ে রাখতে হবে প্রত্যহ একবেলা ।”

বললাম, “এঁরা যে এই সব ব্যবস্থা আগেই করেছেন !”

ষড়্বাবু বললেন, “ক্ষতি হবে না । আমি টব পাঠিয়ে দিচ্ছি ।”

ব্যবস্থা হ’ল, আমি টবে কোমর ও পেট ডুবিয়ে বসে থাকব, পা থাকবে গরম জলে । এই অবস্থায় রামবাবু এসে পাঁচন খাওয়াবেন । মাছলি নিয়ে মুশকিল হ’ল । বেশিক্ষণ জলে রাখা নিষেধ । ওটাকে মাথায় বেঁধে নিলাম ।

তিনদিন এইভাবে কাটাবার পর আমার প্রথম সন্দেহ হ’ল কাজটা ঠিক করছি কি ? সন্দেহ ক্রমে প্রবল হ’তে প্রবলতর হ’তে লাগল । রাম, শ্যাম, ষড়্ব, হরি হয়েছে, এর পর মধু আসবেন,—তার পর……না, আর ভাবা যায় না । শেষ রায়ে ঘুম ভেঙেছিল, দুশ্চিন্তায় আর ঘুম হ’ল না । ভাবলাম সমস্তটা দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে হয়তো এঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে । মহেন্দ্রবাবু বাইরে গেছেন, নইলে তাঁর কাছে গিয়েও সদুপদেশ নেওয়া যেত । তাঁর নাবধান-বাণীর মর্ম এইবারে আমার মর্মে প্রবেশ করল ।

আমি সত্যিই সেদিন সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে গেলাম, এবং দৈহিক কষ্ট অগ্রাহ্য ক’রেও বেশ একটু দূরে ছোট্ট পাহাড়ের কোলে একটা গাছের নিচে গিয়ে সটান শুয়ে পড়লাম । হেঁটে যতটা ক্লান্তি হয়েছিল, মুহূ শীতল বাতাসে তা মুহূর্তে দূর হয়ে গেল । ভাবলাম, ঘণ্টাদুই এইখানে পড়ে থেকে উঠে যাব এবং সুযোগ পেলেই আবার চ’লে আসব । শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল, এইভাবে যদি শহরের প্রত্যেকটি লোক আমার চিকিৎসা শুরু করে, তা হ’লে আমি যে উদ্দেশ্যে এসেছিলাম তা আর সিদ্ধ হবে না । অসুখের কথা অগ্র্যক্বে বললেই সে তৎক্ষণাৎ অব্যর্থ ওষুধের কথা বলে বটে, কিন্তু তা যে এমন হাতে-কলমে কেউ করবে তা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল ।

ভাবতে ভাবতে ক্লান্তিবশত একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জেগে উঠে দেখলাম, ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেছে । কিন্তু সামনে চেয়ে দেখি দূরে মনুশ্রুর্মূর্তি । চিনতে দেবি হ’ল না, বিশালকায় সেই চাকরটা । একটু সরে ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিলাম । ভিতর থেকে আমি সবই দেখতে পাচ্ছিলাম । দেখলাম, সে এদিক ওদিক চেয়ে অগ্র পথ ধ’রে চ’লে গেল । তখন আমি ধীরে-ধীরে বেরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির দিকে রওনা হলাম । বেশ কৌতুক বোধ করছিলাম এই রকম লুকোচুরি খেলে । কিন্তু হঠাৎ পিছনে চেয়ে দেখি বহু লোক আমাকে অনুসরণ করছে । দূরে থাকায় সবাইকে চিনতে পারলাম না, কিন্তু অনুমান

## শরিয়ত গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ ব্যক-গল্প

করলাম ওই দলে রাম শ্যাম যদু হরি ইত্যাদি তো আছেনই, তা ছাড়া আরো অনেকে আছেন।

কোথা থেকে পায়ে জোর ফিরে এলো, আমি ছুটতে লাগলাম, ছুটতে ছুটতে পিছনে চেয়ে দেখি তাঁরাও ছুটছেন।

আমি তখন মরীয়া। একবার বাড়ি পৌছতে পারলে দরজায় খিল আঁটব, তাতে যত অভদ্রতা হয় হোক।

দু মাইল পথ ছুটে আসা সুস্থ মানুষের পক্ষেও কষ্টকর, কিন্তু আমি তখন আমার বিপদে কাণ্ডজ্ঞানহীন। তাই বাড়ির সীমানায় পৌছেই প্রায় চেতনাহীন অবস্থায় ভূমিতে লুটিয়ে পড়লাম, গুঠবার ক্ষমতাও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না।

ইঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো যেন। একটু একটু অনুভব করছিলাম, আমাকে কে ধ'রে জলের টবের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছে, পা দুখানা গরম জলের ইাড়ির মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে, এবং মুখের মধ্যে পাঁচন ঢালছে।

সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও মনে হ'ল যেন ক্ষীণ কণ্ঠে কে কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপে চুপে, জিজ্ঞাসা করছেন, “আপনি কি অশুখের কথা সবাইকে বলেছিলেন?”

স্বপ্নঘোরেই বুঝতে পারছিলাম, ইনি মহেন্দ্রবাবু, বোধ হয় বাইরে থেকে ফিরে এসেছেন। আমি ঠোঁট নেড়ে মহা অপরাধীর মতো বলতে চেষ্টা করলাম, ব—লে—ছি—লা—ম।

এর পরেই আমি সম্পূর্ণ চেতনাশীল। এবং কিছুক্ষণ পরেই সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি উক্ত টবের মধ্যেই দেহ রেখেছি।

এই কাহিনী লিখছি এর কদিন পরেই।

# বুমেরাং

১

একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের—ছোটবেলা থেকেই।

আমার নিজের কথাই বলছি।

মেয়েরা যাকে শুচিবাই বলে, আমার মধ্যে সেই একই বাই বা বাতিক বা বায়ু ক্রিয়া করছে কি না বলতে পারি না। তবে পথে-ঘাটে পা ফেলতে ভয় হয়, মন যে তাতে অশুচি হয়ে ওঠে এতে আর সন্দেহ নেই। শহরটাও হয়েছে ঠিক তেমনি নোংরা।

সরকারী বড় কাজ করতাম ইংরেজের আমলে। সাহেবি পালিশ এবং পরিচ্ছন্নতাবোধ সেজন্ত আরও বেড়ে থাকবে।

পথে-ঘাটে দম আটকানো দুর্গন্ধ আর নোংরা জঞ্জাল। গাড়িতে বন্ধ হয়ে চলা ভিন্ন উপায় ছিল না। নাগরিকতাবোধের অভাবে শহুরে লোকদের দু'চোখে দেখতে পারতাম না। শহুরে শিক্ষা নেই অথচ শহুরে থাকবে। বোধও নেই, লজ্জাও নেই। সমস্ত লজ্জা যেন আমার।

এই সব লোকদের নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি একেবারে স্বভাবসিদ্ধ, যেন সহজাত সংস্কার। ঘর বার তাদের একাকার। দুর্গন্ধ পচা জঞ্জাল পথে পথে, ওরই মধ্যে অগুণতি নোংরা উলঙ্গ ছেলে খেলা করে, ঘেয়ো রুগ্ন কুকুরদের সমশ্রেণী হয়ে।

মাঝে মাঝে ভেবেছি পাভাগাঁয়ে গিয়ে থাকব, সে অনেক ভাল। প্রকৃতির আপন ধূলোমাটি অনেক স্বাস্থ্যকর।

এক এক দিন দুর্গন্ধের জ্বালা সঙ্গে ঘরে ফিরে মনে হয়েছে রিটার্নার ক'রে ইউরোপে গিয়ে থাকব। মাঝে মাঝে গোপনে এমন ইচ্ছাও হয়েছে ইংরেজরা আবার আশ্রয়, এসে দলে দলে সকল পাড়ায় বাস করুক, শহর ছেয়ে ফেলুক।

কিন্তু এসব শূন্য কল্পনা, যাকে ওরা বলে মুনশাইন। বাস্তব ক্ষেত্রে একখানা মাঝারি গাড়ি পালন করি কোনোমতে, অবস্থা ঠিক প্রিন্সের মতো নয়। অসুবিধা হচ্ছে ঐখানে। বাস্তবে সাব-ডেপুটি, কল্লনায় আগা থা।

সাহেব পাড়াতেই এলাম শেষটায়। দেশ সব স্বাধীন হয়েছে, আমিও রিটার্নার করেছি। কাজেই দেখার অবসর থাকলেও সাহেব বড় কম দেখি। কদাচিৎ দু'একটা সাহেব মেম, যেন সেকেওয়াও দোকানের পুড়িৎ মারা পালিশ

ফিরছিলাম ঘণ্টাখানেক পরে। বন্ধুর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি। দীর্ঘ মেয়াদী অসুখ, অনিশ্চিত গতি, কতদিন চলবে কে জানে।

ফেরবার সময় ভিখারীর কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া ভেবেছিলাম এতক্ষণ সে নিশ্চয় ওখানে নেই। কিন্তু আমার অহুমান সত্য নয়। সে ওখানে একই ভাবে বসে তার কাজ করছে। এখনো সেইভাবেই খাবারের একটি কণার শঙ্কানে জঞ্জাল উন্টে পাণ্টে দেখছে। তার অস্তিত্ব আমাকে আচমকা আঘাত করল।

এবারে কর্তব্য স্থির ক'রে ফেললাম। তার কাছে যেতে আর কোন বাধা ছিল না। কাছে গিয়ে পকেট থেকে দুটি টাকা বের ক'রে সামনে ছুঁড়ে দিলাম। আমার হিসাব যতো দিনপনেরো খরচ ক'রে খেতে পারবে সে এই টাকায়। তার পক্ষে দৈনিক দু'আনা—তার স্বপ্নেরও অগোচর।

টাকা দুটি তার কাছে প'ড়ে ঝনঝন ক'রে উঠল। অপ্রত্যাশিত শব্দে সে লেদিকে চেয়ে আমার দিকে চোখ ফেরাল।—সে চোখে ক্লান্ততার কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

কয়েক সেকেন্ডে আমার আশ্চর্য মুখের দিকে চেয়ে দুটি টাকা হাতে তুলে নিল এবং পর মুহূর্তেই তা আমার দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দিল—ঠিক আমি যেমন তার দিকে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। তারপর সে নিজের কাজে মন দিল, যেন কিছুই হয়নি।

ইতিমধ্যে চারদিক থেকে কতকগুলো নোংরা উলঙ্গ ছেলে কোথা থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই টাকার উপর, তারপর কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল তা, তা ভাববার সময় বা মন ছিল না আমার।

আমি নিরোধ নই, লোকচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও কিঞ্চিৎ আছে বলে মনে করেছিলাম, কিন্তু আধুনিক কালকে আমি বুঝি না। অনেক ব্যাপারে এই আধুনিক কালের হাতে ধাক্কা খেয়েছি, আধুনিক ভিখারীর কাছে এই প্রথম।

মাথাটা নিচু হয়ে গেল আপনা থেকেই, কিন্তু চুপচাপ পবাজয় স্বীকার ক'রে নেওয়া বড় কঠিন, সত্যিই কঠিন,—বিশেষ করে একপাল ইঁ-করা লোকের সামনে।

মনে হিংসা জাগল কিছু। তেজের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে তাকে বললাম—“এর মানে কি? তোমাকে দয়া করতে গেলাম, আর তুমি এত বড় নবাব যে সে দয়া নিলে না।”

করণভাবে আমার দিকে চেয়ে সে বলল, “ভিক্ষে তো আমি চাইনি বাবু।”

“চাওনি। ইয়া, ঠিক কথা, চাওনি। কিন্তু দিলাম যখন, তখন না নেওয়ার কি মানে থাকতে পারে? আত্মসম্মান বুঝি?”

ব্যাপার দেখে ভিড় আরও বাড়ল। ই-করা লোকগুলোর ই-আরও বিস্তৃত হ'ল, তারাও আমার পক্ষ নিয়ে নিজ নিজ কচি অনুমায়ী রসিকতা করতে লাগল। আমি আজ এই ইতরদের সগোত্র একথা ভেবে মন খুশি হল না।

ভিখারী খুব দুর্বল কর্তেই কথার উত্তর দিল—বলল, “আত্মসম্মান নয় বাবু, ধর্ম। দুটো টাকা দিয়ে আমার ধর্মে হাত দেন কোন্ বিবেচনায়? আপনি আমার লোকসান ঘটাবেন কেন—আপনি যান—নিজের কাজে যান।”

ভিখারী নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় তার কাজে মন দিল।

মাথা নিচু ক'রে গাড়িতে এনে উঠলাম, সমস্ত দেহ খর খর করে কাঁপছিল, ভয় হল—দুর্ঘটনা না ঘটাই। নোংরা হাতের খোঁচা, নিজেকে ধিক্কার দেওয়া ভিন্ন উপায় কি? কি দরকার ছিল?—আমি যা দিলাম, তাই দিয়েই আমাকে মারল?...

## ২

বন্ধুর বাড়িতে যাবার পথটা বদলে ফেলেছি, অনেকটা ঘোরা পথে যাচ্ছি এখন। হরলাল যমের দুয়ার পর্যন্ত গিয়েছিল, এখন ফিরছে, কিন্তু ভয় সম্পূর্ণ কাটেনি, সূস্থ হতে অনেক দিন লাগবে। এখন আর প্রতিদিন যাই না সেখানে, মাঝে মাঝে যাই এবং বাড়ি থেকেই প্রতিদিন খোঁজ-খবর নিই।

ভিখারীর খোঁচার ঘা অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, মনটাও প্রশান্ত আছে।

এর দিন পনেরো পরের ঘটনা। বন্ধুকে উৎসাহজনক সাহচর্য দান ক'রে সেদিন দোতলা থেকে নিচে নেমে ফটকের কাছে এসেছি, এমন সময় দেখি সেই ভিখারীটা ধীর পদে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে প্রায় আমার সামনে দিয়েই। এমন দুর্বল যে মনে হয় এখুনি পড়ে যাব। হঠাৎ সূবুদ্ধির উদয় হল, চকিতে মনে হল, ওর কি দোষ। ওর কি অভিমান থাকতে নেই। অভিমান শুধু আমারই থাকবে যেহেতু আমি ভদ্রলোক, আমি ভিক্ষা করি না?

আসলে মনের মধ্যে একটা পরাজয়ের গ্লানি তখনও বহন করছি, নিজের কাছে স্বীকার করি আর নাই করি। যেখানে ঝগড়া ক'রে জেতা যায় না, সেখানে ভাল লোক সেজেও জয়লাভ করতে ইচ্ছা হয়, নইলে সুখ পাওয়া যায় না। মন থেকেই এটা চায়, এটা মনেরই ধর্ম।

তাই তখনই মন তার ভোল বদলে ফেলল, একটা ভিখারীকে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া ক'রে আত্মীবন ছোট হয়ে থেকে লাভ কি। বিদ্যাংগতিতে এই চিন্তাগুলো মনের ভিতর বেলে গেল, আমি ভিখারীটাকে ডাকলাম।

আশ্চর্য হলাম, ডাকে সাড়া দিল মে, ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো গেটের ভিতর।—বললাম, “বস।”

অবিলম্বে বসে পড়ল, এত দুর্বল, না বসে উপায়ও ছিল না।

বসেও হাঁপাতে লাগল। বুঝলাম এবারে সে পরাজয় স্বীকার করতেই এসেছে।

বললাম, “কিছু খেতে দিই, কেমন? নইলে চলতে পারবে না।”

“না বাব, এক গেলাস জল দিন, আর কিছু না।”

এখনও তেজ। আবার সেই ধর্মের ব্যাপারই নাকি? ভিখারীর ধর্ম! বুঝলাম কিছু সময় লাগবে। প্রথমে মচকাবে, তার পর ভাঙবে।

কিছু আর বললাম না, ভিতরে গিয়ে বন্ধুর ভৃত্যকে জল এবং তার সঙ্গে তার পথা থেকে কিছু গ্লুকোস মিশিয়ে আনতে নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলাম। আমাকে যে ও চিনতে পারেনি এইটে ভেবে আবার বোধ করছিলাম।

এমন সময় সেই প্রচার ভ্যান কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে চিংকার ক'রে উঠল—“পচা, বাসী খাবার খাবেন না”—ইত্যাদি। যেন চৌকিদার অসতর্ক গৃহস্থকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বেড়াচ্ছে।

ভিখারী ক্ষীণ কণ্ঠে আমাকে বলল—“ওরা সব পাগল, ওদের কথা শুনেই হাসি পায় আমার।”

ভিখারীর হাসি পায় বৈজ্ঞানিক রীতির স্বাস্থ্যতত্ত্ব শুনে। পাবেই তো, কিন্তু সে কথাটি বলতে ওর আটকাল না? লোকটি দার্শনিক, বেশ একটু বেশি মাত্রায়ই দার্শনিক। কিন্তু কেন?

বিরক্তভাবেই বললাম, “এই অজ্ঞ অনিশ্চিত দেশে এর দরকার আছে বৈ কি। বাসী পচা খাবার খাওয়া যে কত অস্বাস্থ্য তা ক'জন জানে. এদেশে? যেটুকু খায় তাও বৈজ্ঞানিক রীতিতে বাছাই ক'রে ব্যালান্সড্ ডায়েট—মানে—সোজা কথায় কি বলি?—মানে দেহ পুষ্টির জন্য যা যা দরকার তা হিসেব ক'রে খায় মা।”

দুর্গন্ধ জামাপরা নোংরা একটা ভিখারীকে আমি এসব বলছি নিতান্ত অস্বাভাবিকভাবে—কেননা ওকে পরাজিত করা দরকার যেমনভাবেই হোক। কিন্তু ওর দুর্বলতম জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছি না এখনও, তীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হচ্ছে বারবার।

এমন সময় ভৃত্য জল নিয়ে এলো। ভিখারী ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল এক গেলাস গ্লুকোসের জল। তারপরেই বিনা ধন্ববাদে বলল, “এবারে উঠি।” বলতে বলতে অকৃতজ্ঞ ভিখারীটা উঠেই পড়ল। আমি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলাম।

কিন্তু ওর উঠে পড়েও ঘাওয়া হ’ল না। হঠাৎ ঐ দুর্বল শরীবে উঠে মাথা ঘুরে গেছে। মনের ঔদ্ধত্য কি দেহ সব সময়ে মেনে নিতে পারে? আমার কিন্তু বেশ একটু উৎসাহ জাগল আবার। এসব লক্ষণ ওব পরাজয়েরই কি ইঙ্গিত নয়?

ও বসে পড়ল এক পা এগোতেই। আমি ভৃত্যকে ইসারা করলাম ঐ জল আরও আনতে। আরও দিলাম তাকে গ্লুকোসের জল। খেল আরও। এবারে আর উঠতে চাইল না। আমি বললাম, “ভাল করে না জিরিয়ে উঠো না।”

“ভুল করেছিলাম, বাবু। হ্যাঁ, একটু বসতেই হবে, মিনিট দশেক বসলেই ঠিক হয়ে যাবে। গ্লুকোস দিয়ে ভালই করেছেন, জোব ঠিক পাব।”

এবারে আমার মাথা ঘোবার পালা। মাথা সত্যিই ঘুরে উঠল আমার। চার দিকে সব বন্বন্ব করে ঘুরতে লাগল চোখের সামনে। স্তম্ভিতভাবে, অর্থহীনভাবে, চেয়ে বইলাম ভিখারীর দিকে। গ্লুকোসের নাম ও জানল কি করে?

ভিখারী তার ছদ্মবেশ যেন একটানে খুলে ফেলল আমার সামনে। সে আমাকে বলল, “আপনার অবাক হবারই কথা। কিন্তু সে কথা যাক। গ্লুকোসে কিছুক্ষণ জোব পাব ঠিকই, কিন্তু আপনি যে ন্যালাক্সড ডায়েটের কথা বলছিলেন, যাতে কার্বো-হাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভাইটামিন সব ঠিক ঠিক মাত্রায় আছে, সে ডায়েট পাব কোথায়?”

আমি বিহ্বল কর্তে প্রশ্ন করলাম, “তুমি—আপনি—জানেন এ সব?”

“জানি-বই কি। অবাক হচ্ছেন? আর শুধু আমি জানি? ঐ যে যারা পচা ফল কিনে খায়, পচা বাসি খাবার খায়, সেই এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক জানে না? তারাও জানে।”

আমি পরাহতের মতো চেয়ারে এলিয়ে পড়লাম, কানের মধ্যে ভেঁা ভেঁা আওয়াজ শুনিছি শুধু—আর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে গ্লুকোসের এত শক্তি।

ভিখারী সোজা হয়ে বসল। সে তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। খামল না, বলে চলল—“জানে, সবাই জানে। আপনি আমি যেমন জানি, তারাও

ঠিক তেমনি জানে, হয়তো বিজ্ঞানের ভাষাটা জানে না। কিন্তু কেন খায় তারা এসব পচা বাসী খাদ্য, ভেবে দেখেছেন কখনো?”

আমি সম্পূর্ণ স্বপ্নের মতো, কিছু না ভেবে বললাম, “না।”

জলের গেলানটা গুর হাতে ধরা ছিল, উত্তেজনায় হাত কাঁপছিল, সে তাড়াতাড়ি আর এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে বলতে লাগল—“আপনি মনে করেন, এই যে দেশের লোকেরা সবাই অখাদ্য গিলছে, তা কি অখাদ্য না জেনে গিলছে? পচাখাদ্য খাচ্ছে সে কি ব্যালাসড্ ডায়েট ফেলে দিয়ে? আপনারা সবাই দেশের লোককে হাইজীন শেখাতে চান। দেখুন, অজ্ঞতাকে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু বোকায় মতো কথা বললে ক্ষমা করা শক্ত।”

আমার মুখ থেকে শুধু অস্পষ্ট স্বরে তৌতলার মতো একটি শব্দ বেরুচ্ছে—  
“আপনি—আপনি”—

“আমি? আমি শুধু অনেস্ট থাকার চেষ্টা করেছিলাম। চাকরি করেছি এককালে, হাইজীন শেখানোরই চাকরি, মশাই। তারপর বয়স হ’ল, অবসর নিতে হ’ল, তারপর আর পেটের ভাত জোটাতে পারিনি। হাইজীন প্রচারের মহিমা উপলব্ধি করেছি অবশ্য। কিন্তু কি হবে শুনে এসব। শোনবার মতো নয় এসব কথা। শুধু একটি নীতি ঠিক রেখেছি, ভিক্ষা করিনি, চুরি করিনি, শুধু অনেস্ট থাকার চেষ্টা করেছি। বোকা এবং অনেস্ট বলতে পারেন। বুদ্ধিমান হতে পারতাম, ভিক্ষা অথবা চুরি করলে। করিনি, তাই তার একমাত্র বিকল্প রেফিউজ বিন থেকে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাওয়া, তাই খাচ্ছি।”

প্রথম ধাক্কায় চিন্তা অসাড় হয়ে পড়েছিল, সেটা কাটতে এতক্ষণ লাগল। না, মূকোমের শক্তি এ নয়। আমি বার বার ভুল করেছি, আর নয়। দাঁড়িয়ে উঠে ভিখারীর হাত ধ’রে বললাম, “আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি কে, আমি জানি না, যদি কিছু মনে না করেন, আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে চলুন—সেখানে আপনি থাকবেন আমাদেরই একজনের মতো, স্বতন্ত্র ক্রটি হবে না, বড় ভাইয়ের সম্মান দেব আপনাকে।”

আমার বহুদিনের জমাট বাঁধা হৃদয় যেন গ’লে গিয়েছিল সে সময়, তাই ভাষায় মাত্রাজ্ঞান ছিল না।

ভিখারী একটুখানি চিন্তা ক’রে বলল, “অনুগ্রহের অন্ত? সে আর হয় না, তাই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমার স্বাধীনতা থেকে আমাকে আর জেলে পুষবেন না। অনেক দুঃখ সবে এই খাওয়া অভ্যাস করেছি। আমারই



সমতলে নেমে এসে ঝারা আমারই সঙ্গে আমার মতোই খায়, আমার সেই ভাইদের ছেড়ে উপরে উঠলে শাস্তি পাব না মনে মনে। তারাও অনেস্ট।... আপনার দয়া আমার মনে থাকবে—”

ভিখারী ধীর পায়ে চলে গেল, আর ফিরেও তাকাল না। কিন্তু আর তাকে ভিখারী বলছি কেন।

তাকে প্রথমে মচকাব এবং পরে ডাঙব এই ছিল আশা। হ'ল না।

আমিই প্রথম মচকেছি।

তারপর সম্পূর্ণ ভেঙেছি।

কারণ বাড়ি ফিরে গিয়ে ভেবে আবিষ্কার করলাম—এবারেও, আমি ওকে যা দিতে গিয়েছিলাম, তাই ছুঁড়েই আমাকে মেরেছে।

## দান-প্রতিদান

১

ছেলেটি জলে পড়তেই একটা মোরগোল উঠল, সবাই তীরে দাঁড়িয়ে হৈ হৈ এবং হায় হায় করতে লাগল।

আমি মাধব চক্রবর্তী দৈনন্দিন সাক্ষাৎসঙ্গ করতাম হেড়য়ার পুকুর বেটনীরে। তখন ছাত্র ছিলাম, পড়া শোনার মনোযোগ ছিল বেশি, খেলা ইত্যাদি দেখে নষ্ট করবার মতো সময় পেতাম না, প্রবৃত্তিও হ'ত না। আমার পক্ষে সে অগ্রে বাসস্থানের নিকটস্থ হেড়য়া পুকুরে সন্ধ্যাবেলা তিনটি বা চাবটি চক্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যরক্ষা করা ভিন্ন গতি ছিল না।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন কলকাতার পথঘাট অথবা হেড়য়া গোলদীঘি অপেক্ষাকৃত জনবিরল ছিল। বেড়াতে আসত অনেকেই, কিন্তু তাদের সংখ্যা গোনা যেত।

পরে আমার অনেকবার মনে হয়েছে—সেদিন দৈবাৎ যদি ঐ দুর্ঘটনার কাছে আমি উপস্থিত না থাকতাম, তা হ'লে ছেলেটির জীবন রক্ষা হ'ত কি না সন্দেহ। তার পিতা হরেন্দ্রকুমারের সঙ্গেও যে একটা সম্পর্ক গ'ড়ে উঠত না, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

জলে ঝাঁপিয়ে পড়া আমার পক্ষে সহজ ছিল। বাল্যকালে পদ্মা নদীরে স্নাতার শিখেছি, এবং ঘণ্টাখানেক স্নাতার না কেটে কোনে দিনই স্নানপর্ব শেষ করিনি।

ছেলেটির বয়স বারো তেরো হবে। সঙ্গে ভৃত্য ছিল। হঠাৎ কি ক'রে জলে প'ড়ে গেল, তা দেখি নি। যখন চীৎকার-রতদের ভিড় ঠেলে তাকে উদ্ধার ক'রে উপরে তুললাম, তখন সে প্রায় জ্ঞানহারা। আমি নিজেই তার প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করলাম, এবং একটুক্ষণ পরেই বোঝা গেল সুস্থ হয়ে উঠতে আর দেরি হবে না। ইতিমধ্যে সম্ভবত ভৃত্যের মুখ থেকে খবর পেয়ে ছেলের বাড়ির লোকেরা হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এলেন এবং ছেলের পিতা ছেলেকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে গেলেন একখানা ঘোড়াগাড়ি ডেকে। বাড়ি থেকে নিজের গাড়ি আনতে দেরি হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল, সে কথা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন উদ্ভ্রান্ত অবস্থায়। ছেলের মাতা আমাকে নিয়ে

পড়লেন। আমি যে কি উপকার তাঁদের করেছি ইত্যাদি। অবশেষে আমার নাম ও ঠিকানা নিয়ে চ'লে গেলেন।

আমি যথারীতি মেসে গিয়ে ভিজ্জে জামা কাপড় ছেড়ে পড়তে বসলাম। আমার দিক থেকে কোনো মহৎ কাজ কবেছি ব'লে মনে কোনো চাঞ্চল্য জাগে নি। আরও কারণ, সামনে বি. এ. পরীক্ষা। আমি স্থির মনেই ত্রিশ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের মেসে দোতলায় ব'সে ট্রামের ঘর্ষর শব্দের সঙ্গে পড়ার শব্দ মিলিয়ে দিলাম।

পরদিন ছিল রবিবার। সকালেই ছেলেব পিতা এসে হাজির। বললেন—তোমাকে একবার, মাধব, আসতেই হবে আমাদের বাড়িতে, আমার স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ। তিনি নিচে অপেক্ষা করছেন।

পড়াটি বেশ জ'মে উঠেছিল, এমন সময় বাধা। নিচে মহিলা অপেক্ষা করছেন, উঠতেই হ'ল। এসে দেখি গাড়িতে তিনি এবং একটি ছোট ছেলে ব'সে আছে। মুখ সবারই খুশিতে উজ্জ্বল। শুধু ড্রাইভারের পাশে উপবিষ্ট কুকুরটির দৃষ্টিতে কিছু সন্দেহ।

আমি আগেই ভেবে নিয়েছিলাম, উপকার যখন একটু করেছি তাব প্রতিদানে রীতিসঙ্গত কিছু লোকাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব না। অর্থাৎ কিছু খেতে হবে এবং গদগদ কৃতজ্ঞতার ধারাবর্ষণ মাথা পেতে নিতে হবে। অতএব আপত্তি ছানানো বৃথা।

বাড়িখানা রাজকীয়, বৈঠকখানায় আসবাবপত্র দামী এবং কচিসঙ্গত। আমার অনুমান মিথ্যা হ'ল না, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চলল সর্বক্ষণ এবং সকালেই যে খাবার আয়োজন হ'ল তাতে সেদিনের মতো আর না খেলেও চলবে এ রকম বোধ হ'ল। কিন্তু এর পরেই এমন একটি প্রস্তাব এলো হরেন্দ্রকুমারের কাছ থেকে যাতে আমি সত্যই বিব্রত বোধ না ক'রে পারলাম না। তিনি আমাকে স্তম্ভিত ক'রে বললেন, “তোমাকে এই মহৎ কাজের জগ্নে কিছু পারিতোষিক নিতে হবে-কিন্তু।”

আমার সকল সত্তা এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ ক'রে উঠল। আমি সত্য এথিক্সের বইখানায় যে অধ্যায়টা পড়ছিলাম, তাতে উদ্দেশ্যহীন, স্বার্থহীন, আনন্দই আমাদের সংকাজে প্রেরণা দেয় কি না এই আলোচনাটি ছিল। কথটি ভাল লেগেছিল। তাই আমি কিছু চিন্তা না ক'রেই বললাম, “পারিতোষিকের লোভে আমি এ কাজ করি নি, সামান্য কর্তব্য হিসাবেই করেছি, কিংবা সে সময় কিছুই না ভেবে শুধু অভ্যাসবশত করেছি।”

হরেন্দ্রকুমার একটু হেসে বললেন, “ও নিয়ে নানা তর্ক আছে। একদিকে ইগোয়িষ্টিক হেডোনিজম্—অন্য দিকে ইউনিভার্সালিষ্টিক হেডোনিজম্। কিন্তু এ সবের বাইরেও আর একটা জিনিস আছে, অর্থাৎ কাজের মূলে যাই থাক, ব্যক্তি বা সমাজের কাছ থেকে তার কিছু দাম পাওয়া উচিত, এই কথাটিই আমি মনে করিয়ে দিতে চাই।”

আমার বয়স কম এবং গোঁড়া আদর্শবাদ মাথায়, তাই দাম পাওয়ার কথা শুনে স্বভাবতই নিজেকে বড্ড ছোট মনে হতে লাগল। অথচ মুখের উপর কোনো প্রতিবাদও করতে পারছি না। তা ছাড়া এ বিষয়ে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণাও ছিল না।

হরেন্দ্রকুমার বলতে লাগলেন, “জ্ঞান, সংসারে প্রেমও নিঃস্বার্থ নয়। তারও দাম দিতে হয়। তোমাদের কবির কথায় পাবে এর উত্তর। দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে যখন তার প্রণয়িনীর মালাখানি চেয়েছিল তখন সে ভাবতে বসল, দিই যদি তো কি দাম দেবে। দাম অবশ্য রাখাল ছেলে দিয়েছিল, কিন্তু মালা পেয়েছিল কি না সে কথা এখানে অবাস্তব।” বলে তিনি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, “যাই হোক, হাসির কথা নয়, তুমি বেহামের লেখা পড়েছ? Defence of Usury? সেও এক মজার নীতি।”—

হরেন্দ্রকুমারের স্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, “ও ছেলেমানুষ, ওর সঙ্গে ওসব কঠিন বিষয়ের আলোচনা করার দরকার কি? তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, “তোমাকে, বাবা, তর্ক শুনতে হবে না, তর্ক করতেও হবে না। উনি একটু কিছু দিয়ে নিজেকে খুশি হ’তে চান। তুমি যেমন একজনের জীবন বাঁচিয়ে খুশি হয়েছ, উনিও তেমনি তোমাকে কিছু উপহার দিয়ে খুশি হবেন, এতে আর আপত্তি করো না, বাবা। আমরা সবাই এতে খুশি হব।”

এই স্নেহ সম্ভাষণে আমার মনটি হঠাৎ খুব নরম হয়ে এলো, সবারই মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এবং মনে হল কুকুরটিও ল্যাঙ্গ নাড়ছে একটু একটু।

২

একটি ছেলেকে জল থেকে উদ্ধার করার জন্তে মনে একটা পবিত্র ভাব ছিল। অবশ্যই, নইলে তার জন্ত মূল্য গ্রহণ করে মনটা এত ধারাপ হয়ে গেল কেন? যে মূল্য পেয়েছিলাম তা দিয়ে তখনকার দিনে একটি জমিদারি কেনা যেত, কিন্তু তা সঙ্গেও মনের মধ্যে একটি খোঁচা অনুভব করতে লাগলাম সর্বদাই।

পাঁচশ টাকার চেক! আমার পক্ষে তখন স্বপ্নের ব্যাপার। কিন্তু মনের কোথাও কি দুর্বলতা ছিল? নইলে সে সময় ওখানা না নিয়ে উঠে এলে কি ক্ষতি হত?

কিন্তু এখন আর ভেবে কি হবে? কারণ ইতিমধ্যে কে যেন এই খবরটি কাগজে বের করে দিয়েছে—“যুবকের সাহস ও কৃতজ্ঞ পিতাব বদান্ধতা।” এই নামে খবরটি প্রকাশিত হবামাত্র সামান্য ঘটনাটি অত্যন্ত বড় হয়ে উঠল সবার কাছে। আমার যা ক্ষতি হল তা আব বলবার নয়। পড়াশোনা চুলোয় গেল, একপাল বন্ধু এসে ধরল খাওয়াতে হবে। দেশ থেকে পিতা চলে এলেন ব্যাপার কি জানতে। আরও আত্মীয়স্বজন দু'একজন ধারা কাছাকাছি ছিলেন তাঁরাও আমাকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। তাঁদেরই মধ্যস্থতায় কোনো বিশ্বস্ত লোকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চেক জমা দেওয়া হল। ঐ টাকার প্রায় সবটাই আমি দান ক'রে দেব এটি মনে মনে আমি প্রায় স্থির ক'রে ফেলেছিলাম। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে আমার পরীক্ষা প্রস্তুতির উপর যে আক্রমণ শুরু হল তা থেকে বাঁচবার কোনো উপায় আমি ভেবে পেলাম না।

কিন্তু উপায় একটি হল নিতাস্তই ভাগ্যবশত। কদিন পরেই একখানা খামের মধ্যে চেকখানা ফিরে এলো ব্যাঙ্ক থেকে—লেখা আছে “রেফার টু ড্রয়ার।”

## সত্যই কি প্রয়োজন ?

ফ্ল্যাটে অল্পদিন এসেছি, প্রতিবেশীদের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয় নি ভাল ক'রে ।  
বাধাও আছে কিছু । আমি আবার সহজে কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে  
পারি না, অসামাজিক দুর্নামটি আমার অনেক দিনের গা সহ্য !

জানি এ সম্পর্কে অনেক কথা উঠতে পারে । আজকের দিনে এমন  
আত্মকেন্দ্রিক হওয়া পাপ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কথাটাই আধুনিক কালে খুব সম্মানজনক  
গুণ নয় । কিন্তু এ সব তর্কের কথা । তর্ক করব না ।

তবে একবারে চূপ করে যাওয়াও হয়তো খুব ভাল দেখাবে না, তাই  
একটিমাত্র কথা বলব ।

কথা না বললেই কি পরিচয় হয় না ? ফ্ল্যাটে ধারা বাস করেন তাঁরা  
অবশ্যই জানেন যে উপরের বাসিন্দারা কখনো কয়লা ভাঙে, পাণের বাসিন্দারা  
কখন দেয়ালে পেরেক ঠোকে, নীচের বাসিন্দারা কখন উত্তনে ধোঁয়া দেয়,  
তাদের এই সব ধ্বনিগত একটা পরিচয় আপনা থেকেই পাওয়া যায়, কার সংসার  
কি রকম চলছে তারও একটা মোটামুটি চেহারা এসবের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি উঠে ।  
এর বেশি আর দরকার কি ? অন্তত আমাব কাছে এটাই যথেষ্ট মনে হয় ।

দেখে খুশি হলাম যে আমার বিপরীত ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ভদ্রলোকটিও প্রায়  
আমারই মতো । কয়েকদিন সিঁড়িপথে দেখা হতেই আমি এটি বুঝতে  
পেরেছিলাম । তিনি কাবো মাতেও নেই পাঁচেও নেই । বেশ শ্রদ্ধেয় চেহারা,  
চুলে পাক ধরেছে, স্বাস্থ্য নিটোল, সাহেবি রং, নাকের ডগা এবং গাল দুটি লাল  
টক টক করছে, বাঙালীর মধ্যে এ রকম বড় একটা দেখা যায় না ।

শিবরামবাবু একা থাকেন, মনে হয় কোনো আত্মীয়বাড়ি বা হোটেলে  
খাওয়ার ব্যবস্থা আছে । তিনি সংঘতবাক এটি আমার কাছে খুবই আশ্রয়প্রদ  
বোধ হ'ল ।

দোতালায় আমার দরজার বাইরে নীতকালে একটুখানি রোদ আসত,  
সেটি তারও দরজার বাইরে ! কিন্তু সে রোদে কাগজ নিয়ে আমিই শুধু বসতাম  
একলা । ধবের কাগজ সম্পর্কে তাঁর কোনো কৌতূহল আমি দেখিনি । ঠিক  
ভারতীয় অভ্যাসের বিপরীত । কাগজ খুললেই অনাহুত পাঠক ঘাড়ের উপর  
দিয়ে ণড়তে শুরু করে, বড় অস্থি লাগে আমার, মনে হয় যেন আমার সঙ্গে  
আমার খাল থেকে অপরিচিত লোক ভাত খেয়ে যাচ্ছে ।

কিন্তু শিবরামবাবুর চরিত্রের একটি দিক একদিন উদঘাটিত হল একটি ঘটনায়। কাগজের হকার নিচের গলিতে হাঁকছিল—রেলগাড়ি উটেছে—বহুত আদমি মারা গেছে—

ঠিক এই মুহূর্তে শিবরামবাবু বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, এসেই আমার হাতে কাগজ দেখে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, রেলদুর্ঘটনা ? কোথায় ? বললাম দুর্ঘটনার কথা। পঞ্জাব মেল লাইন থেকে পড়ে গেছে।

কথাটা শুনে শিবরামবাবুর চোখমুখ কঠিন হয়ে উঠল। তিনি হাত দুখান' পিছনে ফিরিয়ে মাথাটি নিচু ক'রে একবার ঘরে একবার বাইরে পাইচারী করতে লাগলেন এবং আবার হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কত লোক মারা গেছে ?

আমি কাগজ দেখে হতাহতের সংখ্যা বলতে না বলতেই দেখি তিনি সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছেন নিচে। তারপব আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, তাঁর কোনো আত্মীয় সে গাড়িতে ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করারও আর প্রবৃত্তি হয়নি পরে, কেন না ও নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার সময় ছিল না, ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা।

কিন্তু সেদিন আবার শিবরামবাবুর সঙ্গে দেখা। এক টেলিগ্রাম পিওন নিচে জগদীশ সরকারের নাম হাঁকছিল চীৎকার ক'বে। জগদীশ সরকার তেতনার বাসিন্দা। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ির মেয়েরা টেলিগ্রামখানি নিয়ে তার অর্থ বুঝতে এলো নিচে আমারই কাছে। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম জগবন্ধু নামক কেউ তার পাঠিয়েছে—লিখেছে "পিতাব অবস্থা সঙ্কটজনক।"

এমন সময় দেখি শিবরামবাবুর দরজা একটু ফাঁক হয়েছে এবং তাঁর মাথা দেখা যাচ্ছে। মেয়েরা বিমর্ষভাবে চলে গেলেন তিনি এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কার অবস্থা সঙ্কটজনক ? বললাম সব। শুনে তাঁর চোপ দুটি ছলছল ক'রে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজায় তালা বন্ধ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—ঠিক কদিন আগে যেমন গিয়েছিলেন।

একটু বিস্ময় লাগল এই ভেবে যে ইতিমধ্যে আমাদের পরস্পরের এই বারান্দাটুকুর উপর আরও অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, কত হৈ হলো, কত বাইরের লোকের আসর জমানো, কিন্তু শিবরামবাবুকে কখনো দেখা যায় নি, সেগুলির কেন্দ্রীয় আকর্ষণ অবশ্য নিঃসঙ্গ আমি নই, আমার জনপ্রিয় পুত্র। শিবরামবাবুকে দেখা গেল মাত্র দুটি দিন, এবং দুটি দিনই দুঃসংবাদের আকর্ষণে। এবং দুটি দিনই তিনি অস্থিরভাবে বেরিয়ে গেলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি দুঃখ সহ্য

করতে পারেন না, তা সে দুঃখ যারই হোক। তাঁর এই ব্যবহার থেকে তাঁর নির্জনবাসের স্বর্থকথাটিও যেন উপলব্ধি করা গেল।

কিন্তু তবু বাইরে পালিয়ে যাওয়া কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর মিলল না মনে মনে। মাত্র দুটি দিনের ঘটনা থেকে কার্যকারণ সম্বন্ধনির্ণয়ও ঠিক হয় না। একটা কৌতূহল জাগল মনে।

আরও একটা টেলিগ্রাম এলো পরদিন—একই প্রেরক এবং একই নামে। সেটিও আমাকেই ব্যাখ্যা করতে হল, কেননা উদ্দিষ্ট জগদীশ সরকার প্রথম টেলিগ্রাম পেয়েই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

টেলিগ্রামে লেখা ছিল “পিতা শাস্তভাবে পরলোক গমন করছেন।”

পড়তে না পড়তে একদিকে যেমন হঠাৎ মেয়েদের কান্নার হোল উঠল, অন্যদিকে তেমনি দরজার আড়াল থেকে চকিতে বেরিয়ে এলো শিবরামবাবুর বেদনাবিদ্ধ মাথাটি। তিনি শঙ্কিত ভাবে বললেন—অ্যা! মারা গেছেন ভদ্রলোক ? আহা, কি সাংঘাতিক খবর—এত বড় আঘাত, আহা !

বলতে বলতে এবারে কালবিলম্ব না করে ছুটে বেরিয়ে গেলেন, ঘাবার সময় দরজা বন্ধ করতেও ভুল হয়ে গেল।

আমার কৌতূহল আর বাধা মানল না। দুঃখের খবর আর শিবরামবাবুর বহির্গমন, এর মধ্যে নির্ঘাৎ কার্যকারণ যোগ আছে—সন্দেহ রইল না আর।

কিন্তু সেটি কি ? এই প্রশ্নটি হঠাৎ এমন বড় হয়ে দেখা দিল যে আমি নীতিজ্ঞান হারিয়ে তাঁর খোলা দরজার ফাঁকে মাথা গলিয়ে দিলাম। অতঃপর কৌতূহল আমার পা-দুখানা চালিয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। কিন্তু স্মৃতি হল না কিছু। ভদ্রলোক পড়াশোনা করেন খুব বোঝা গেল। টেবিলে একখানি বই বোলা পড়ে ছিল—বেস্বামের ‘পানিশমেন্টস্ অ্যাণ্ড রিগর্ডস্’। সম্মুখস্থ দেয়ালে একটি ইংরেজী নীতিবাক্য ঝুলছে—

BEFORE DOING IT ASK YOURSELF :  
IS IT REALLY NECESSARY ?

প্রথম দিনের অভিযানে এর বেশি আর কিছু পাওয়া গেল না, অথচ ভবিষ্যতেও যে আর কোনো স্ফোগ পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনা কম। অনধিকার প্রবেশের চেতনাতে অস্বস্তি বোধ করছিলাম, নিজেকে ছোট মনে হতে লাগল খুবই, তাই জুত বেরিয়ে এলাম। ঘরে কিরেও মনটা ধমে রইল। তবে এই অনধিকার প্রবেশ থেকে একটি শিকার পেয়েছি—এ নীতিবাক্যটির শিকার।



ওটি যেন আমারই জন্তে লেখা ছিল। আমার কৌতূহলের জবাব ওটা।—  
“কবিবার পূর্বে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিও ইহা কি সত্যই প্রয়োজনীয় ?”

কিন্তু আমি সেই দিনই রাতে এ প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। একটা সূক্ষ্ম  
রশ্মিরেখা ক্রমশঃ অনিবার্যরূপে বিস্তার লাভ ক’রে মনকে আলোকিত ক’রে  
তুলেছে। সেটি এই যে “সত্যই প্রয়োজনীয় কি না” ভাবতে গেলে দেখা যায়  
আমরা অনেক-জিনিসই অকারণ করি, ঐ প্রশ্ন মিলিয়ে কাজ করতে গেলে  
শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী হওয়া ভিন্ন গতি থাকে না, অথচ সন্ন্যাসী হওয়া তো আর  
মুখের কথা নয়। তাই প্রয়োজন সৃষ্টি ক’রে নিতে হয় মনে মনে। যা প্রাণ  
চায়, সেটাই ভয়ানক দরকার, ভেবে না নিলে যা প্রাণ চায় তা করা যায় না।

কিন্তু তত্ত্বকথা থাক। সে দিন গভীর রাতে শিবরামবাবু কোনো রকমে  
সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন। পা এতই টলছিল যে রিকশ থেকে নেমে  
হু পাও এগোতে পারেন নি, সশব্দে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। রাজ্যের  
শাস্তি বিঘ্নিত হওয়াতে ঘটনাটি আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারল না। অবস্থা  
এমনই দাঁড়াল যে আমরাই কজন ঠুঁকে ধরাধরি ক’রে ঘরে পৌঁছে দিলাম নাকে  
রুমাল বেঁধে।

শ্রদ্ধা হঠাৎ যা খেল। হয়তো সেই জন্তেই ভীষণ ঘৃণা হল শিবরামবাবুর  
উপর। একবার এমনও মনে হল—সত্যই কি প্রয়োজন ছিল তাঁকে সিঁড়ির  
গোড়া থেকে উপরে তোলার ? তিনি তো মদ খাওয়ার “প্রয়োজন” সৃষ্টি ক’রে  
বিবেককে ভোলাচ্ছেন এই ভাবে, আমার বিবেককে ভোলাই কি দিয়ে ?

## বাটখারা

ময়দানের বৃকে সন্ধ্যা নেমে এলো। রাজপথের পাশের দোকানগুলিতে আলো জ্বলেছে অনেক আগেই, সে আলো ক্রমশ উজ্জ্বলতর হচ্ছে। যেন কৃষ্ণ রাত্রির আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থের সভা সাজাচ্ছে ময়দানব, ময়দান প্রান্তে।

বিশ্রামরত জনতা এক এক দলে ভাগ হয়ে অলসভাবে দূরে দূরে বসে আছে। এক একটা বৃক্ষগুচ্ছ ঘনতর অন্ধকার বৃকে নিয়ে সমস্ত পরিমণ্ডলকে রহস্যময় ক'রে তুলেছে। যে দিকে তাকানো যায় সব রোমাঞ্চিক মনে হয়, এই রুঢ় বাস্তবতার দিনে যা চিন্তা করাও পাপ। এ গল্পটিও তাই এ যুগের শেষ রোমাঞ্চিক গল্প।

অরুণ আর মাধবী একখানি বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে। দূরে চৌরঙ্গীব কড়া আলোর দিকে চাইতে তাদের ভাল লাগছিল না। সব ভাল্গাব মনে হচ্ছিল। যে নদীর পাড় এখনই ভেঙে পড়তে পারে তার কিনারায় বসে কিছুই ভাল লাগে না।

দু'জনে নীরবে বসে আছে। দু'জনের মাঝখানে শুধু একটি র্যাশন খলে, তার মধ্যে আড়াই সেরের একটি বাটখারা। অরুণ এটি সজে এনেছে কেন তা সেই জানে।

কিন্তু কেন দু'জন সক্ষম ব্যক্তি দৃঢ় মাটির নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ফাটলধরা পাড়ে এসে বসেছে? কি তাদের দুঃখ? র্যাশনের চাল কমিয়ে দেওয়াব দুঃখ? আসামের ভূমিকম্প? বিহারের বন্যা?

না। এ সব বহির্জগতের ছোঁয়াচ থেকে ওরা কিছুকাল মুক্ত আছে। শুদেব বর্তমান সমস্যার কথা বলতে গেলে এক বছর আগের স্ত্রীমার পার্টির কথা তুলতে হয়। স্ত্রীমার থেকে জলে-পড়া মাধবীর প্রাণ বাঁচিয়েছিল অরুণ সেই এক বছর আগে। কিন্তু যে রাগ দুর্ঘটনা দিয়ে শুরু, তার শেষও একটি বড় দুর্ঘটনা। বহু নজীর আছে।

এমনই ঘটে। যে অরুণ জলে-পড়া মেয়েকে বাঁচিয়ে হয়েছিল হীরো এবং সামাজিক মূল্যে আজও যে হীরে, সে আজ এই মুহূর্তে কয়লা হয়ে যেতে পারে এমন সঙ্কট দেখা দিয়েছে। থেকে থেকে তার মনের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে। থেকে থেকে তার চোখ দুটি ভয়ানক হয়ে উঠছে, আর বারবার সে তার পাশের র্যাশন খলেটা হিষ্টিরিয়া রুগীর মতো শক্ত ক'রে চেপে ধরছে। যেন কত বড় একটা আশ্রয়।

দৃষ্টি কিন্তু তার আকাশের দিকে। হায় বে অবুঝ মন। এখনো সে অসম্ভব কল্পনায় ডুবতে পারছে। মাধবীর নীরবতার অর্থ না বুঝেও তার কল্পনা ছুটে চলেছে বলাহীন। এখনও সে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে, সে যেন একটি দেশী হাউই, ফুলিঙ্গের আকাশ-ছোয়া সুদীর্ঘ পতাকা উড়িয়ে উর্ধ্ব ছুটে চলেছে। যেন সে বিজ্ঞানীদের পবিকল্পিত চন্দ্রলোকগামী বকেট, যে শক্তি তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, সে তাব অস্তরবাসী মাধবী। কল্পনা করছে, আর তার মাথা ঝিম ঝিম ক'রে উঠছে।

একটি বছর ধবে অরুণ পুরুষের চিরদিনের কপসৃষ্টির ধারা অনুসরণ ক'বে মাধবী নামক অতি সাধারণ একটি মেয়ের উপর রঙের পর রঙ চাপিয়ে তাকে এমন এক অনির্বচনীয় শোভায় দাঁড় করিয়েছে যে, তার চোখে সে ভিন্ন আর কিছু সুন্দর নেই, কখনো ছিল না, কখনো হবেও না। প্রথমে সে তার মূর্তির উপর (১) বেগুনি চাপিয়েছে, তারপর (২) নীল, তারপর (৩) সবুজ, তারপর (৪) হলুদ, তারপর (৫) জ্বদা, তারপর (৬) লাল। তারপর কপালি, তারপর সোনালি। তারপর তাকে পবিষেছে সূক্ষ্ম বামধন্য রঙা মসলিন, তারপর তাকেও বেষ্টন করেছে তার আরও সূক্ষ্ম স্বপ্ন আবরণ। আর শুধু স্বপ্ন নয়, বাজার থেকেও অনেক আবরণ কিনতে হয়েছে।—বেনারসী, জর্জেট, ঢাকাই। এই তো সেদিনও সে নিজের জুতো কিনতে গিয়ে সেই টাকায় কিনল একটি ভ্যানিটি ব্যাগ।

এই মাধবীকে আজ শেষ কথাটি বলতে হবে—বিবাহে রাজি আছে কি না। এই প্রথম প্রশ্ন এবং এই শেষ প্রশ্ন। এর আগে এ প্রশ্ন ওঠে নি, শুধু জমি তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু অরুণের এমন ভ্রান্তি ঘটল কেন? আগে তো তার মুখেই শোনা গেছে, প্রেম যখন মানুষকে উন্নাদ করে তখনই বুঝতে হবে প্রেমের ধ্বংসও আসন্ন হয়ে এসেছে। তখন তাকে বিবাহ নামক সমাধিক্ষেত্রের দিকে ছুটতে হয়। সে তখন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে। সমাধি রচিত হয় বিবাহ বাসরে। এই সমাধিক্ষেত্রে ধরাপৃষ্ঠ আকীর্ণ হয়ে আছে। প্রেম ও বিবাহ তাই জীবন ও মৃত্যু। অরুণই এতদিন বলেছে প্রেম ও বিবাহ ভাল নয়, বিবাহ এবং প্রেম ভাল, কারণ শেষেরটিতে বিবাহ মারা পড়ে, প্রেম বেঁচে থাকে। কিন্তু আজ তাব বুদ্ধি আচ্ছন্ন। সে আজ একটি বাজে প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় বোকার মতো আকাশের দিকে চেয়ে আছে। তার শেষ আশ্রয় ব্যাশনের ধলে আর আড়াই সেরের বাটখারা।

তার পাশে মাধবীও চিন্তাহীন নয়। অরুণের দৃষ্টি আকাশের একটি ক্ষীণ নক্ষত্রের দিকে কিন্তু মাধবীর দৃষ্টি নিচের দিকে সাত নম্বরের একটি বিশেষ

জিনিসের প্রতি। মেয়েদের কল্পনাশক্তি কম এ কথাটির সমর্থনস্বরূপ নয়, তার প্রতিবাদ স্বরূপই। অরুণের মন হাইড্রোজেনের মতো উর্ধ্বগামী, মাধবীর মন পায়দের মতো নিম্নগামী, কিন্তু কল্পনাশূন্য নয়।

সে ঐ সাত নম্বরের জিনিসটি থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না, কারণ সেও তার মধ্যে দিয়ে একটি জগৎকে দেখছে, যদিও সে জগৎ রঙীন জগৎ থেকে কিছু স্বতন্ত্র। সে জগৎ ছিন্ন জগৎ। জোড়াতালি দেওয়া। যেন গিবন রচিত বিখ্যাত ইতিকথা, যেন তাতে একটি সাম্রাজ্যের ঘৃণ ধরার কথা সবিস্তারে লেখা আছে।

কিছুই না, সাত নম্বরের একপাটি জুতো। অরুণের যে পা-খানি তার হাঁটুর উপর দিয়ে মাধবীর দিকে এগিয়ে এসেছে সেই পায়ে আছে সেই জুতো। তার চামড়া ভাঁজে ভাঁজে ফেটে গেছে, মূদ্র আলোতেও তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সোলের পাশ থেকে একখণ্ড তালি উপরের দিকে শেলাই করা। জুতোধারীর দায়িত্বের ইতিহাস তার প্রতিটি শেলাইয়ে গাঁথা। ফাটা চামড়ার ফাঁকে ফাঁকে যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে সেই অন্ধকারে একটি কর্মহীন বেকার জীবনের বেদনাময় ইঙ্গিত। এই জুতো যে পা বহন করছে এবং সেই পা যে মানুষটাকে বহন করছে তার দায় কতটুকু?...সমস্ত পূর্বরাগ ভেদ ক'রে মাধবীর মনে এই প্রশ্নটি হঠাৎ কাটার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সমস্ত প্রেম দলিত ক'রে ঐ ফাটা জুতো তার কল্পিত বিবাহিত জীবনের শিরে আঘাত হানতে থাকবে দিনেব পর দিন। ভাবতেও মাধবী শিউরে উঠল। কেন এতদিন সে তাব মুখের দিকেই চেয়েছে, জুতোর দিকে চায় নি? কেন মালা গাঁথার আগে শুধু ফুলের দিকেই তাকিয়েছে, জুতোর দিকে তাকায় নি?—মাধবীর চোখ দুটি দুঃখে যুগায় অশ্রুসিক্ত হয়ে এলো। সে মনটাকে তাড়াতাড়ি কঠিন ক'রে অরুণের শেষ প্রশ্নের উত্তরে শেল উত্তর জানিয়ে দিল—“না”। সে সময়ে তার মুখের দিকে চাইলে মনে হত যেন স্বর্গের কোনো দেবী কথাটি উচ্চারণ করছে।

সঙ্গে সঙ্গে অরুণের সমস্ত দেহে এবং বিশেষ ক'রে ঘাড়ে ধলুপটকারের যে সব লক্ষণ দেখা গিয়েছিল তার বর্ণনা নিস্পয়োজন। সে সময় যে শক্তিতে সে তার খলেটি চেপে ধরল তা মানবশক্তি ছেড়ে অশ্বশক্তির সীমানায় পৌঁছেছিল। সে প্রস্তুতীকৃত ঘাড়ে উর্ধ্বমুখী অবস্থাতেই খলেটি তুলে নিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে গিয়ে একখানা রিকশার উপর চেপে বসল এবং বলল, “জোর চালাও, চাঁদপাল ঘাট।”—

রিকশা চলতে চলতে তার মনের মধ্যে যে প্রলয়লীলা চলতে লাগল তার চেহারাটা এইরকম—

প্রথমতঃ, মাধবীকে ঘিরে সে যে স্বপ্নকাল রচনা করেছিল তা ছিঁড়ে গেল।

তারপর রামধনু-রঙা সূক্ষ্ম মসলিনের আবরণটাও ছিঁড়ে গেল।

বেয়িরে পড়ল মোনালি রঙ, কয়েক সেকেন্ডেও মধ্য সেটাও ফিকে হয়ে রূপালি রং দেখা দিল, তারপর লাল গেল, তারপর জ্বরদা, তারপর হলুদ, তারপর নীল, তারপর বেগুনি—স্পেকট্রামের কাঁচখানাই যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল পান্নাণ পথের উপর। রিকশ ছুটে চলেছে হাঙ্কা যাত্রীকে বহন করে। অরুণের শাদা চোখে ফুটে উঠল শাদা মাধবী, অতি সাধারণ, কুত্ৰী, কুরূপা একটি মেয়ে! একটি নিখাসে যৌন-সৌন্দর্য এমনি করেই মিলিয়ে যায় এক ধাক্কায়। নির্বোধ পুরুষ তবু ওরই নাম দেয় প্রেম।

অরুণ দ্রুত রিকশওয়ালাকে বিদায় করে গঙ্গার ধারে এগিয়ে গেল এবং বাটখারাস্থ থলেটি গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে জুতো খুলে ফেলল পা থেকে। তারপর আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দেবে, এমন সময় তাব মনে হল, “কার জন্তে?”

পর মুহূর্তেই দেখা গেল থলেটি গলা থেকে খুলে ‘রিকশ—রিকশ’ করতে করতে সে ছুটে চলেছে অদৃশ্য রিকশকে অনুসরণ করে। জুতোর কথা ভাববার আর তার সময় ছিল না।

এদিকে ময়দানে একা মাধবী কিছুক্ষণ চিন্তামুঢ় অবস্থায় কাটাবার পব তার পেয়াল হল কি ঘটেছে এবং ঘটতে যাচ্ছে। বুঝতে বাকী রইল না অরুণ গঙ্গার দিকে গেল কেন। নির্বোধটা নিশ্চয় আত্মহত্যা করতে চায়।

মাধবীও একখানা রিকশয় উঠে চলল গঙ্গার দিকে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই তার চোখে পড়ল সেই পরিচিত জীর্ণ জুতো জোড়া। তার সূক্ষ্ম মস্তিষ্কও এ দৃশ্যে সাময়িকভাবে যেন বিম্ব বিম্ব করে উঠল। বসে পড়ল সে ঐ খানেই। সঁতার জানত সে। একবার তার মনে হল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরুদণ্ডহীন বাঙালী উদ্ধারের কাজে লাগলে কেমন হয়? কল্পনাটা মন্দ লাগছিল না, কিন্তু তখনি তার মনে আর একটি প্রশ্ন জাগল, “লাভ কি?”

জীর্ণ জুতো জোড়ার উপর একটি দীর্ঘনিখাস পড়ল শুধু। নিছকের ভবিষ্যৎটা চকিতে একবার দেখে নিল মাধবী। উৎকৃষ্ট জুতোর খোঁজেই ঘুরে বেড়াতে হবে এর পর থেকে, কিন্তু কত দিন কে জানে?

## একটি অর্থ নৈতিক গল্প

ভবানন্দ, মুকুন্দ আর জনার্দন ।

ওরা তিনজনেই ছিল আমার সহপাঠী নিকট বন্ধু । আমরা ইন্টারমীডিয়েট পর্যন্ত একসঙ্গেই ছিলাম, কিন্তু তারপর আমি প্রাণী-বিজ্ঞান এবং ওরা ইতিহাস ও অর্থনীতির দিকে ঝাঁকাতে আমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল, ওরা শেষ পর্যন্ত হল কলেজের প্রোফেসর, আর আমি আমার পৈতৃক সঞ্চয় আর নিজস্ব বিজ্ঞান সাহায্যে আমার বাড়ির বহিরঙ্গনের এক নির্জন কোণে কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম ।

কিন্তু এ আমাদের নিতান্তই বাইরের পরিচয়, এতে আমাদের বন্ধুত্ব কিছুমাত্র নষ্ট হয় নি, কারণ ঐ তিন জনের চরিত্রে এমন এক মহা আকর্ষণীয় গুণ ছিল যা আমাকে মুগ্ধ করত, হয়তো ওদের প্রতি আমার যে সহৃদয় ওদার্য ছিল তাতে আমিও ওদের মুগ্ধ ক'রে থাকব ।

ওরা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব চরিত্রের, ওদের চিন্তায় এবং কাজে একটা কৌতুককর মৌলিকত্ব ছিল যাতে ওদের চারপাশের আবহাওয়া হাসিতে হলাতে নাচে গানে সব সময় উজ্জ্বল হয়ে থাকত । এমন কি প্রোফেসর হবার পরেও যখন সামান্য বেতনে ওদের চলা দুঃসাধ্য হল তখন বিনা বিধায় মুখে বং মেখে ঘুঙুর-পায়ে সন্ধ্যাবেলা পথে পথে নেচে গেয়ে পেটেট ওষুধ বিক্রি করতে শুরু করল, এবং দিনের ও রাতের উপার্জন মিলিয়ে সচ্ছলতার সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ সরসতা বজায় রেখে চলল ।

এর মধ্যে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং ঝঞ্ঝাট দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল, কত দাঙ্গা, কত মৃত্যু, তবু ওদের উজ্জ্বলতা কিছুমাত্র দমল না, বরঞ্চ নব স্বাধীনতার দমকা হাওয়ায় ওদের প্রাণধর্ম আরও খানিকটা মাথা তুলে সবার উপর দিয়ে ছলতে লাগল । শুধু দোলা নয়—সে মাথায় সর্বত্র ওঁতো মেঝে, বেড়ানোর প্রবৃত্তিটিও বেশ ভালই জেগেছিল, আর তার প্রমাণও পেলাম আমারই গবেষণা-ঘরে ।

দমকা হাওয়ার মতোই এসে ঢুকল একদিন ওরা তিনজন—হলা করতে করতে । মুকুন্দ হাসতে হাসতে আমাকে ডুই ঝাঁকানি দিয়ে বলল, “কীটের সঙ্গে তুইও কীট হয়ে পড়েছিস, একবার বাইরে যা—বাইরে যা—দেখ কি আন্দোলৎসব চলছে সেখানে ।” ভবানন্দ হঠাৎ চিৎকার ক'রে বলে উঠল,

“এ কি ! আজকের দিনে তুই এতগুলো প্রজ্ঞাপতিকে বন্দী ক’রে রেখেছিস”— বলতে বলতেই আমার প্রজ্ঞাপতির বাক্স খুলে সবগুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। কিন্তু তারা হাওয়াতেই যেটুকু উড়ল, তার বেশি নয়, কারণ সেগুলো সবই বহুদিনের মরা প্রজ্ঞাপতি। জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে ছিল কতকগুলো মাকড়সা, তবে তারা বন্দী ছিল না, তাদেরই জালে স্বাধীনভাবে বসে ছিল, কিন্তু জনার্দনের তা পছন্দ হল না, সে সেই জাল ছিঁড়ে দিল অকারণ।

আমি বললাম, “আঃ ! তোরা করছিস কি, এলি অনেক দিন পরে, স্থির হয়ে বোস্—”

ভবানন্দ চীৎকার ক’রে বলল, “স্থির হয়ে বসব কি রে ? কি সব ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে তোরা যে হৃদয়ঙ্গমই হচ্ছে না।”

“কি এমন ঘটে যাচ্ছে ?”

ভবানন্দ লাফিয়ে উঠে বলল, “স্বাধীনতা !—সবার চেহারা বদলে যাবে—যা কিছু পুরনো সব নতুন হয়ে যাবে—যা কিছু—”

মুকুন্দ আমার একখানা হাত খপ্ ক’রে ধ’রে উন্মাদের মতো আমার দিকে চেয়ে বলল, “শুধু চেহারা বদলাবে না, নামও বদলাবে ! তোমার ঐ ছগলী নদী আর ছগলী নদী থাকবে না—ঢাকুরিয়ার হৃদ আর ঢাকুরিয়া হৃদ থাকবে না—বঙ্গোপসাগরও নতুন নাম পাবে।”

আমি বললাম, “কি রকম ?”

মুকুন্দ বলল, “ছগলী নদীর নাম হবে মধুমতী—কারণ সেখানে জলের বদলে বয়ে যাবে মধু—আর মধু। ঢাকুরিয়া হৃদের নাম হবে দুধ-সরোবর। কত দুধ চাই ?”

বলতে বলতে তিন অধ্যাপক দাঁতের মাজনের গান গেয়ে নাচতে শুরু করল, আমি সভয়ে আমার মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রটি আলমারীতে বন্ধ করলাম। ওরা বিজ্ঞান-ঘরে উল্লাসের যে ঘূর্ণি হাওয়া বইয়ে দিল, সাময়িকভাবে আমিও ওদের স্ফূর্তিতে যোগ না দিয়ে পারলাম না। তার পর যাবার সময় আমাকে টানতে টানতে পথে বের ক’রে বলল, “আর ঘরে ফিরিস না এখন।”

ভিতরে ভিতরে সামান্য একটু আশা বা বিশ্বাসের দানা থাকলে ওরা এই ভাবেই তাকে কেন্দ্র ক’রে অনেক কিছু ফাঁপিয়ে বলতে পারে, সূত্রাং দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওদের মনে যে কিছু আশা ছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। ওদের কথা শুনে তাই আমারও মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে রইল।

কিন্তু ক্রমে দিন যায়, দেখি লোকের মুখ শুকনো, তাতে নিরাশার ছায়া। বাজারে নাকি চাল দুর্লভ, কাপড় পাওয়া যায় না, খবর পাই ; ক্রমে চিনি,

কয়লা, হুন, অদৃশ্য হচ্ছে। সরষের তেল নেই, ঘি নেই, দুধ নেই, মাছ নেই, মাংস নেই।

আর সবচেয়ে শোচনীয়, কিছুকাল ভবানন্দ, মুকুন্দ এবং জনার্দনেরও দেখা নেই। এই শেষের ঘটনাটিই আমার কিছু উদ্বেগের কারণ হয়ে রইল। ওরা কেমন আছে এখন কে জানে! কি করে যে গুদের চলছে কল্পনা করতে পারি না। কলেজের বেতনে চলা অসম্ভব, হয় তো ফেরিওয়ালার কাছে বেশি মন দিয়েছে, কিংবা অল্প এমন কোনো কাজ, যাতে আর দেখা করার সময় পাচ্ছে না।

মানুষের জগৎ হতে দূরে থেকে আমার ভালই হয়েছে এ কথা চিন্তা করি মাঝে মাঝে। আমার কীটপতঙ্গের জগতে কোনো রূপান্তর নেই, তাই আমার দিন কাটে ভাল। সম্প্রতি মংস্তুক মাকড়সা নিয়ে একটা গবেষণার মেতে আছি। জলাধার থেকে মাছ টেনে তুলে কি কৌশলে সেটাকে পাওয়ার ব্যবস্থা করছে। কৌশলগুলো দিনের পর দিন লক্ষ্য করছি আর নোট বইয়ে টুকে টুকে রাখছি। বিষয়টি এমনই আমাকে ডুবিয়ে রেখেছে যে, আমার কাছে আর সব মিথ্যা হয়ে গেছে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক, শুধু আমি থাকি আর থাক এই গবেষণাগারটি। আমাকে ঘিরে মধুর হাওয়া বয়ে যায়, আমার এখানে যে ফুলের গাছগুলি আছে তার উপর বোদ এসে খেলা করে, জলাধারটি ঝলমল করে ওঠে, মাছেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, পাখীরা গান গায়, সব মিলিয়ে আমার এই নির্জন অঙ্গনটি এক অপার্থিব আনন্দ-রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু যখন মনে পড়ে (এবং বর্তমানে মাঝে মাঝেই মনে পড়ছে) যে আমার ব্যাঙ্কের হিসাবে জমার দিকটি বেশ খালি হয়ে এসেছে, তখন মনটা দমে যায়, তখন বুঝতে পারি এক দিন (এবং সে দিনের বেশি দেবি নেই) আমার এ রাজ্যটির আর অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হবে না, এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েই মিলতে হবে, জানি না নাচতেও হবে কি না। স্মৃতরাং দেশের অবস্থা একটু ভাড়াভাড়া ফেরা দরকার এ বিষয়ে মানসিক উদ্বেগ ক্রমশই অদম্য হয়ে উঠছে। এমন সময় আমার মনে আশা জাগিয়ে ভবানন্দ, মুকুন্দ এবং জনার্দন এসে পড়ল একদিন ধুমকেতুর মতো। আমিই এবারে আনন্দে নেচে উঠলাম এবং প্রশ্নের পর প্রশ্নে গুদের অস্থির করে তুললাম।

কিন্তু গুদের খবর ভাল নয়। বা শুনলাম তা এই যে, ছদ্মবেশ ধরা পড়াতে কলেজের চাকরি গেছে তিনজনেরই। কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন, “কলেজে থাকতে হলে সাক্ষ্য ব্যবসা ছাড়তে হবে, আর যদি ব্যবসা রাখতে চাও তা হলে কলেজ ছাড়!” ওরা তিন জন অনেক পরামর্শ করে কলেজ ছেড়ে দেওয়াই ঠিক



করেছে, কেননা মুখে রং মেখে নেচে গেয়ে ফেরি করার উপার্জন অনেক বেশি। তা ছাড়া ছদ্মবেশী ফেরিওয়ালার হওয়াতে প্রোফেসর হিসাবে কলেজে যে পরিমাণ সম্মানের হানি হয়েছে, ক্রেতারা ঘুড়ুর-পায়ে রং-মাখা ফেরিওয়ালার মতো কেউ কোনো না কোনো কলেজের ছদ্মবেশী প্রোফেসর মনে করে সেই পরিমাণ খাতির করেছে। ফলে সন্ধ্যাবেলার এই নৃত্যরত ব্যবসায়ীমাত্রেরই খুব সুবিধা হয়ে গেছে।

মুকুন্দ বলল, “তা ছাড়া ফেরিওয়ালার একটা ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু কলেজের প্রোফেসরের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বিশেষ করে বাংলা বিভাগের পর কলেজে ছাত্রের সংখ্যা আর প্রোফেসরের সংখ্যা দুই-ই বেড়ে গেছে এবং বোধ হয় প্রোফেসরের সংখ্যাই বেশি হয়েছে আর তার ফলে আগে যেখানে একই প্রোফেসর মজুরদের মতো দু’ শিফট তিন শিফট করে কাজ চালিয়ে ‘এক্সট্রা’ পেত, এখন আর সে সুযোগ ততটা নেই। প্রোফেসরদের মধ্যে যারা চতুর তারা সবাই খবরের কাগজে ঢুকে গেছে, আর যারা আমাদের মতো বেপরোয়া তাদের দিন চলছে না।”

আমি বললাম, “কিন্তু দেশের এ অবস্থায় ফেরি করার ভবিষ্যৎই বা কোথায়? ফেরিওয়ালার সংখ্যাও তো অনেক বেশি হয়েছে শুনেছি।”

এই প্রশ্নে ওদের তিন জনেরই মুখ থেকে নিরাশার অঙ্ককাব দূর হয়ে দপ করে আশার আলো জলে উঠল।

ভবানন্দ বলল, “দেশের অবস্থা তো ফিরছে অল্প দিনের মধ্যেই, কাজ শুরু হয়ে গেছে, যুগান্তকারী সব পরিকল্পনা, ভয়টা কিসের?”

মুকুন্দ বলল, “এক দামোদের বাধ তৈরি হলেই আমাদের সব অভাব ঘুচে যাবে।”

জনার্দন বলল, “কিন্তু তারও আগে আমাদের দুধের অভাব একেবারে মিটে যাচ্ছে, দেখ নি খবরের কাগজে পশ্চিমা গোকুর ছবি?”

আমি-কাগজ কদাচিৎ পড়ি, তাই জানতাম না।

জনার্দন বলতে লাগল, “শুধু তাই নয়, ফসল বাড়াও আন্দোলন আছে এর সঙ্গে। সব যদি মিলিয়ে দেখ, তা হলে বুঝতে পারবে আমাদের মুখের রং অল্পদিনেই ধুয়ে ফেলতে হবে, তখন আর ফেরিওয়ালার সেজে নাচক না, আনন্দে নাচব।”

লক্ষ্য করে দেখলাম তিন জনেরই পা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার পর হঠাৎ দোখ মুকুন্দ এক লাফে উঠে গিয়ে আমার ফুলের গাছগুলো উপড়ে তুলে

ফেলছে আর চিৎকার করে বসছে, “এখানে বেগুন লক্ষা সিম যা হয় লাগাও, ফুল আর চলবে না।”

জনার্দন টেলিফোন থেকে একটি কাচের লম্বা-গলা পাত্র তুলে নিয়ে বাইবে ছুঁড়ে ফেলল দিন। আমি বাধা দেবার আগেই কাজটি শেষ হয়ে গেল, বলল, “এ সব আর কি কাজে লাগবে? আনন্দ কর, আনন্দ কর।”

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, যাবার সময় লক্ষ্য করলাম, ওদের চোখের চারদিকে একটা কালো চক্র দেখা দিয়েছে।

বেশ বোঝা গেল ভিতরে ভিতরে ওদের মনের মধ্যে নৈরাশ্র স্থায়ী বাসা বেঁধেছে, বাইরে যে আশার কথা শোনাতে চেয়েছিল তা ওদের হয়তো অস্তরের কথা নয়, তাই গাছ উপড়ে এবং কাচের পাত্র ভেঙে যে আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তার সঙ্গে ওদের মনের সুর মিলল না, কয়েক মাস আগে হলে ওদের এই ভাড়াচোরার কাজে হয়তো আমিও যোগ দিতাম, কিন্তু আজ পারলাম না বলেই আমার মনটা বড় খাবাপ হয়ে গেল। আমার মনে একটা প্রশ্ন ভেসে উঠল, অদম্য আশার সৌধ যদি এমন ক’বে ভেঙে পড়তে পারে, তা হলে আমিই কি সংসার থেকে পালিয়ে একা বেঁচে যাব?

এর পর মাসখানেক কেটে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে কাছাকাছি ম্যাডক্স স্কয়ারের এক কোণে মাঝে মাঝে চূপচাপ গিয়ে বসে থাকা আমার অভ্যাস। আমি যে কোণটিতে প্রায় বসি, সেদিন দেখি তিনটি কঙ্কালসার ব্যক্তি সেখানে বসে হাই তুলছে। একটু কাছে আসতেই চিনতে পারলাম তাদের এবং চিনে চমকে উঠলাম। আলাপের ভাষা খুঁজে পেলাম না, পুরনো কথাই তুললাম—জিজ্ঞাসা করলাম, “দামোদর বাবের খবর কি?”

ভবানন্দ বলল, “দামোদর বাব বোধ করি এ জীবনে আর দেখা যাবে না।”

“তুচ্ছ পরিকল্পনা?”

“ফোটোগ্রাফটি রেখেছি সঙ্গে, আর কিছু জানি না।”

“কমল বাড়াও আন্দোলন?”

“আর এক পুরুষ পরে জিজ্ঞাসা করিস।”

তারপর শুক হাসি হেসে বলল, “কিছু টাকা ধার দিতে পারিস—অবশ্য শোধ দেওয়া সম্পর্কে একটু সন্দেহ রেখেও?”

বাডিতে ডেকে নিয়ে গেলাম ওদের।

ইতিমধ্যে আমার একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি নিজের

কাজে মেতে থাকি সে জন্ম বাইরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ঘরের প্রতিও আমি যে এমন উদাসীনতা প্রকাশ ক'বে এসেছি তা এত দিন খেয়াল করিনি। এক দিকের একাগ্রতা ভেঙে যাওয়াতে এতদিনে অন্য দিকেও দৃষ্টিপাতের সুযোগ এলো। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী শ্রীমতী অমলা ভয়ঙ্কর রকম বোগা হয়ে পড়েছে। আমাদের বিবাহ হয়েছে পাঁচ বছর। স্বাস্থ্যবতী শিক্ষিতা স্ত্রী, ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে বি এ পাস করেছে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে সে সবদা তাব বিচার পরিচয় ঢেকে রাখাবই চেষ্টা ক'বে এসেছে, কারণ সামান্য শিক্ষা পেয়ে মেয়েবা সাধারণতঃ যে পুরুষোচিত উগ্রতা এবং কক্ষতায় নারীধর্ম হারিয়ে ফেলে, অমলা ছিল তাদেব চেয়ে স্বতন্ত্র। সে ছাত্রীজীবনে নীরবে দেশসেবা করেছে, কারণ তার দেশপ্রেম ছিল উগ্র বকমেব আন্তরিক। আমি তাকে পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছি, তাবই হাতে সংসারের সকল ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আমাব কাজ ক'বে চলেছি। কিন্তু তাব স্বাস্থ্য হঠাৎ এমন ভেঙে পড়ল কেন? সংসার খবচে কার্পণ্য বণাব কথা নয়, অসুখব কথাও কখনও শুনি নি।

মাস তিনেক আগে একদিন সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল ইকনমিক্সের তত্ত্ব। বলেছিল বিদেশ থেকে যে খাজ বা খা-কিছু আমদানি করতে হচ্ছে, তা যদি কিছু দিন একই ভাবে চলে তা হ'লে এ দেশ আর ৬ গবিব হয়ে যাবে, সেজন্য প্রত্যেকেরই উচিত প্রাণপণে দেশের প্রয়োজন দেশেব মধ্যেই মেটাবাব চেষ্টা করা। নইলে ঘনপাতি কেনার টাকা থাকবে ন, আর ঘনপাতি ধাপট কিনতে না পারলে দেশেব কোনো পরিকল্পনাই সফল হবে না।

কিন্তু আমি তখন গবেষণার এমন এক পর্ষায়ে উপনীত ছে, অর্থনীতির তত্ত্বে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারি নি।

আজ হঠাৎ মনে হল এ কি সেই অভিমানের ফল।

আমি নিজের অপরাধ উপলক্ষি ক'রে কারণ অল্পসঙ্কানে তৎপর হয়ে উঠলাম, আর তার ফলে যা জানা গেল তাতে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জানতে পারলাম অমলা প্রথমতঃ বাজারের ইন্ফ্লেশন কমানোর সাহায্য হবে ব'লে সংসারের খবচ যথাসাধ্য কমিয়ে দিয়েছে। টাকা বাজাবে বেশি ছাড়লে জিনিসেব দাম কখনো কমতে পারে না, তাই আমার খাজমান যথাসম্ভব বজায় রেখে নিজের এবং অন্যান্য সবার বরাদ্দ একেবারে কমিয়ে ফেলেছে। তা ছাড়া যে বিদেশী গুঁড়ো দুধ আমাদের উভয়ের বরাদ্দ ছিল তা থেকে তার নিজের অংশটি একেবারেই বাদ দিয়েছে। এই গুরুতর অন্যান্যটি সে কেন করল ফোভে

দুঃখে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে সংক্ষেপে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল, “ডলার বাঁচাচ্ছি।”

আমার গবেষণা চুলোয় গেল, আমি প্রায় ক্ষেপে গেলাম। এর পর থেকে আমি আর পুরো বিজ্ঞান-গবেষক নই, পুরোপুরি পুরুষ হয়ে উঠলাম এবং নিজ হাতে সংসারের ভার নিয়ে এই গুরু অজ্ঞানের প্রতিকারে মন দিলাম। আমার সংসর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছাত্রীই রয়ে গেছে, গৃহিণী হতে পারে নি—সে দোষ সম্পূর্ণ আমারই।

দৈনন্দিন সংসার চালানোও একটা বিদ্যা এবং এর মধ্যেও একটি বিজ্ঞান আছে, আনন্দও আছে। এতদিন আমার জগৎটা ছিল নিতান্তই কীটপতঙ্গের জগৎ, এখন দেখি মানুষের জগৎও সুন্দর।

একদিন মুকুন্দ আমার মরা প্রজাপতি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে মস্ত বড় একটা ষ্টিকিত লুকিয়ে ছিল। আমার মনে হতে লাগল আমারই বন্দী মৃত মনটাকে সে বাইরের আলো-হাওয়ায় নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। তার পর ওরা ষতবার এসেছে ততবারই আমার গবেষণাগারের আবহাওয়াকে লণ্ডভণ্ড ক’রে দিতে চেয়েছে। আজ এসে যদি ওরা সব লুণ্ঠন ক’রে নিয়ে যায় তা হ’লেও হয়তো আর দুঃখ হবে না। কিন্তু ওদের যে অবস্থা সেদিন দেখেছি—আর কি কখনো ওরা আসবে? জীবন-যুদ্ধের প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছে আর কোন্ আশা নিয়ে এখনও বেঁচে থাকবে?

কিন্তু ওরা বেঁচে ছিল, এবং ভাল ভাবেই ছিল তাব প্রমাণ পেলাম মাস দুই পরে।

এক দিন ওদের সম্বন্ধেই ভাবছিলাম, এমন সময় চিন্তার অন্ধকার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক’রে তিন বন্ধু যেন একটা উগ্র আলোয় জ্বলতে জ্বলতে এসে হাজির হল। আমি বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে গেলাম তাদের দিকে চেয়ে। দেখলাম তাদের চেহারার অনেক উন্নতি হয়েছে, চোখের চারদিকের সেই কালো চক্র আর নেই, তার বদলে কালো-চশমা—ছদ্মবেশ ধরতে যা ব্যবহার করত। হাড়ে মাংস লেগেছে, চালচলন ভাবভঙ্গি সম্পূর্ণ অভিনব, চেহারা উজ্জ্বল, পরনে জাতীয় পোশাক, এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর, তারা হিন্দিতে কথা বলছে। দেখে শুনে কৌতুক বোধ করলাম, আনন্দও হল খুব। মনে হল রাজধানী থেকে কোনো বড় চাকরি বা কোনো বড় দাঁও মেঝে থাকবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, “কোনো পরিকল্পনা কি তা হ’লে ইতিমধ্যেই সফল হয়েছে?—দেশোন্নতির কোনো বৈশ্ববিক পরিকল্পনা?”

ওরা তিন জন একসঙ্গে হেসে উঠল। ভবানন্দ বলল, “কি পরিকল্পনা?”

“যেমন দামোদর”—

“দামোদরের বানে ভেসে গেছে।”

“তা হ’লে ‘ফসল বাড়াও’?”

“ফসল বাড়তে দেরি হবে।”

“দুধ পরিকল্পনা?”

মুকুন্দ বলল, “কোনোটাই দরকার হল না। সম্পূর্ণ নতুন এক পরিকল্পনা আর সবগুলোকে মেরে দিয়েছে।”

আমি সবিস্ময়ে বললাম, “কি রকম? পরিকল্পনা হতে না হতেই তার ফল ভোগ করছ না কি?”

জনার্দন বলল, “ঠিক ধরেছ। এ পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিরাট, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এর দ্রুত সাফল্য—যা একমাত্র এই পরিকল্পনাতেই সম্ভব।”

“তোমরা কি এর মধ্যে আছ?”—আমি প্রশ্ন করলাম।

ভবানন্দ বলল, “আছি, এবং আমরা প্রত্যেকে মোটা বেতনে এই গুরু দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি। হাজার হাজার আপিস বসছে দেশের সব জায়গায়, হাজার হাজার লোক নিযুক্ত হচ্ছে—বক্তা, গায়ক, চিত্রকর সবাই। একেবারে ‘মাস কন্ট্র্যাক্ট’!”

আমি উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা কবলাম, “কি কাজ করতে হচ্ছে তাদের?”

ভবানন্দ বলল, “জনতার মাঝখানে গিয়ে, যাদের এতকাল ঘৃণা করেছ, অস্পৃশ্য করে বেখেছ, একেবারে তাদের মধ্যে গিয়ে, তাদেরই একজন হয়ে, একেবারে তোমার গজদস্তমিনাব থেকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসে শুধু একটি কথা বলা, একটিমাত্র বৈপ্লবিক কথা, একটি মাত্র বীজমন্ত্র উচ্চারণ করা, শুধু বলা—‘কম খাও’।”

বলেই পকেটে হাত দিয়ে চট করে ঋণের টাকাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, “এবারে আসি ভাই, বড় জরুরি সব কাজ পড়ে আছে।”

আমি শুধু বিমূঢ় স্তম্ভিত ভাবে ওদের বিলীয়মান মূর্তিগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম।

## নারায়ণদার অনশন

নারায়ণদার ইতিহাস কোনো কাগজে ছাপা হয় নি, তাঁর নামও দেশের লোকে কেউ জানে না, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর মতো দেশপ্রেমিক এবং মহৎ লোক এ সংসারে খুব কমই আছে।

আমি তাঁকে অল্পদিনের জন্য জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু তবু সেই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অন্তরের যে পবিচয় আমি পেয়েছি, তা প্রকাশ না করা পর্যন্ত আমার শাস্তি হবে না।

আদর্শের খাতিরে আত্মবিসর্জন করতেও যিনি পশ্চাৎপদ নন, তিনিই আমাদের দেশের আদর্শ পুরুষ। নারায়ণদার মধ্যে দেখেছি সেই চরিত্র দৃঢ়তা, সেই অমানুষিক শক্তি, যার গুণে তিনি জীবন পণ করতে পেয়েছেন আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে। অথচ দুঃখের বিষয় তাঁর নাম পর্যন্ত আমাদের দেশের কেউ জানে না। আমি আজ তাঁর সেই নাম জনসমাজে প্রচার করবার দ্রুত সৌভাগ্য লাভ ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করছি।

নারায়ণদা ছিলেন আমাদের গ্রামের যুবকদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি। খেলাধুলোর সকল রকম ব্যবস্থা, জঙ্গল মাফ কবা, কচুরিপানা ধুংসেব কাজ থেকে শুরু ক'রে মৃতদেহ গুণানে বয়ে নিয়ে যাওয়া—কোনোটাতেই তাকে না ডাকলে চলত না। তাঁর এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যাতে সবাই তাকে সম্মম করত অন্তর থেকেই। তাকে কেউ যেমন না ডেকে থাকতে পারত না, তেমনি তাঁর ডাকেও কেউ না এসে থাকতে পারত না। ঘনকৃষ্ণ দীর্ঘ দেহ, হাতে পায়ে প্রচুর শক্তি, হৃদয় উদার। বাল্যকালে মাতার কাটাঘ, গাছে ওঠায়, ফুটবল খেলায়, দৌড় প্রতিযোগিতায় নারায়ণদা ছিলেন সবার চেয়ে পটু। সে জন্মে তিনি সঙ্গীদের পরম বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এইভাবে সবার প্রশংসা এবং আনুগত্য সহজেই লাভ ক'রে নেতৃত্ব করবার একটা স্বাভাবিক অধিকার তাঁর জন্মেছিল। নিজের কৃতিত্ব বিষয়ে নিরঙ্কুশ নিঃসন্দেহতা তাঁকে কিছু গর্বিত এবং অভিমানী ক'রে তুলেছিল, কিন্তু তাতে কারো কোনো লোকসানের কারণ ঘটে নি। তিনি ক্রমে একটু খোশামোদ-প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তাতেও কারো কোনো ক্ষতি হয় নি। খোশামোদ করলে তাঁকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করানো যেত, না করলে সে এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটত।

আমি বরাবর থাকতাম বিদেশে। তাঁর সম্পর্কে এর অধিকাংশ খবরই আমি

গ্রামের লোকদের কাছে পরে শুনেছি, আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় অতি অল্প দিনের। বিদেশ থেকে দুচার বছর কখনোসখনো অতি অল্প সময়ের জন্য দেশে যেতাম। দেশে গিয়ে সবার সঙ্গে অস্তরঙ্গ ভাবে মিশতে পারতাম না, কারণ আমি কলকাতা শহরে থাকি বলে সবাই আমাকে খুব চালিয়াং কিংবা অহকারী মনে করত, কিংবা একটু বেশি রকম সন্ত্রম করে দূরত্ব বক্ষা করে চলত। আমার ভাষাই বোধ হয় প্রাণ খুলে মেশবার পক্ষে তাদের ছিল প্রধান বাধা। তারা শুধু ঐ জগুই হয় তো আমাকে বিদেশী লোক মনে করত।

কিন্তু তবু একবার তারা আমারই শব্দগাপন হল।

১৯৪৩ সাল। গ্রীষ্মের বন্ধে বহুদিন পরে দেশে গিয়েছিলাম। গ্রামের ফুটবল টীম এবার নানা জায়গায় ম্যাচ খেলবে, সেজন্য তারা তাদের টীমকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করতে চায়। কয়েকজন আমার কাছে এসে প্রস্তাব করল, আচ্ছা, কলকাতা থেকে দু'একজন নামকরা খেলোয়াড় আনা যায় না?

আমি বললাম, কেন যাবে না? তবে তাদের খরচ এবং আবামের জন্য যথেষ্ট খরচ করা চাই, নইলে আনা যাবে না।

খরচ করতে সবাই রাজি হল। কিন্তু তাবা এ বিষয়ে একটি প্রকাণ্ড ভুল কবল। এই প্রস্তাবটি তাবা নারায়ণদাকে না জানিয়ে নিজেদের খেয়ালে করায় নারায়ণদা মর্মান্বিত হলেন। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন, কিছুই বললেন না। ওরা যে ইচ্ছে করে এই অত্যাচারি কবেছে তা নয়, নারায়ণদাকে বাদ দিয়ে সামান্য প্রস্তাবমাত্র কবায় যে কোনো বিপদ ঘটতে পারে তা তারা ভাবেনি। নারায়ণদা চুপ করে থাকতে তাবা আরও নিশ্চিন্ত হল।

কিন্তু ফল হল অতি মাঝামাঝিক। খেলোয়াড় আনা হল, কিন্তু নারায়ণদা খেলার কোনো অনুষ্ঠানেই যোগ দিতে রাজি হলেন না। উপরন্তু তিনি বললেন, বাইরের কোনো খেলোয়াড় যদি তাদের টীমে খেলে তা হলে তিনি কাউকে ক্ষমা করবেন না।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব? সমস্ত জেলা জুড়ে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, কলকাতার দুজন বিখ্যাত খেলোয়াড় এসে যোগ দিয়েছে কপিলপুরের টীমে। তাদের শুধু দেখতেই সকাল সন্ধ্যা লোক আসছে দলে দলে। প্রথমে শত শত লোক, ক্রমশঃ হাজার হাজার বৃদ্ধ যুবক বালক স্ত্রীপুরুষ এসে ভেঙে পড়তে লাগল সেই গ্রামে—কলকাতার খেলোয়াড় কেমন তাই দেখতে। এখন তো কিছুতেই তাদের বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

নারায়ণদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি মুখে আর প্রতিবাদ না জানিয়ে হঠাৎ একেবারে অনশনব্রত শুরু করে দিলেন।

ঘটনাটির গুরুত্ব প্রথমে কেউ ততটা উপলক্ষি করতে পারেনি, সবাই ভাবল, নারায়ণদা অভিমান করেছেন, পরে বুঝিয়ে স্বজিয়ে সব ঠিক করা যাবে। আপাতত এ ছাড়া আর উপায় ছিল না—তিন চারটে জেলার লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে কপিলপুর টীমের খেলা দেখবার জন্ত।

অতএব খেলা হল, গ্রামের নামও হল, লোকের কৌতূহল নিবৃত্ত হল, কিন্তু নারায়ণদা ব্রত ভঙ্গ করলেন না। তিনি প্রকাশ করলেন, বাইরের খোলোয়াড় এনে গ্রামের যে অসন্মান করা হয়েছে তার প্রতিবাদকল্পে তিনি আমরণ অনশন চালাবেন।

খেলার সকল উত্তেজনা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন সবাই বুঝতে পারল নারায়ণদার সমস্যা অতি মারাত্মক।

একদিকে আরাকানে মিত্রপক্ষের মংড পরিত্যাগ, বাংলাদেশ বিপক্ষনক এলাকা ঘোষিত, মাথার উপর মিত্রপক্ষের স্পিট-কায়াব এবং বি-২২, অন্যদিকে নারায়ণদার অনশন।

দলে দলে লোক গিয়ে তাঁর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে লাগল, কিন্তু তিনি অটল, অবিচলিত।

এক দিন এক দিন ক'রে দশ দিন কেটে গেছে, নারায়ণদা শুধু সোডা জল খেয়ে শয্যাসংলগ্ন হয়ে আছেন, কথা বলবার ক্ষমতা নেই অবস্থা এমনই শোচনীয়। গ্রামের মধ্যে এই উপলক্ষে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হল তা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। শেষে সমস্ত জেলায়। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিল সবাই একে একে তাঁকে বোঝাতে লাগল নানাভাবে, কিন্তু কোনো ফলই হল না। বাইরের লোক যারা শুনল তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল, নারায়ণদাকে তারা কেউ চেনে না।

গ্রামের প্রবীণ লোকেরা বললেন, তুচ্ছ ব্যাপারের জন্ত মূল্যবান জীবন কি এভাবে নষ্ট করা উচিত? নব্বীনেরা আবার এসে বলল, আমাদের এবারের মতো ক্ষমা করে আমাদের সংশোধনের সুযোগ দাও নারায়ণদা, তুমিই যে আমাদের সব।

নারায়ণদা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাদের দিকে, তারপর মৃদুভাবে মাথা নেড়ে জানালেন, হবে না।

ডাক্তার এসে কিছু বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা করলেন কিন্তু ব্যর্থ হল তাঁর চেষ্টা।



একটা আদর্শের জন্ত এ রকম মহৎ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে আমি আর নিছের চোখে দেখি নি, কিন্তু কি ক'রে তাঁকে বাঁচানো যায় সে প্রশ্ন আমাকে একটু বেশি রকম চঞ্চল ক'রে তুলল—আমার মনে হল যেন এর জন্ত আমিই সব চেয়ে বেশি দায়ী, কারণ আমিই কলকাতা থেকে খেলোয়াড়দের এনেছিলাম।

উপায় চিন্তা করতে লাগলাম। এদিকে যুদ্ধের দরুন দেশের অবস্থা দ্রুত শোচনীয় হয়ে উঠছে। একদিকে চলছে বিশ্বযুদ্ধ, অণ্ডদিকে চলছে সাধারণ মানুষের জীবন যুদ্ধ। এর মধ্যেই কর্তব্য স্থির করতে হবে, নারায়ণদাকে বাঁচাতে হবে। অনশনের বিংশতি দিন অতিবাহিত হতে চলল, আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না।

এমন সময় শোনা গেল কপিলপুরের কাছাকাছি মহকুমা শহরে সুবিখ্যাত দেশকর্মী সর্বদলসমন্বয়কারী শ্রীযুক্ত বিশ্বপ্রেম শর্মা এসেছেন দেশের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে।

আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। গিয়ে সব ব্যস্তি বুললাম। তিনিও উপলব্ধি করলেন এই মহৎ প্রাণকে তিনি ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমি তাঁকে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে এলাম কপিলপুর গ্রামে।

আশ্চর্য ক্ষমতা এই বিশ্বপ্রেম শর্মার! তিনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা-বলে নারায়ণদাকে সন্মোহিত করতে লাগলেন। তাঁকে বললেন, দেশের দুর্দিনে তোমার মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তির জরুরি প্রয়োজন আছে। গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে, জেলার সীমা ছাড়িয়ে, তোমার কর্মক্ষেত্র পড়ে আছে সমস্ত ভারতবর্ষে। অল্প পরিসরের মধ্যে তুমি নিছেকে জানতে পার নি, দাঁড়াও এসে সমস্ত ভারতবর্ষের পটভূমিকায়, দেখ নিছের বিরাট রূপ অন্ভব কর তোমার প্রচণ্ড শক্তি, বিস্তার কর তোমার দৃষ্টি আসনুদ্রহিমাচলবাপী। ওঠ, জাগ, খাও—বন্দেমাতরম্, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আন্বা হো আন্ববর।

মন্বের কাজ হল এ কথায়। নারায়ণদা শীর্ণ দুর্বল হাতখানা তুলে দেশকে নমস্কার জানালেন

ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরীক্ষা ক'রে বললেন, একটু একটু ক'রে এখন থেকে তরল খাওয়া খাইয়ে যেতে হবে, ভাত খেতে মাল খানেক লাগবে।

একটু একটু ক'রে নারায়ণদার দুর্বলতা কাটতে লাগল। আমিও কলকাতা ফিরে এলাম নিশ্চিন্ত মনে। ইতিমধ্যে আমার কলেজও খুলে গেছে। ভাবলাম

মাসখানেক পরে গিয়ে অন্ন গ্রহণের পর তাঁর স্বস্থ অবস্থাটা একবার গিয়ে দেখে আসব।

কিন্তু কলকাতা ফিরে দুচার দিনের মধ্যে এমন এক ভয়াবহ ব্যাপার দেখতে হবে তা ভাবতেই পারি। দুর্ভিক্ষ লেগেছে দেশে। পঞ্চাশের মনস্তর। স্বরণ করিয়ে দেবার দরকার নেই যে সে রকম নিষ্ঠুর মর্মান্তিক দৃশ্য এই দুর্ভাগা দেশেও কখনো ঘটেনি। ১৬ অক্টোবর দাঙ্গায় যে এত বড় হত্যালীলার অচ্যুতান ঘটে গেল, তার চেয়ে সেই দুর্ভিক্ষ-দৃশ্য শতগুণে বেশি মর্মান্তিক। গ্রামের হাজার হাজার পরিবার শহরের পাশাণে এসে মাথা ঠুকছে একটু ফেন খেতে পাবার আশায়। খেতে পাওনি, মরেছে ধীরে ধীরে—একটু একটু করে। নীরবে।

এ সব দেখে শুনে মনের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। এই বিরাট ব্যাপক অসহায় মৃত্যুদৃশ্যের কাছে নারাণদা তুচ্ছ হয়ে গেলেন। তবু দেশে যেতে হল অস্তুত একদিনের জগ্ন নিতাস্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কেননা কর্তব্যের তাগিদ ছিল।

গ্রামে পা দিয়ে দেখি চার দিক ছম ছম করছে। মানুষ নেই। পথে নিশ্চিন্ত মনে শেয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রামের মানুষ কোথায় গেছে বুঝতে দেবি হল না। অনেক পরে একটা শীর্ণ লোকের সঙ্গে দেখা। হাব কাছে জিজ্ঞাসা করলাম নারাণদার খবর। সে বলল, তাঁর তো সংকার হয়ে গেছে।

স্বস্তিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি? তার কাছে যা জানতে পাবলাম, তা এই—

আজই সকালে তিনি সরু চালের ভাত খাবেন এই বকম কথা ছিল। কিন্তু গত তিন দিন ধরে চেষ্টা করেও কোথায়ও সরু চাল সংগ্রহ করা যায় নি। চালই নেই কারো ঘরে। ‘দুএক মুষ্টি যার ঘরে আছে সে তা ছাড়তে বাজি নয়। একেই বলে অদৃষ্ট, লোকটি বলতে লাগল, এত চেষ্টা করে ভাত খাওয়ানোয় বাজি করা গেল, কিন্তু অন্ন গ্রহণের দিন দেশে হাহাকার পড়ে গেছে, কারো ঘরে অন্ন নেই। নারাণদা দেশের এই দুবস্থার কথা শুনে ‘শক’ পেয়ে মারা গেছেন—আমরা অতি কষ্টে তাঁর সংকার করেছি আজ সকালেই।

শুনে একটি কথাও আর উচ্চারণ করতে পারলাম না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্টেশনেই ফিরে এলাম।

## ক্যা ছয়া

পাড়াগাঁয়ে গিয়েছিলাম একদিন। শহর থেকে দূরে, রেল-স্টেশন থেকে আরও দূরে সেই গ্রাম। জঙ্গলে ভরা। দু-চার ঘর মানুষ যারা আছে, তারা কোনো রকমে বেঁচে আছে মাত্র। তাদের এক-একটা বাড়ি যেন এক-একটা ঝোপ। সন্ধ্যাবেলা বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, সে গাঁয়ে মানুষ কেউ থাকে না—যেন সব মিলিয়ে মস্ত বড় একটা বন।

এমন পাড়াগাঁ কে না দেখেছে? এখন তো পাড়াগাঁ মানেই বন। সব পল্লীগ্রামেরই নাম বনগ্রাম!

কিন্তু আমি সেই গাঁয়ে গিয়ে এমন এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখেছি, যা না দেখলেই হয়তো ভাল হত! বিশেষ একটা কাজে সেখানে একটা বাড়িতে গিয়ে উঠে-ছিলাম। বাড়ির একটা লোক তখন সবে ভাত-খাওয়া শেষ ক'রে উঠেছে। দেখলাম, ওঠবার সময় সে গোটাকত মাছের কাঁটা হাতে ক'রে মুখ ধোবার জায়গায় রেখে “তু—” বলে ডাকতেই একটা রোগা কুকুর ছুটে এলো সেদিকে। কিন্তু কি আশ্চর্য! কুকুর সেই কাঁটায় মুখ দেবার আগেই একটা মোটা শেয়াল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে সেই কাঁটা খেতে লাগল, আর কুকুরটা ভয়ে সেখান থেকে সরে এসে কাতর ভাবে তার দিকে চেয়ে রইল।

একদিন ছিল, যখন গাঁয়ের কুকুর দেখলে শেয়াল ভয়ে পালিয়ে যেত। এখন তাদের আব সেদিন সেই। এখন কুকুরের চেয়ে শেয়ালের তেজ বেশি। যারা পাড়াগাঁয়ে থাকে, তারা এটা নিশ্চয় দেখে থাকবে।

আমার চোখে ব্যাপারটা বড়ই নতুন বলে বোধ হল। অবাক হয়ে গেলাম দেখে। অবাক না হয়ে উপায় কি? বিড়াল যদি ঈড়র দেখে ভয় পায়, বাঘ যদি হরিণ দেখে ভয় পায়, তাহ'লে অবাক হবে না কে?

গাঁয়ের লোকেরা অবশ্য এ ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। তারা জানে, কলিকালে সব উন্টে যাবেই। মানুষই এখন আর মানুষ নেই, অমানুষ হয়ে গেছে।

আমি কিন্তু এত বড় অন্টারটা চূপ ক'রে মেনে নিতে পারলাম না। প্রথমে হঠাৎ মনে হয়েছিল, ভুল দেখছি না তো? তারপর ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, ভুল নয়; ঠিকই দেখছি। খুব রাগ হল শেয়ালের উপর। কাছেই একখানা লাঠি পড়ে ছিল, সেইখানা হাতে নিয়ে গেলাম এগিয়ে শেয়ালের দিকে।

শেয়াল এর মধো খাওয়া শেষ ক'রে ফেলেছে। সামান্য ক'খানা কাঁটা এক মিনিটও লাগে না খেতে।

আমাকে দেখে শেয়াল বলে উঠল, “মারবে নাকি?”

চমকে উঠলাম তার মুখে মানুষের কথা শুনে। হাত থেকে লাঠি আপনা হতেই পড়ে গেল, কিন্তু তখনই ভেবে দেখলাম, চমকালে চলবে না এখন, শেয়ালের সঙ্গে আলাপ ক'রেই দেখা যাক কি ব্যাপার। বললাম, “না মারব না, কিন্তু আমাকে জানতে হবে তুমি কে, এবং কুকুর তোমাকে দেখে ভয় পায় কেন।”

শেয়াল বলল, “জানতে চাও আপত্তি নেই, কিন্তু এখানে কিছুই বলব না। আমার সঙ্গে আমার বাছো চল, তাহ'লেই সব জানতে পারবে। ভয় নেই, রাজ্য দূরে নয়, এটু জঙ্গলের ভিতরেই।”

বললাম, “চল।”

জঙ্গলের ভিতর নানা রকমের কাঁটা-গাছ, বেতের ঝাড়, বাঁশ-ঝাড়, আরও কত রকম ছোট বড় গাছ। ঠেলতে চলেতে চলেতে জামা ছিঁড়ে গেল, হাত-পা ছেঁড়ে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

আমাদের সাড়া পেয়ে অনেক শেয়ালের মাথা ছেগে উঠল গর্জের ভিতর থেকে, কিন্তু আমি শেয়ালের সঙ্গে আছি দেখে আমার তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। বোঝা গেল, যার সঙ্গে এসেছি, সে ওদের মোড়ল।

মোড়ল আমাকে একখানা কাঁটা দেখিয়ে বলল, “বস এখানে।” তারপর জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কি জানতে চাও, বল।”

আমি আমার আগের প্রশ্নটাই জিজ্ঞাসা করলাম।

মোড়ল লেজটা একটু চুলকিয়ে নিয়ে বলল, “দেশী কুকুর আমরা পছন্দ করি না।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কেন? এখন তো আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখন তো বিদেশী বর্জন আর স্বদেশী-গ্রহণই আমাদের নীতি হওয়া উচিত। এখন বিদেশী কুকুর তাড়িয়ে দেশী কুকুরকে আদর করব।”

মোড়ল বলল, “দেশী কুকুর সব ক্রীতদাস, ওরা অতি ইতর, একমুঠো খাওয়ার জন্ত মনিবের পা চাটে।”

আমি বললাম, “কেন বিলিতি কুকুরও তো তাই।”

মোড়ল বলল, “ঠিক তা নয়। বিলিতি কুকুর হচ্ছে জমিদার। তাকে কিছুই করতে হয় না, সে বসে বসে অন্যের উপার্জনের অংশ ভোগ করে।”

আমি বললাম, “তাহ’লে তো সব কুকুরই খারাপ। আর তা যদি হয়, তবে দেশী কুকুরকে এরূপ শাস্তি দিচ্ছ কেন?”

মোডল শেয়াল আমার মুখের দিকে চেয়ে মুহু মুহু হাসতে লাগল। শেষে বলল, “শাস্তি দিচ্ছি কেন সত্যি যদি শুনতে চাও, তাহ’লে বলি, রেগো না শুনে। এই কুকুরগুলো নেহাৎ বাঙালী কুকুর বলেই—”

কথাটা শেষ হবার আগেই আমি দপ ক’রে জলে উঠলাম। চিৎকার ক’রে বললাম, “চোপরাও, হতভাগা,—লাঠির ঘায়ে মাথা গুঁড়ো ক’রে দেব—তুমি বাঙালীকে ঘণা কর”—ব’লে একখানা শুকনো ডাল হাতে তুলে নিলাম।

মোডল আমাব হাতে লাঠি দেখে চিৎকার ক’রে উঠল, “ক্যা ছয়া—”

সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের সকল দিক থেকে ‘ক্যা-ক্যা ছয়া’ ধ্বনিত হয়ে উঠল। বেরিয়ে এলো প্রায় তশো শেয়াল।

মোডল বলল, “লাঠি নামাও, দেখছ না আমাদের একতা?”

না দেখে উপাষ ছিল না। দেখলাম এবং মুগ্ধ হলাম। বললাম, “এই একতা তোমাদের কি ক’রে হল?”

মোডল বলল, “আমাদের ভাষা লক্ষ্য করছ না? ‘ক্যা ছয়া’ কোন্ ভাষা?”

প্রশ্ন শুনেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এরা সবাই রাষ্ট্র ভাষায় কথা বলে, স্বাধীন ভাবে ওদের একতাও যেমন সত্য, জোবও তেমন সত্য। জিজ্ঞাসা করলাম, “তাহ’লে বাঙালী শেয়াল বলে কেউ নেই?”

মোডল হেসে বলল, “আছে ছুঁচারণে। দেখবে তাদের? কিন্তু তারা আমাদের দেখে একটু ভয় পায়। পড়ে আছে ঐদিকে কয়েকটা, তুমি ঐদিকটায় গেলেই তাদের দেখতে পাবে।”

আমি এগিয়ে গেলাম সেদিকে। দেখি ওদের সবাই বসে বসে আড্ডা মারছে। আমাকে দেখেই বলে উঠল, “কি হল কি হল—”

একেশ্বরে ‘ক্যা ছয়া’র বাঙলা। বুঝলাম বাঙালী শেয়াল বটে। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমরাই কি বাঙালী শেয়াল?”

আমার কথা শুনে ওরা তো মহা খাপ্পা। একজন দাঁত বের ক’রে বলল, “শেয়াল বলছ কাকে?”

বুঝলাম শেয়াল বলতে দুঃখ পেয়েছে বোধ হয়। শেয়াল তো তাচ্ছিল্যের ভাষা, তাই শুধরে নিয়ে বললাম, “বাঙালী শৃগাল?”

‘শৃগাল’ শুনে ওরা খুব খুশি হল। বলল, “হাঁ, এমনি সম্মান রেখে কথা

বলবে। কিন্তু লেখার সময় ‘শৃগাল’ লিখ না, লিখবে ‘ত্রীগাল’। এই ‘ত্রীগাল’ও বেশিদিন থাকবে না, বোধ হয় ‘গালত্রী’ নামটাই আমরা চালাব।”

জিজ্ঞাসা করলাম, “কেন?”

একজন বলল, “তোমরা অত্রী বত্রী, বত্রী করতে পার, আমরা গালত্রী করব না কেন? আমরাও বাঙালী—অনুকরণ করাই আমাদের স্বভাব।”

আমি বললাম, “ভুলে গিয়েছিলাম যে তোমরা বাঙালী শেয়াল।”

সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে উঠল, “আবার ভুল করছ? শেয়াল নয়—শৃগাল।”

আর একজন বলল, “যাও যাও, এখন বিরক্ত ক’রো না, আমরা এখন শুয়ে শুয়ে একটু লেজ নাড়ব, তোমার সঙ্গে বকতে ভাল লাগছে না।

আমারও আর ওখানে থাকতে ভাল লাগছিল না। ওখান থেকে একেবারে সোজা বেরিয়ে এলাম বাইরে। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, কারণ মনে হল যেন আড্ডাবাজ নিকর্গা বাঙালী মানুষেরই চেহারা দেখলাম ওদের মধ্যে।

এমন সময় সমস্ত বন ধ্বনিত ক’রে রব উঠল, ‘ক্যা ছয়া।’

মনে মনে বললাম, “নতুন আর কি হবে? যা হবার, তা বহু আগে থেকেই হয়ে আছে!”

## আধাতৌতিক

যুদ্ধের সময় যখন জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতা শহরের অর্ধেক লোক ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, সেই সময়ের একটি কাহিনী।

আমিও তখন জনগণকে অনুসরণ ক'বে পরিবারবর্গ বাইরে পাঠিয়ে বাড়িতে একা আছি এবং উদাস মনে অবসর সময়ে স্পিরিচুয়ালিজম অধ্যয়ন করছি। মানুষের মৃত্যুর পর তাব সূক্ষ্ম আত্মা কি ভাবে আমাদের কাছে মর্ত হয়ে ওঠে সেই সব কথা যতই পড়ছি ততই আমার সময়ের ওজন কমে যাচ্ছে, একাকিত্বের অসুবিধাও বিশেষ অনুভব করছি না। তবে রাত্রে মাঝে মাঝে কেমন যেন গা ছম ছম ক'রে ওঠে। বাড়িতে পুরুষ ব্যক্তি আরও দু একজন যাবা আছে তারা ব্যঃকনিষ্ঠ ব'লে তাদের কাছে এ সম্পর্কে একটি কথাও প্রকাশ করিনি, কারণ একটা নির্দিষ্ট বয়সেব আগে স্পিরিচুয়ালিজমে কারও বিশ্বাস আসে না বলেই আমার বিশ্বাস।

মানুষের সূক্ষ্ম আত্মা মানুষেবই মতো দেখেন, কিন্তু যেন একটি খোসা, শাঁস নেই, একটি আয়ুিক খোসা, ধরা ছোঁষা যায় না, কিন্তু দেখা যায়। এরই নাম হচ্ছে এক্টোপ্লাজম। এই সূক্ষ্ম দেহতত্ত্ব যে শুধু আমি চর্চা কবেছি তাই নয়, বন্ধু বান্ধবদের কাছেও এর কিছু কিছু ব্যাখ্যা কবেছি। কিন্তু তুঃখের বিষয়, তাদের ঠিক মতো বোঝাতে পারছি না। তাবা তাদের প্রত্যক্ষ মূল দেহ নিয়েই ব্যস্ত, সূক্ষ্ম দেহ বিষয়ে তাদের কিছুমান আগ্রহ দেখা যায় না।

এমনি অবস্থায় উত্তর কলকাতা বাসী আমার কাছে এলো এক চিঠি, বালিগঞ্জ থেকে। এক বন্ধু লিখেছে, শ্রাব বাড়িলে নাকি এক তৌতিক কাণ্ড ঘটেছে, তাবই ব্যাখ্যা সে আমার কাছে শুনতে চায়।

বলা বাহুল্য, সেই দিনই সন্ধ্যায় আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

কালটা ছিল কালবোশেখীব। আমি যাবাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাড় বৃষ্টি শুরু হল। ধরেই নিলাম বাতটা ওখানেই কাটাতে হবে। বন্ধু অবস্থা বুঝে ঠাকুরকে খিচুড়ির আদেশ দিলেন। আরও ভাল লাগল। কেবল ভয় হচ্ছিল বৃষ্টিটা হঠাৎ থেমে না যায়।

না—বৃষ্টি থামবে না। হাওয়ার বেগ বেশ প্রবল, বৃষ্টির বর্ষণও খুব জোরালো।—এমনি অবস্থায় মন অকারণ একটা আনন্দ মিশ্রিত বেদনায় ভারী হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষে কোনো মনস্তত্ত্ব প্রচার করব না কিন্তু এই অতি

পরিচিত কথাটির পুনরাবৃত্তি ক'রে একবার মাত্র বলে রাখি যে এই রকম বর্ষামুখর আবহাওয়ায় বহু সত্য মিথ্যা, এবং বহু মিথ্যা সত্যের রূপ ধরে অতি সহজেই।

একটা বিমূঢ় ভাব মনের মধ্যে তখন সত্যই জেগেছিল। ভয় হল এই যে, বন্ধু এই রকম আবহাওয়ার প্রভাবে তার ভৌতিক অভিজ্ঞতার কাহিনীতে অকারণ বহুস্তর বং চড়িয়ে অতিরিক্ত বাড়িয়ে না ফেল। বন্ধু বলল, শোন।

কিন্তু ঠিক এমনই সময় পাড়ার আর এক ভদ্রলোক রেন-কোটে গা ঢেকে এসে হাজির হলেন সেখানে। সময় কারোই কাটছে না। সবাই পরিবার বাইরে পাঠিয়ে হান্কা হয়ে বসে আছে, জাপানীরা ডায়মণ্ড হারবারে এসে নামলেই 'একলা চল রে' গাইতে গাইতে নিশ্চিত মনে পালিয়ে যাওয়া যাবে।

আগন্ধকের সঙ্গে পরিচয় হল, নাম প্রফুল্লবাবু, বেশ আলাপী এবং অমায়িক। আমরা দুজান তখন বন্ধুর ভৌতিক কাহিনী শোনার জন্যে প্রস্তুত ছলাম। জমে বসলাম সবাই কাছাকাছি।

বন্ধু বলতে লাগল, গভীর বাত্রে ঘুমের মধ্যে কে তার গলা টিপে ধরেছিল। সে স্পষ্ট অনুভব করেছে তার স্পর্শ। চিন্তার ক'বে উঠেছে 'কে কে' বলে। জেগে দেখে জানালা খোলা। ধরে কেউ নেই। কাপতে কাপতে উঠে আলো জ্বলে দেখে দলদ্বা বন্ধই আছে। তার স্পষ্ট মনে আছে শোবার আগে জানালা বন্ধ ক'রে শুয়েছিল বৃষ্টির ছাট আসবে ভয়ে। এই অদ্ভুত ব্যাপারটির কোনো অর্থই সে বুঝতে পারছে না। সেই থেকে সময় রান আলো জ্বলে শুছে এবং তবু ভাল ক'রে ঘুমোতে পারছে না, কি জানি কখন কে এসে গলা টিপে ধরবে।

আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম সব। কিন্তু ভূতব সঙ্গে এব কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হল না। মনে হল ওটা শুধু একটি স্বপ্নের ব্যাপার। এবং অতি সাধারণ ঘটনা, অনেকেরই এ রকম হয়ে থাকে। জানালা হাওয়াতে খুলে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া সূক্ষ্ম দেহ কারো কোনো অনিষ্ট এ ভাবে করে না।

প্রফুল্লবাবু তো এ কাহিনী এক কথায় হেসে উড়িয়ে দিলেন। বন্ধু তাতে একটু নিরাশ হলেও মনে মনে হয় তো আরামই অনুভব কবল। আমিও নিরাশ ছলাম কম নয়। কারণ সূক্ষ্ম দেহতর শুধু বইতেই পড়ে আসছি, এ সম্বন্ধে নিজের কোনো অভিজ্ঞতা লাভ হয় নি, তাই আশা করেছিলাম বন্ধুর অভিজ্ঞতাটাও যদি সত্যি কোনো এক্টোপ্লাজম সম্পর্কে হত তা হ'লে অবিলম্বে সূক্ষ্ম দেহের অস্তিত্বে বিখ্যাত সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে নিতে পারতাম।



প্রফুল্লবাবু বললেন, “ভূতের কাহিনী শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি, তাই হঠাৎ তোমার ভূতের গল্পে আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কারণ জানতাম এ অভিজ্ঞতা সহজে কারো হয় না। কিন্তু আনন্টটা যখন ভূতের গল্প পলক্ষেই বসেছে তখন আমার একটা গল্প শুনেতে পার।”

“এ অতি উত্তম প্রস্তাব,” বলে আমি আমার মন থেকে সমস্ত নৈরাশ্য এক মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। বুঝতে পারলাম এইবার ঠিক জমবে। প্রফুল্লবাবুকে দেখেই মনে হয়েছিল নিশ্চয় ইনি শিল্পীলোক, তারপর কথা শুনে বুঝেছিলাম ইনি পাকা শিল্পী। অতএব আবার জমে বসলাম তাঁর কাহিনী শোনার জন্য।

প্রফুল্লবাবু বলতে লাগলেন, “সে আজ সাত বছর আগেকার কথা। কালিঘাটের একটা বাড়িতে থাকি। বি-এ পাস কবেছি সেই বছবেই। সে এমন একটা বয়স যখন ভূত দূবেব কথা, বিশ্বাস কোনো বস্তুতেই থাকে না। সকল শ্রদ্ধায় বস্তু এবং বিশ্বাসকে তর্কেব ছোবে উড়িয়ে দিয়ে তখন একটা দায়িত্বহীন এলোমেলো ছাওয়ান মতো ছটে বেড়ানোব অবস্থা। অথচ ঠিক সেই সময়েই আমাকে ভূতে বিশ্বাস করতে হল। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

“এর কিছুদিন আগে থেকেই মনের মতো একটা অহেতুক আশ্মিক স্মৃতি অনুভব করছিলাম, একটা লক্ষ্যহীন বস্তু-বহীন উচ্ছ্বাস। মাগুনের মতো চেহারা অথচ অবাস্তব, ছায়ার মতো দেখা দেয় আবার মিলিয়ে যায়, তাকেই বলা হয় ভূত বা উচ্ছ্বাস। এই ভূত কেমন ক’বে আমাকে আঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল, শোন।”

মাগু এইটুকু শুনেই আমি বুঝতে পারলাম প্রফুল্লবাবু একটোপাক্ষম-এব জন্মকথা থেকে শুরু করেছেন। মিথ্যা দাডমটকানো ভূতের গল্প শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়েছি এতকাল, তাই আজ যথার্থ একটা স্মৃতিস্মার কাহিনী শুরু হতেই আমার মন খুব আশাবিত হয়ে উঠল, মনে মনে নিজের মৌ ভাগ্যকেই ধন্যবাদ দিলাম।

প্রফুল্লবাবু বলতে লাগলেন, “একদিন সন্ধ্যার পর ঘরে বসে দরজা বন্ধ করে একখানা বইতে জোর ক’বে মন বসাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে সেদিনও বাইরের জগতের এক এলোমেলো ছাওয়া প্রবেশ ক’রে আমার সমস্ত মনোযোগ নষ্ট ক’রে দিল। সে এক অতি রোমাঞ্চকর ছাওয়া। সে ছাওয়ান কখনও তীব্র বেদনা, কখনও তীব্র আনন্দ। যেন আমারই পাশে

কোনো অশরীরী মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে, যেন সে আমারই মনের প্রতিফলিত এক মূর্তি। তাকে দেখা যায় না, তাকে স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু তার আবির্ভাব আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে আমি অনুভব করি, তার গায়ের একটা সূক্ষ্ম গন্ধ সমস্ত ঘরকে উত্তলা ক'রে তোলে। দিনের পর দিন চলেছে এই পাগল করা অদৃশ্য মূর্তির আবির্ভাব। তাই সেদিন ভেবেছিলাম এই প্রভাব যেমন ক'রে হোক কাটাতে হবে। ভেবেছিলাম সমস্ত মনোযোগ ঘনীভূত করব বইয়ের পাতায়, বইয়ের কথার মধ্যে একেবারে ডুবে যাব। কিন্তু হল না। আমার মন আমার আয়তনের বাইরে চলে গেছে।

“আমি যে সেই অশরীরীর প্রভাব কাটাতে পারলাম না তাই নয়, সে দিন সেই অনুভূতি আরও বেশি প্রবল হয়ে উঠল। আমি স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে দেখি সে আর অশরীরী নয়, স্পষ্ট রূপ গ্রহণ ক'রে আমার সন্মুখে দাঁড়িয়ে। সে আমাকে ইঙ্গিত করছে বেরিয়ে যেতে। আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি তখন লুপ্ত, আমি যন্ত্রের মতো, মস্তমূর্কের মতো তাকে অনুসরণ করলাম। কতক্ষণ অনুসরণ করেছি মনে নেই, সেও কখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে জানি না। কিন্তু যখন খেয়াল হল তখন দেখি পথের ধারে একটা আলোর কাছে একটা বাড়ির বকে বসে আছি সন্মুখের বাড়িটির দিকে চেয়ে। লজ্জিতভাবে সেখান থেকে উঠে পড়লাম। নিজেকেই বার বার প্রশ্ন করলাম, এর মানে কি ?

“কিন্তু আমার বুদ্ধি নীরব। উদাস ভাবে বাড়িতে ফিরে দেখি অন্তত একটা ঘণ্টা সেইখানে কাটিয়েছি। বুঝতে পারলাম একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। যথেষ্ট সতর্ক হলাম, কিন্তু সব বুঝা কারণ সে আমার সমস্ত স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে আঘাত হেনেছে, মস্তিস্কের ধূসর কেন্দ্রকে দগল করেছে। এর পর থেকে তাই সে প্রতিদিন আমাকে ঘরছাড়া করতে লাগল অতি লজ্জাজনকভাবে, অতি অভদ্রভাবে।”

প্রফুল্লবাবু একটু খানি খেমে চোখ বুজলেন। মনে হল তিনি ক্ষণকালের জন্য সেই ঝোঁকঝোঁক স্বপ্নের মধ্যে একটু খানি ডুব দিয়ে নিচ্ছেন। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, নিচে থেকে আসছে ঝিচুড়ির গন্ধ। এই উদাস করা শব্দ আর গন্ধের পরিবেশে প্রফুল্লবাবুর ভ্রূত আমাদেরও মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগল।

আমি প্রায় আপন মনেই বললাম, “এ তো স্পষ্ট এক্টোপ্লাজম-এর ব্যাপার।” জিজ্ঞাসা করলাম “তারপর ?”

প্রফুল্লবাবু যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে বললেন, “তারপর ?—তারপর অবস্থা আরও খারাপ। আমার জীবনে সে দিন প্রথম অধঃপতনের অনুভূতি।

মনের আচ্ছন্ন অবস্থায় যা করি—আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেলে তখন বুঝতে পারি কি করছি। অথচ বাইরে থেকে দেখতে গেলে আমিই তো দায়ী আমার সব কাজের জন্য? কিন্তু এ কথা আমি কাকে বোঝাব? খুলেই বলি, একদিন আবিষ্কার করলাম বেলা দশটার সময় আমি মেয়েদের কলেজের সম্মুখে বসে আছি। এক বন্ধুর ডাকে সেদিন আমার খেয়াল হল। বুঝলাম এক গুরুতর সঙ্কটের দিকে ছুটে চলেছি। এর পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর হতে বাধা। মনে করবেন না যে এটি এক দিনেব একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমি বুঝতে পারলাম তিনমাস ধ'রে আমি এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ক'বে চলেছি। কখনও দেখি আমি সেই বাড়িটির সম্মুখে, আবার কখনও দেখি সেই কলেজের সম্মুখে হাঁ ক'রে চেয়ে আছি। এ কথা না পারলাম আমি কাউকে বলতে, না পাবলাম এই মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। বুঝতেই পারছেন আমি মনের দিক দিয়ে এবং দেহের দিক দিয়ে কি বকম বিপদস্থ হয়ে পড়লাম অল্পদিনের মধ্যেই।”

প্রফুল্লবাবু আবাব একটুখানি খামলেন।

আমি বললাম, “খামবেন না প্রফুল্লবাবু, আমি পরে সব ব্যাখ্যা ক'রে দেব—এ বিষয় একটোপ্লাজম-এব ব্যাপার।”

প্রফুল্লবাবু বললেন, “সে বোধ হয় আপনি পারবেন না। কারণ গো ডা থেকে এই স্তম্ভ দেহ একটা অভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ ক'রে চলেছে। অদৃশ্য অস্তিত্ব শেষ দৃশ্য হয়েছে অথচ তা এখনও সম্পূর্ণ অনাস্তব। কিন্তু তাই আগে আমার দিকটাই একটু দেখুন। কারণ এব পর নিছেরই সঙ্গে আমার এক জীবন-মরণ লড়াই শুরু হল, প্রতিজ্ঞা কবলাম হয় সে জিতবে আব না হয় আমি জিতব, এভাবে টানাটানির অবস্থা কিছুতেই আর বেশিদিন চলতে দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু হায়, আজও আমি মুক্তি পাইনি পুরোপুরি।”

আমি বললাম “বলেন কি! মানে, এখনও সে আপনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে?”

“এগনু, এবং এই মুহূর্তেও।”

কথাটা শুনে ভয়ে আমার সকল গা কণ্টকিত হয়ে উঠল। প্রফুল্লবাবু তা হলে একটোপ্লাজম স্তম্ভই আমাদের কাছে বসে আছেন! কি ভয়ানক কথা। প্রফুল্লবাবুর দিকে সবিস্ময়ে সভয়ে চেয়ে রইলাম। ক্রমে মনে হল যেন তিনি নিজেই ভূতের জগৎ থেকে সত্য নেমে এসেছেন আমাদের সম্মুখে। হয় তো সবটাই ভৌতিক ব্যাপার। হয় তো প্রফুল্লবাবু স্বয়ং একটোপ্লাজম। আমি বার বার তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত লক্ষ্য করতে লাগলাম কোথাও কোন স্বচ্ছ অংশ

আছে কি না দেখতে। আমার হাত পায়ের জোর কমে এলো, কথাও বলতে পারলাম না একটি।

ইতিমধ্যে আমার বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, “কি ব্যাপার বল তো? কিছুই তো বুঝতে পারছি না?”

প্রফুল্লবাবু বললেন, “সব বলতে গেলে যে আমার জীবন ইতিহাসের একটি গোপনীয় অধ্যায় প্রকাশ করতে হয়।”

“তা হোক, কিন্তু এখানে কোনো মতেই গল্প খামতে পারে না।”

প্রফুল্লবাবু একটু ইতস্ততঃ ক’রে শেষ বললেন “আচ্ছা শোন। কথাটা হচ্ছে এই যে ভূতের রাজ্যেও দেওয়া-নেওয়া সম্পর্ক আছে, নইলে শুধু দিতে হলে কেউ বাচত না। অর্থাৎ যে পরিচয়হীন আকর্ষণ ছিল শুধু আমারই দিকে, সেই আকর্ষণকে অনেক অর্থ এবং কৌশল ব্যয়ে অপর দিকেও বিস্তার ক’রে দিলাম।

আমার মনের বল এতক্ষণে অনেকটা ফিরে এসেছে। আমি এইখানে একটি কথা না বলে থাকতে পারলাম না। বললাম, “এক্টোপ্রাজম সম্পর্কে এ একটা সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কার যে পয়সা খরচ ক’রে তার প্রভাবকে নিউট্রালাইজ করা যায়। আমি কিন্তু কোথায়ও এ রকম পাইনি। আপনি কি স্পিরিচুয়ালিস্টদের কাছে খবরটা পাঠিয়েছেন?—”

“না, পাঠাবার দরকার হয়নি।” প্রফুল্লবাবু বললেন।

“এক্টোপ্রাজম যে আকর্ষণে আপনাকে টানছে, পয়সা খরচ ক’রে তাকে আপনি টানতে পারলেন, এটা কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে আমার কাছে অসম্ভব বলেই মনে হয়—ওটা আত্মক খোঁসা কি না—টানাটানিটা ওকে নিয়ে ঠিক”—

বন্ধু অধীর ভাবে বলে উঠল, “ওসব কথা থাক, আর রহস্য বাড়িও না, কি করলে খুলে বল।”

আমাদের সকল উৎসাহের বেলুনে পিন ফুটিয়ে, সকল এক্টোপ্রাজম ভেঙে দিয়ে, খিচুড়ির স্বাদ বিস্বাদ ক’রে, বর্ষারাত্রির সমস্ত রহস্যটি নষ্ট ক’রে দিয়ে প্রফুল্লবাবু সংক্ষেপে বললেন, “তাকে বিয়ে করলাম।”

বন্ধু ক্ষিপ্তবৎ চিৎকার ক’রে বলে উঠল, “এ কি ব্যাপার?” একটা প্রেমের গল্পকে ভূতের গল্প বলে চালাচ্ছিলে?”

প্রফুল্লবাবু বললেন “আমার কাছে ও দুটো একই।”

## মৃত্যু ভয়

জীবনটাকে অতি সহজ ভাবেই লইয়াছি। স্বধা অনুভব করিলে প্রচুর আহাৰ  
করি, হাসি পাইলে হাসি, কান্না অনিবার্য হইলে প্রাণ খুলিয়া কাঁদি। অবশ্য,  
ইহা ছাড়া আরও ঘটনা আছে।

কিন্তু অন্য কিছু বলিবাব পূর্বে আমার কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক।  
গত পাঁচ বৎসরে আমার তিনটি স্ত্রী মারা গিয়াছে। মৃত্যু সর্বদাই দুঃখের,  
কিন্তু তৎসঙ্গেও সুখের বিষয় এই যে বিবাহগুলি একসঙ্গে করি নাই, পর পর  
করিয়াছি। তাহা ছাড়া আর একটি মাস্তনার কারণ ঘটিয়াছিল এই যে  
বহু-মৃত্যুজনিত দুঃখ দূর কবিবাব জন্ম আমি কালবিলম্ব না করিয়া চতুর্থবার  
বিবাহ করিবার জন্ম উদ্ভূত হইয়াছিলাম।

এইখানে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একটি অবাস্তব কথা বলিতে হইল। বুদ্ধদেব জরা,  
মৃত্যু প্রভৃতি মানবজীবনের যাবতীয় অভিসম্পাত যৌবন বয়সে হঠাৎ দেখিয়া  
সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা আধুনিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না।  
তাহাদের মত এই যে বুদ্ধদেব বহু পূর্ব হইতেই এই সব দেখিয়াছেন, এবং মানুষ  
যে জরাগ্রস্ত হয় অথবা তাহার যে মৃত্যু হয় ইহা বাল্যকাল হইতেই জানিতেন।  
পণ্ডিতদের এই মতটি প্রতিবাদযোগ্য, কারণ বহুদিন ধরিয়া দেখা ও জানা  
সঙ্গেও মানুষ সত্য করিয়া একদিনই মাত্র দেখিতে ও জানিতে পায়। সংসার  
ত্যাগ করিতে হইলে সেই দিনই করা উচিত।

নিজের গৃহে ধারাবাহিক মৃত্যু দর্শনের সমসাময়িক কালে আমি আমার  
বাড়ির পাশে এমন অনেক ঘটনা অশ্রুচিত হইতে দেখিয়াছি যাহাতে আমার  
মনে বহু পূর্বেই বৈরাগ্য উদয় হওয়া উচিত ছিল। এক ভদ্রলোক তাহার  
স্ত্রীকে অকারণ নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেন, ইহা দেখিয়াছি, সেই পক্ষ শেষে  
বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি, সেই ভদ্রলোক পরে এক  
বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি, সর্বশেষে দেখিয়াছি সেই  
বালিকাকে, সর্ব-আভরণহীনা বিধবার বেশে। এই সব দেখিয়াও আমার মনে  
কোনও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই, কারণ চোখের দেখার সঙ্গে সত্য উপলব্ধির  
সম্পর্ক সব সময়ে ঘনিষ্ঠ নহে।

শেষ পর্যন্ত সত্য আমার মনেও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কাহারও মৃত্যুতে  
নহে, কাহারও নিষ্ঠুরতা নহে, বিবাহ ভাঙিয়া যাওয়াতে। আমি চতুর্থবারের

জন্ম যে উদ্ভোগ করিতেছিলাম তাহার অল্পাংশ সম্পন্ন হইল না। বিপদের লোকেয়া প্রচার করিল আমি স্ত্রীভুক্ত। বিপদদলে হয়তো কোনও ভুক্তভোগীর আবির্ভাব ঘটয়াছিল। প্রমাণ হইল যাহার ভাগ্যে তিনটি স্ত্রী অস্থায়ী হইয়াছে, চতুর্থ স্ত্রীর স্থায়িত্ব তাহার ভাগ্যে কখনই লাভ হইতে পারে না।

হঠাৎ মৃত্যু আমার চোখে ভয়ঙ্কর হইয়া দেখা দিল। তিনটি স্ত্রীর মৃত্যু একসঙ্গে বীজগণিতের ত্রিশক্তি-রীতিকেও অতিক্রম করিয়া প্রবল শক্তিতে আমার বুকে চাপিয়া বসিল। প্রথম স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তাহার সহিত কথা হইয়াছিল সে আমাকে চিরদিন ভালবাসিবে—আমি তাহাকে চিরদিন ভালবাসিব। দ্বিতীয় স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তাহার সঙ্গেও ঠিক ঐ কথাই হইয়াছিল। তৃতীয় স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তাহার সঙ্গেও দেখি ঐ একই কথা হইয়াছে।

তখন রাত্রি বারোটা। ছটফট করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। শহরের প্রান্তে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের চারিদিকের আমবাগান চাঁদের আলোয় মহা রহস্যপূর্ণ নিবিড় অরণ্যের মতো বোধ হইতেছিল। তাহারই এক প্রান্তে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। মানসিক এবং দৈহিক উত্তাপে মাঠের হাওয়া বড়ই তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু মন হইতে দার্শনিক চিন্তাস্রোত বোধ করিতে পারিলাম না।

এইখানে বলা আবশ্যিক যে আমি জীবনে কখনও খিয়েটাব করি নাই। দেখিয়াছিও অত্যন্ত কম। কারণ খিয়েটার মাত্রেই কেহ-না-কেহ স্বগতোক্তি করে, এবং এই স্বগতোক্তি আমার কাছে অত্যন্ত আপত্তিজনক বোধ হয়। কথাটা বলিতেছি এই জন্য যে সেদিন রাত্রি বারোটার চাঁদের আলোয় চিৎ হইয়া শুইয়া আমি স্বয়ং স্বগতোক্তি আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন বুঝিয়াছি স্বগতোক্তি আসলে স্বতোক্তি, রসনা হইতে স্বতই স্থলিত হইতে থাকে, নাট্যকার নিরপরাধ।

সেদিন অনিবার্যরূপে যাহা আমার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতে লাগিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়—

মৃত্যু বিরাট, অনন্ত, ভয়ঙ্কর। দিন ও রাত্রির মতো নিয়মিত ছন্দে জীবন ও মৃত্যুর গান সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। মৃত্যু পটভূমি, জীবন ছবি। ছবি কণকালের, মৃত্যু চিরস্থান। হে মহান্ মৃত্যু, হে স্নহর, প্রশান্ত মৃত্যু, তুমি একদিন আমার জীবনের ছবিকেও তোমার পটভূমিতে মিলাইয়া

দিয়ে, আমি আর তুমি এক হইয়া যাইব। আমার হাসি-অশ্রু, আমার ভয়-ভাবনা, আমার সংগ্রহের বোঝা তখন কোথায় থাকিবে ?

মৃত্যু, তুমি যখন আমাকে আহ্বান করিবে তখন আমার চেতনা থাকিবে কোথায় ? তখন কি বৃদ্ধিতে পারিব না আমার মৃত্যু হইয়াছে ? এই ক্ষণকালের জীবন কি নিতাস্তই ক্ষণকালের ? এই ক্ষণ-দীপ্তির শেষে কি চির-অন্ধকার ? এই স্বপ্নের পশ্চাতে কি কোনো সত্য নাই, কিছু নাই ?

গভীর রজনীর নিস্তরুতা ভঙ্গ করিয়া আমার কানের পাশে ধ্বনিত হইয়া উঠিল “আছে আছে।”

ভয়ে লাফাইয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখি আমার নিকট হইতে প্রায় সাত হাত দূরে আর একটি মানবসন্তান বসিয়া উক্ত কথাটি উচ্চারণ করিয়াছে। কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে আপনি ?”

মানবসন্তান বলিল, আমি ইনশিওর্যান্স কম্পানির এজেন্ট, আসুন, আপনার মৃত্যুভয় দূর ক'রে দিচ্ছি।”

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, “তুমি মৃত্যুভয় দূর করবে !”

মানবসন্তান এক লাফে আমার কাছে আসিল এবং আমার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, দশ রকম প্ল্যান আছে, যেটা আপনার পছন্দ।”

অগত্যা তাহাকেই অনুসরণ করিয়া চলিলাম।

## তিনি

অনেক কাল আগের কথা, যে কালে এ দেশের জনসাধারণ বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের অত্যাচারে অর্জবিত্ত হয়ে পশুর জীবন যাপন করছিল। দেশের যা কিছু সম্পদ, যা কিছু ঐশ্বর্য সেই লুণ্ঠনকারীরা দখল ক'রে নিয়েছিল, আর দেশের জনসাধারণ অসহায় ভাবে ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে দিনের পর দিন পরকালের চিন্তা ক'রে আসছিল। কর্মফলে তাদের বিশ্বাস ছিল এমন দৃঢ় যে যা কিছু দুর্ভোগ এবং অন্তায় অত্যাচার তা যে তাদেরই পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে, এ কথা ভেবে তারা অসীম তৃপ্তিলাভ করত, এবং যত তৃপ্তিলাভ করত তত তাদের এক দল পরম ঐদাসীন্দ্ৰ ভরে বলত জগতে একমাত্র সত্য হরিণাম, তা ভিন্ন আর যা কিছু তা মিথ্যা, মায়। এক দল মনে করত মাতুলিই সত্য। আর এক দল মনে করত হীনতার অপমান সহ্য করাই হচ্ছে কৃচ্ছ, সাধন, ঈশ্বরের কৃপালাভের একমাত্র পথ। এক দল বলত 'অর্থনমর্থং ভাবয়, নিত্যম্,' তাদের সুরে সুর মিলিয়ে সবাই বলত 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।'

তারা খেতে পেত না, পরতে পেত না, কিন্তু তবু কি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তারা লুণ্ঠনকারীদের মাগ্ন ক'রে চলত। ক্রমশঃ তাদের পা শিথিল হয়ে আসছিল, হাতের জোর কমে আসছিল, আর তার ফলে বিদেশী লুণ্ঠনকারীরাই তাদের হাত ধরে চালনা করত, নিজের পায়ে চলার আর তাদের কোনো ক্ষমতাই রইল না। এমনি অবস্থাই চলছিল যুগ যুগ ধবে। এমন সময় তাদের মধ্যে দেখা দিলেন তিনি।

তিনি অতি সাধারণ মানুষ, কিন্তু তাঁর মনে মনুষ্যত্বের মর্মান্দাবোধ জ্বলন্ত শিখার মতো দীপমান। তিনি এসে বললেন, যা আছে তাই ধ্রুব নয়, যা চলছে তা আর চলবে না, তোমরা মানুষ, তোমরা উঠে দাঁড়াও মানুষের মতো। বল, আমরা অন্তায় সহ্য করব না, বল, আমরা মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকব। তিনি বললেন, এগিয়ে এসো আমার সঙ্গে, এসো আমরা অন্তায় শক্তিকে পরাজুত ক'রে সকল মানুষের মধ্যে সমাধিকার প্রতিষ্ঠা করি।

লক্ষ লক্ষ লোক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর কথা শুনে লাগল, শুনে চমকিত হল। কেউ বলল, হাঁ একটা কথার মতো কথা বটে। কেউ বলল, এমন কথা আগে তো শুনি নি ভাই, এ যে একেবারে উঠে দাঁড়াতে বলে।

উঠতে যায় তারা, কিন্তু বহুদিনের অনভ্যাসে পা তাদের কেঁপে ওঠে, চলার



শক্তি খুঁজে পায় না তারা নিজেদের মধ্যে, উঠতে গিয়ে পড়ে যায়। 'অগ্নায় শক্তির বিকল্পে কখনে লাড়াতে হবে এ কথায় অনেকে ভয় পায়, কিন্তু ডাক শুনে তাদের লোভ হয়।

তারা যে মানুষ সে কথা তারা জানত না, তাই তাদের মতো অসহায় অমানুষদেরও দাম আছে এ সংসারে, তারাও যে আর সবাই মতো অধিকার নিয়ে জন্মেছে, এ কথায় তাদের মন নেচে ওঠে। তাদের মনে স্বপ্ন জাগে। তারা এ সংসারে মানুষের সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবে, আপন ভাগ্য আপন হাতে গড়বে, পড়ে পড়ে পরের হাতে মার খাবে না! এই কল্পনা তাদের মনে এক অদ্ভুত আলোড়ন জাগিয়ে তোলে।

কথাটা ক্রমে ধনিকপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পরামর্শ সভা বসে তাদের। এ যে সর্বনাশের কথা। তিনি বলেন কি না আমাদের ধনদৌলতের অংশ দিতে হবে সবার মধ্যে ভাগ ক'রে! এই ধন-দৌলতে নাকি তাদেরই অধিকার, আমরা নাকি তাদের সম্পত্তি আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছি মাত্র। তিনি নাকি বলতে শুরু করেছেন যে আমরা ব্যবসা ক'রে যে মূলধন জমা করেছি তা নাকি অগ্নায়, অপরকে বঞ্চিত ক'রে করেছি। আর এই কথাটা যদি প্রতিদিন প্রচার হতে থাকে তা হ'লে আমাদের কি হবে ভেবেছ?

একজন বুদ্ধিমান বলল, ভেবেছি। কিন্তু দেখা যাক এর কিছু প্রতিকার করা যায় কিনা। সবাই সম্মুখে বলল, প্রতিকার করতেই হবে যেমন হোক। বুদ্ধিমান বলল, দেখি চেষ্টা ক'রে।

পরদিন বিরাট জনসভা। তিনি এলেন তাদের মধ্যে, তাদেরই একজনের মতো। আনন্দের ঢেউ খেলে গেল জনতার মধ্যে। তিনি এবারে আরও এক নতুন কথা শোনালেন তাদের কাছে। বললেন, আমরা আমাদের অধিকার কেড়ে নেব শয়তানের হাত থেকে, কিন্তু শয়তানকেও সেই সঙ্গে মানুষের ধর্মে দীক্ষা দেব। 'শত্রুকে আমরা মারব না, শত্রুকে আমরা জয় করব, তাকেও আমরা মহুশ্বত্বের ধর্মে দীক্ষা দেব।

কেউ বলল, জ্বর কথা। এমন কথা আমরা আগে শুনি নি। কেউ বলল, এমন মনের কথা মনের মানুষ ছাড়া আর কে বলবে?

বুদ্ধিমান সময় বুঝে কাজ শুরু করল। সে চুপি চুপি সবার কানে কানে বলতে লাগল, উনি মানুষ নন গো, দেবতা। উনি যা বলেন তা কি আর কোনো মানুষ বলতে পারে?

যে গুনল সেই বলল, ঠিক কথা বটে, আমরা কি বোকা! এই কথাটা আমাদের এত দিন মনে হয় নি। তাঁকে দেখলেই যে আমাদের মনে ভক্তি জাগে, মাথাটি তাঁর পায়ে নত হয়ে পড়ে, এ কি অমনি-অমনি।

কথাটি ক্রমত ছড়িয়ে পড়ে সবার মধ্যে, সবাই স্বীকার করে, হাঁ দেবতা বটে। ধনিকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তারা টাকা দেয়, দেবতার মন্দির গড়ে উঠতে থাকে আকাশ-ছোয়া। সবাই এখন বুঝতে পারে দেবতা যা বলেন তা দেবতার পক্ষেই সম্ভব, মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের যদি কোনো কল্যাণ তিনি করতে চান তা হ'লে মানুষকে অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে না টেনেও তা তিনি করতে পারেন। সবাই এখন বুঝতে পারে তিনি যখন বলছেন তখন হবেই হবে, আমরা কিছু করি আর না করি।

ধনিকেরা খুশি হয়ে ওঠে।

তাঁর কানে যায় এ কথা। তিনি বেদনা বোধ করেন। তিনি ছুটে আসেন মানুষের মধ্যে, এসে বলেন, আমি তোমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ, তোমরা এগিয়ে এসো আমার সঙ্গে, এসো আমরা আমাদের ভাগ্য গড়ে তুলি নিজ হাতে। কিন্তু তিনি যত বলেন লোকের ততই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে তিনি মানুষ নন, দেবতা।

ধনিকদের চরেরা ফিস ফিস ক'রে বলে দেবতা, দেবতা, দেবতা, দেবতা।

ক্রমে তাঁর কানে খবর এসে পৌঁছায় যে এক বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাতে নাকি তাঁরই মূর্তি স্থাপন ক'রে পূজা করা হচ্ছে। হাজার হাজার লোক সেখানে এসে জড়ো হচ্ছে, মহা আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর মূর্তি স্থাপন উৎসব সম্পন্ন হচ্ছে, লোকেরা নাকি মূর্তি দর্শন ক'রে ধন্য হবে বলে অমানুষিক দুঃখ সহ করেও সেখানে এসে সমবেত হচ্ছে।

তিনি এ কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে বেরিয়ে এলেন এই বর্বর অহুষ্ঠানটি বন্ধ করতে। এই বর্বরতা, এই মূঢ়তাই মানুষকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে অন্ধকারের মতো—এরই হাত থেকে দেশের লোককে বাঁচাতে হবে। কিন্তু কেমন ক'রে বাঁচানো যাবে?...এ প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে তিনি ছুটে চললেন সেই অহুষ্ঠানের দিকে। এগিয়ে গিয়ে দূর থেকে দেখতে পেলেন হাজার হাজার লোক, লক্ষ লক্ষ লোক সমুদ্রের মতো গর্জন করছে মন্দিরের চারদিকে। মন্দিরের চূড়া সূর্যালোকপাতে সোনার মতো জলে উঠেছে। চারদিক থেকে শ্রোতের মতো লোক চলেছে সেই দিকে—তাঁরই মূর্তি পূজা করতে।

তিনি স্থির করলেন মন্দিরের ভিতরে গিয়ে তিনি করজোড়ে সবাইকে এই অস্ত্রায় কাছ থেকে নিবৃত্ত হতে বলবেন। তাঁর চরম নৈতিক শক্তি তিনি প্রয়োগ করবেন এ জন্ত। প্রয়োজন হলে মৃত্যু বরণ করবেন।

কিন্তু কোথায় প্রবেশ পথ। এই বিশাল নিরেট জনপ্রাচীর ভেদ করবেন তিনি কোন্ পথে। যে দিকে প্রবেশ করতে যান সেই দিকেই লোকে তাঁকে ঠেলে দেয়, বলে কে তুমি, তোমার কি আক্কেল নেই, আমাদের ঠেলে ফেলে তুমি এগিয়ে যেতে চাও! কেউ বলে এতই তোমার পুণ্যের বল যে আমাদের টপকে গিয়ে দেব দর্শন করতে চাও আগে? হবে না, হবে না, অন্যপথ দেখ।

তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্তু কোথায়ও প্রবেশপথ পান না। সর্বত্র তাঁকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেয়।

মন্দিরে উৎসবের সঙ্গীত আর দেবতার জয়ধ্বনি প্রতি মুহূর্তে তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে।

## নতুন পরিচয়

ট্রেনে চলছিলাম কলকাতার বাইরে।

আজ সাত বছরের শহুরে একঘেয়ে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কিন্তু মেটাই কি একমাত্র সত্য কথা?

চলছিলাম গয়া, ভাবী শহুরের একমাত্র কন্ঠাকে দেখতে। যুগযুগে বলতে পারেন!

কটা বছর নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাববারই সময় পাই নি, অথচ চুলগুলো আমার অপেক্ষা না করেই পেকে উঠেছে, দাঁতও অনেকগুলো স্থান ত্যাগের নোটিস দিয়েছে। বয়সটা যে চলছে সে কথাটা যুদ্ধান্তে হঠাৎ বেশি অহুভব করছি। আর দুটো বছর পার হলেই চল্লিশে গিয়ে উত্তীর্ণ হব, সুতরাং আর বিলম্ব করা যায় না।

মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। অস্তরে আমি যাই হই বাহিরটা কি ইতিমধ্যেই পরিণয়-কার্ণের প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে না? শুধু সন্দেহ নয়, ভয়ও জেগেছে মনে। নিজের সম্বন্ধে সঙ্কোচ বেড়ে গেছে। এখন কি ক'রে আমার ভাবী শহুরকে বোঝাব যে আমার অস্তর-বাহির এক নয়? আমার এই অকালপকতাই বা কে বিশ্বাস করবে? আমার অস্তর-বাহির এক নয়, এবং আমি অকালপক, এই দুটি কথা আমার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ বলে নি ব'লে আমার একটা গর্ব ছিল। অথচ আজ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি এই প্রার্থনাই করছি, আমার ভাবী শহুর যেন ঐ দুটি কথা আজ আমার সম্পর্কে বিশ্বাস করেন।

সুতরাং বলা বাহুল্য যে আমি খুব নিশ্চিতচিত্তে ট্রেনে উঠি নি। তা ছাড়া গন্তব্য স্থানটি প্রেতলোকের সঙ্গে যোগাযোগের একটি প্রধান স্টেশন, সেখানে অভিপ্রেতের সন্ধানে যাওয়ারটাই কেমন যেন একটা নিরুৎসাহজনক ব্যাপার। সে অশ্রুও মন ভাল নেই।

সেকেণ্ড ক্লাসের উপরের একটা বার্থ রিজার্ভ ক'রে চলেছি। গাড়ি হাওড়া ছাড়বার মুখে আমাদের কামরায় মোট ষাট্টি সংখ্যা হলাম পাঁচ। আমার বিপরীত দিকে এক জন ইউরোপীয় ভদ্রলোক। আমার নিচে মোটা শাল জড়ানো এক বাঙালী দস্তহীন বৃদ্ধ। মাঝখানে আর এক বাঙালী বৃদ্ধ, গায়ে কালো কোট, গলায় কন্ফর্টর। ইউরোপীয় ভদ্রলোকের নিচে পশ্চিম জেলার গুটিকার এক ভদ্রলোক। দুর্দান্ত শীত। সবাই বিছানা বিছিয়ে শোবার বন্দোবস্ত করছেন। আমি আগেই শুয়েছি।

কেউ কারো পয়চিতি নন, হুতরাং কারো মুখেই কোনো কথা নেই। ইউরোপীয় ভ্রমলোক শুয়ে পড়ে একখানা বই পড়তে লাগলেন। তার পরেই লেপচাপা দিলেন পশ্চিমা ভ্রমলোক। দুই বৃদ্ধ বাডালী তখনও ইতস্ততঃ করছেন। কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারলেন না, শীতে হাড়স্ক কঁপিয়ে তুলছে নবারই।

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

কিছুক্ষণ বেশ নিশ্চিন্ত মনেই কাটল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই দেখি কালো-কোটধারী বৃদ্ধ উসখুসু করছেন। আমার নিচের বৃদ্ধ ভ্রমলোকটিকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মনে হল তিনিও জেগে আছেন।

কালোকোট লেপ মুড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু সুবিধা হল না, মাথা বের ক'রে হাই তুললেন।

এতক্ষণ পরে শালধারী প্রথম কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, “মহাশয়ের ঘুম আসছে না বুঝি? আমারও তাই।”

“না তা ঠিক নয়।” বলে কালোকোট চিন্তাবিষ্ট হলেন।

শালধারী প্রশ্ন করলেন, “মহাশয়ের কতদূর যাওয়া হবে?”

কালোকোট বললেন, “গয়া।”

গয়া শব্দটি আমাকে বিচলিত করল। এঁদের আলাপে যোগ দেবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিছু চেপে গেলাম। কে জানে, ইনিই যদি আমার ভাবী স্বপ্নের পদ অলঙ্কৃত করেন? নানা রকম সন্দেহে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। লেপটা মুখের উপর আরও টেনে দিয়ে কৌশলে চোখ দুটো বের ক'রে স্থিরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম কালোকোটধারীর উপর। ভ্রমলোক যেন দাগী আসামী, আর আমি যেন ডিটেকটিভের লোক।

ইনিও পান্টা প্রশ্ন করলেন, “আপনি কতদূর?”

সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, “ধানবাদ।”

ইতিমধ্যে কালোকোট উঠে বসেছেন। এইবার কি তবে আলাপ ভাল ক'রে জমবে? কথায় কথায় কি কন্টার বিবাহের কথাটাও উঠবে না? উঠলে যে বাঁচি। ভাবী জামাতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ন্পষ্ট বোঝা যাবে। কিন্তু আমার ভাবী স্বপ্ন এ সময়ে কলকাতা আসবেন কেন? কিছুই বলা যায় না, হয় তো আমার সম্পর্কে অসুসন্ধান নিতে এসেছিলেন গোপনে। হয় তো গত কাল ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কোনো কারণে যাওয়া হয়নি তাই আজ চলেছেন। মনের সন্দেহ আমার দূর হল না, বরঞ্চ ক্রমশই ধারণা হতে লাগল

যে কাল এঁকেই গিয়ে সপ্রকৃত নমস্কার নিবেদন করতে হবে। হুতরাং আমার কৌতূহলের চেয়েও অস্বস্তি বোধ হতে লাগল খুব বেশি।

কালোকোটের মনে কি আছে কে জানে ?

কিছু তিনি শুকি করছেন ? ব্যাগ খুলছেন কেন ? সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম ব্যাগ থেকে চণ্ডা-মুখ তরল পদার্থপূর্ণ একটা বেঁটে শিশি বের করলেন। তারপর শিশির কর্ক খুললেন। তারপর ফস ক'রে তাঁর বাঁধানো দাঁত দুপাটি খুলে সেই শিশিতে পুরলেন এবং পুনরায় কর্ক এঁটে সেটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলেন।

শালধারী বলে উঠলেন, “আপনার তো মশাই সব বন্দোবস্তই বেশ পাকা। ভাল করেছেন দাঁত খুলে রেখে।”

কালোকোটের মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। ছিলেন প্রায় ষাট বছরের, এখন আশী বছরের মতো হলেন। তাঁর উচ্চারণও সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল, “মশাই, বাঢ় হয়ে বণ্ডোবস্ট করটে হয়েছে।—দাঁত খুলে নেওয়াতে দস্তা উচ্চারণগুলো আর হ'ল না।

শালধারী বললেন, “বাধ্য হয়ে কি রকম ?”

“নীতে বড় কষ্ট পাই, দাঁত ঠক্ ঠক্ করতে থাকে, এই যুদ্ধের বাজারের চতুর্গণ দামে কেনা বাঁধানো দাঁত ঠক্ ঠক্ করিয়ে লাভ কি ?” বলে বিষণ্ণ হাসি হাসলেন।

শালধারী বললেন, “দামের কথা যদি বললেন, তা হ'লে দাঁতে আমার যা লোকসান হয়েছে সে আর বলবার নয়।”

কোট সে কথা জানবার জন্য উৎসাহিত হলেন।

শালধারী বললেন, “আর বলেন কেন। শস্তার বাজারে কিছু সোনা কেনা ছিল, তাই দিয়ে দুপাটি দাঁত করিয়ে নিলাম যুদ্ধের বাজারে। খরচ একই পড়ল, কারণ বাজারের দাঁতের দামও তখন সোনার মতোই। গত মাসে এই গাড়ির মধ্যেই ঘুমন্ত অবস্থায় আমার মুখ থেকে সে দাঁত চুরি হয়ে গেছে, তাই এখন বিনা দাঁতেই কাটাচ্ছি।”

“বলেন কি ! এ তো সাংঘাতিক চুরি।”

“সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক !”

মিনিট তিনেক চূপচাপ কাটল। কালোকোট বলে উঠলেন, “দুঃখ করবেন না মশাই, শুধু বিনা দাঁতে তো নয়। যা দিনকাল পড়েছে, বিনা অন্ন, বিনা বস্ত্রে, বিনা বহু জিনিসে কোনো রকমে টিকে থাকা মাত্র।”

এ কথা শুনে আমার মনটা কেন বেন খারাপ হয়ে গেল। শুনেছি আমার

ভাবী স্বপ্নর শ্রীবৃক্ষ অন্নদা মজুমদার খুব ধনী ব্যক্তি। কলকাতায় বাড়ি আছে, দেশে বাড়ি আছে, দেশের বাইরে গয়াতে বাড়ি আছে—এবং কল্যাণ মাত্র একটি। তথাপি এ কি কথা? “কোনো রকমে টিকে থাকা” তো কোনো ধনী ব্যক্তিরই হতে পারে না। গুর দিকে করুণ দৃষ্টি মেলে এই সব কথা ভাবছি—হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল ব্যাগের উপরকার দুটি অক্ষরের উপর। ইংরেজী এ. এম. দুটি অক্ষর। আর সন্দেহ রইল না লোকটিকে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে লেপের মধ্যে ভাল ভাবে আঙ্গুগোপন ক’রে রইলাম। ক্রমশই আমার মনে নৈরাশ্রের সঞ্চার হতে লাগল আমার চেহারা সম্পর্কে। আমার পাকা চুলই আমাকে পরাভূত করবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তা ছাড়া ভাবী স্বপ্নর যদি ধনী না হন তা হ’লে অসখা এ পরীক্ষার মধ্যে নামি কেন? তার চেয়ে এখনই আঙ্গুপ্রকাশ করা ভাল নয় কি?

কিন্তু অবুঝ মন আশা ছাড়তে চায় না।

শালধারী বললেন, “মশাই ছত্রিশ বছর জায়গার মধ্যেও যে সব ঘটনার স্থান হয় না, তার চেয়েও বেশি ঘটনা ঘটে গেল ছটা বছরের মধ্যে।”

“ঠিকই বলেছেন আপনি।”—কোট উৎসাহিত হয়ে বললেন। “ঠিক তুর্ভি বাজির মতো। এক-আঙুল খুপরীর মধ্যে এমন সব জিনিস ঠেসে পুরে দেয় যার মুক্তি পেতে জায়গা লাগে পঞ্চাশ হাত।”

“তবেই দেখুন কি ভয়ানক ব্যাপার! ছত্রিশ বছরের জীবন ছ-বছরের খুপরীর মধ্যে কাটানো কি সোজা কথা?”—বলে শালধারী ওই কথার প্রতিধ্বনি করলেন।

হাহতাদের হাওয়ায় আলোচনা ছতাশনের মতোই জলে উঠতে লাগল।

কোট বললেন, “মশাই ভেবে দেখুন ১৯৩৯ থেকে আমাদের নার্ভের উপর মিনিটে দশটা ক’রে হাতুড়ির ঘা পড়েছে কি না?”

শালধারী বললেন, “আপনার মতো ভাষার জোর নেই, কিন্তু আপনি খাঁটি কথা বলেছেন। দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে হয়েছে।”

“শুধু দুশ্চিন্তা? দুশ্চিন্তা করতে গেলেও তো মনের খানিকটা সক্রিয়তা দরকার হয়। এ যে একেবারে বেঁধে মারা! মন কিছু ভাববার সময়ই পায়নি—পড়ে পড়ে কেবল মার খেয়েছে। যুদ্ধের প্রথম বছরখানেক অতটা বোঝা যায়নি, কিন্তু এই মার খাওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছে ১৯৪১-এর মাঝামাঝি সময় থেকে।”

“ঠিক কোন্ সময়টার কথা বলছেন?”

“বলছি যখন থেকে আলো-ঢাকা শুরু হল। অন্ধকারে গুঁতো খেতে খেতে পথ চলতে হল।”

শালধারী একটু চিন্তা ক'রে বললেন, “কিন্তু আপনি একটি বড় কথা বাহ দিচ্ছেন। জিনিসপত্রের দাম তার আগে থেকেই বাড়তে শুরু করেছে।”

“বাহ দেব না কিছুই—সবই বলছি একে একে”—বলে কোটধারী লেপটা গায়ে জড়িয়ে বেশ ভাল ভাবে বসলেন।

কি সর্বনাশ, এই ছ-বছরের দুঃখের ইতিহাস শুনে হবে পড়ে পড়ে! কিন্তু আর তো কোনো উপায় নেই। রাত্রি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আর-দুজন যাত্রী বহুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার ভাবী স্বপ্নরকে এতক্ষণ ওই শালধারী উৎসাহ দিয়ে দিয়ে এমন একটা বিষয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন যা মনে হল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। নানা রকম উপমা দিয়ে যে রকম ফলাও ক'রে তিনি এ সম্পর্কে ছু-চারটে কথা এতক্ষণ বলেছেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যুদ্ধজনিত দুর্দশাকে তিনি নিপুণ বৈজ্ঞানিকের মতোই আপন মনে বিশ্লেষণ ক'রে এসেছেন এতদিন। এ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ একটু বেশিই মনে হল। তা না হ'লে তিনি ঘুরে ফিরে আলোচনাটা এর মধ্যেই টেনে আনতেন না। তা ছাড়া রাত্রি গভীর। চলন্ত ট্রেনের একটানা শব্দ, চারিদিকের অন্ধকারের বুকে একমাত্র শব্দ। এই শব্দের পটভূমিতে, এমন গভীর রাত্রে, এমন সহানুভূতিশীল শ্রোতার সম্মুখে যে-কোনো লোকেরই মর্মবেদনা আপনা থেকেই উদ্ঘাটিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম কোটধারী বৃদ্ধ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। তাঁর স্নায়ুর উপর ছ-বছর ধরে মিনিটে দশটা ক'রে হাতুড়ির ঘা পড়েছে, এই ছ-বছরে স্প্রিঙের মতো তাঁর মনের চারদিকে যে শ্বাসরোধকারী কঠিন পাক পড়েছে তা তিনি আজ একে একে খুলবেন এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না। সুতরাং আমাকেও বাধ্য হয়ে প্রস্তুত হতে হল তাঁর কথা শোনবার জন্য।

শালধারীকে তিনি প্রশ্ন করলেন, “শুনবেন সব?”

শালধারী জোর গলায় বললেন, “শুনব না মানে? নিশ্চয় শুনব। এ সব কথা যত শোনা যায় ততই মনটা হালকা হয়। তা ছাড়া দুঃখ-দুর্দশা তো শুধু আপনার একার নয়, আমাদের সবার, এবং বলে আপনি যত আরাম পাবেন, আমরা শুনে তত আরাম পাব।”

“সে তো বটেই। কিন্তু সব শেষে এমন একটি কথা প্রকাশ করব যা শুনে হয়তো আপনি চমকে যাবেন, আর হয়তো কেন, আমার বিশ্বাস আপনি নিশ্চয় চমকে যাবেন।”

শালধারী চমকে যাবার আগে আমি চমকে গেলাম এই কথাটি শুনে।



আমার সন্দেহ হল উনি সর্বশেষ যে বিশ্বের কথা বলবেন সেটি নিশ্চয় আমারই সম্পর্কে। বলবেন—“ছ-বছরের দুর্দশা কাটিয়ে যদি বা আলোর মুখ দেখা গেল, যদি বা কন্যাটির বিবাহ দিয়ে নিশ্চিত হতে চাইলাম, কিন্তু প্রথমেই যে পাত্রটিকে পেয়ে খুশি হব ভাবলাম সে একটি অপাত্র। একেবারে বড়ো, আমারই বয়সী; এই ভাবে মশাই থাকার পর থাকা, আঘাতের পর আঘাত খেয়ে চলেছি।” অথবা এই কথাই অল্প ভাষায় বলবেন।

এই কাল্পনিক অপমানে আমার অন্তরাখ্যা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে বেকে দাঁড়াল। আমি গম্বা নামব না ঠিক ক’রে ফেললাম। গাড়িভাড়াটা গেল, যাকগে। বিয়ে যদি করতে হয়, ঘরে বসে করব। আরও অনেক রকম শপথ করলাম মনে মনে।

শালধারী একটুকুণ চিন্তা করলেন। বোধ হয় এই যুদ্ধের কয়েকটি বছরের মধ্যে চমকে যাবার মতো কিছু আছে কি না খুঁজে দেখলেন, কিন্তু পেলেন না। বললেন, “বলুন না আপনার কথা—খুবই অদ্ভুত কথা না কি?”

“একেবারে আরব্য উপন্যাসের মত অদ্ভুত। দাঁড়ান দাঁত লাগিয়ে নিই আগে, নইলে বড় অসুবিধা হচ্ছে।” বলে ব্যাগ থেকে দাঁত বের করতে লাগলেন।

কথা আরম্ভ হল। শুরু হল ১৯৩৯ সালের যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে। কি রকম দিনের পর দিন আতঙ্ক বাড়তে লাগল, কি ভাবে আলোক নিমন্ত্রণ শুরু হল, জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা হল, তারপর জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা করল—সব একে একে বললেন। এর প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি খবর, কি ভাবে মানুষের নার্ভের উপর ঘা মেরেছে তা শোনালেন। তার পর জ্বিনিসের দাম বেড়ে যাওয়া—জ্বিনিস দুপ্রাপ্য হওয়া—লোকের দুর্গতির কথা, শোনালেন। দুর্গতি ক্রমশ বাড়তে লাগল। জাপানীরা বর্মা প্রবেশ করল, কলকাতার লোক শহর ছেড়ে পালাল, আবার ফিরে এল, তারপর ৪২ সালের ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম বোমা পড়ল, দ্বিতীয় বার শহর ছেড়ে পলায়ন শুরু হল। এইভাবে শহরবাসীরা নানা ভাবে নাস্তানাবুদ হতে লাগল। জাপানীরা আন্দামান দখল করল। যখন তখন কলকাতা আক্রমণের ভয়। এই অবস্থায় আবার একে একে শহরে ফিরে আসা এবং দ্বিতীয় বার সর্বস্বাস্ত হওয়া—এই সব কথা একটি একটি ক’রে তাতে অতি ভয়ঙ্কর বং ফলিয়ে তিনি তাঁর শ্রোতাকে স্তম্ভিত করতে লাগলেন।

বলা বাহুল্য আমিও স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম। এ রকম বিতীষিকা বিশ্লেষণ আমি আর ইতিপূর্বে দেখি নি। তাই তাঁর একটানা একটি পর্বের বক্তৃতা

শেষে যখন তিনি হঠাৎ তাঁর শ্রোতাকে প্রশ্ন করলেন, “শুনছেন?”—তখন আমিই হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে আগে বলে উঠলাম, “খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনছি।”

আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে ঠিক সেই সময় শালধারীও উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, “নিশ্চয় শুনছি—আপনি—আপনি থামবেন না।” তাই আমার কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। আমি কখন যে এই কাহিনীর মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম বুঝতেই পারি নি।

আধ মিনিট বিরামের পরেই কোটধারী আবার তাঁর কাহিনী শুরু করলেন। এ কাহিনীর মধ্যে নতুন কিছুই নেই—এর প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেই প্রতিটি দিন ওতেপ্রাতভাবে জড়িত—এর প্রত্যেকটি মিনিটের অভিজ্ঞতা আমাদের সবার অভিজ্ঞতা, কিন্তু তিনি যেভাবে সব কিছুর ব্যাখ্যা করছিলেন, এবং বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কি ভাবে এগুলো আমাদের স্নায়ুর উপর আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চলেছে—তা আমার কাছে অস্তুতঃ সম্পূর্ণ নতুন। যুদ্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর ভাবে আমাদের সর্বনাশ ক’রে গেছে তা এই প্রথম উপলব্ধি ক’রে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি।

১৯৪৩-এর ১৬ জানুয়ারি তারিখের বোমার আক্রমণটা তিনি বর্ণনার ভঙ্গীতে আবার বাস্তব ক’রে তুললেন। এত দিন পরে তা শুনে আবার বুক কাঁপতে লাগল। তার পর নিপুণভাবে ব্যাখ্যা ক’রে বুঝিয়ে দিলেন প্রথম শহর ছেড়ে পালানোর স্নায়ুর উপর যে পরিমাণ ঘা লেগেছিল, দ্বিতীয় বারের পলায়নে তার চেয়ে অস্তুত দশগুণ বেশি ঘা লেগেছে। উপরন্তু এ অবস্থাতেও যখন ৩০ মার্চ তারিখে গোটা বাংলা দেশকে বিপজ্জনক এলাকা ঘোষণা করা হল তখন থেকে শহরের কোনো মানুষই আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে নি—সহজভাবে কেউ আর নিশ্বাসও নিতে পারে নি।

বুদ্ধের বলবার ভঙ্গি সত্যই অতি চমকপ্রদ। যখন কথা শুরু করেন তখন কণ্ঠ কিছু কীর্ণ থাকে। তার পর সে কণ্ঠ ধাপে ধাপে চড়তে থাকে এবং কথার পর কথা চলতে থাকে অবিরাম গতিতে। তিনি না থামা পর্যন্ত মাঝখানে আর কারও কিছু বলবার অবসর থাকে না। তাই এতক্ষণ আমরা মস্তমুগ্ধবৎ তাঁর কথা শুনে গিয়েছি, কখনও বিরক্তি বোধ করিনি—জানা কথার পুনরাবৃত্তি এক মুহূর্তের জন্মও একঘেয়ে লাগেনি।

বুদ্ধ দ্বিতীয় বার একটু থামতেই শালধারী নিতান্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্মেই তাঁর কতকগুলো কথা নিয়েই কথা বলে আবৃত্তি করতে লাগলেন এবং

আনালেন হবার শহর ছেড়ে পালানোর ব্যাপারে তিনিও প্রায় সর্বশাস্ত হয়েছেন।

কোটধারী আবার অমুপ্রাণিত হয়ে বলতে লাগলেন, “হতেই হবে, কারোই নিস্তার নেই। কিন্তু এই দুশ্চিন্তা আতঙ্ক আর ছুটোছুটিতেই তো সব শেষ নয়, শুধু কাল্পনিক ভয় তো নয়, বিভীষিকা মূর্তি ধরে এলো একেবারে চোখের সম্মুখে। ডাইনে বামে নিরন্তর হাহাকার—ডাইনে বামে মৃত্যু দৃশ্য! পথ চলতে হচ্ছে মৃতদেহ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। মানুষের এমন মৃত্যু তো কখনও দেখি নি, কখনও ভাবি নি! এ রকম নিষ্ঠুর করুণ মৃত্যু, এমন অসহায় নীরব মৃত্যু!—শত শত নরনারী শিশু বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী—শূন্য দৃষ্টি মেলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে চোখের সামনে—এ কি দেখা যায়? চোখ খুললে এই বেদনার দৃশ্য, চোখ বুজলে গভীর আতঙ্ক। পায়ের নিচে ঘেন মাটি নেই, আশ্রয় নেই। অন্ধকারে দম বন্ধ হয়, আকাশে চাঁদ উঠলে বোমার ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে। এমনি অবস্থাতেই তো মানুষ পাগল হয়ে যায়, পাগল হইনি এ খুব আশ্চর্য মনে হয়, কিংবা হয়েছে কি না কে জানে!”

শালধারী বললেন, “এমন কি খবরের কাগজ খুললেও কেবলই বীভৎস সব ছবি দেখতে হয়েছে—জাপানীদের অত্যাচারের সব ছবি।”

“ঠিক কথা। এইভাবে শহরের লোকের হাত পা বেঁধে ছ-বছর ধরে তার তার উপর ঘেন লাঠি চালানো হয়েছে। মনে আতঙ্ক, চোখে বিভীষিকা, কানে করুণ ক্রন্দন—এতদিন ধরে কোনো মানুষের পক্ষে সহ করা সম্ভব? কিন্তু আজও কি মুক্তি পেয়েছি? যুদ্ধ শেষে যে মুক্তি আশা করেছিলাম, সে আশা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু সাইরেন নেই, কিন্তু আর সবই আছে। আরও কতদিন থাকবে কে জানে?”

এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধ চুপ করলেন। তাঁর দৃষ্টি বেদনাচ্ছন্ন, উদাস। ঘেন ভবিষ্যৎ কালের অনিশ্চয়তার মধ্যে আরও একবার সে দৃষ্টি চালনা করবার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না, দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে।

আমি একদৃষ্টে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে আছি। এতক্ষণ তাঁর কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সত্বেই শুনেছি এবং আমিও যে এমনি একটি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই ছটি বছর কাটিয়ে এসেছি তা এই মুহূর্তে উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি। আমি ভুলে গিয়েছি আমি কোথায় চলেছি, কেন চলেছি। এমন সময় শালধারীর কণ্ঠ থেকে প্রশ্ন কানে এলো “আপনি সর্বশেষ কোন্ কথাটি বলতে চেয়েছিলেন?”

এই প্রকৃষ্টি আবার আমাকে বিহ্বল করে তুলল। নিশ্চয় রোধ করে অপেক্ষা করে রইলাম সেই কথাটি শোনবার জন্য, যেন এইবার আমার যুক্ত্যদণ্ডের আদেশটি শুনতে পার।

কিন্তু বা শুনলাম সে তো যুক্ত্যদণ্ডদেশ নয়! অত্যন্ত সাধারণ একটি কথা এবং তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। বললেন, “মশাই শুনলে বিশ্বাস করবেন না, আমি এই শব্দ কাটিয়ে উঠতে পারি নি।”

তা হলে কি বৃদ্ধ উদ্ভাদ? কে জানে! হয় তো তাই। কারণ তিনি উদ্ভাদের মতোই পলকহীন দৃষ্টিতে শালধারীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, “এই দেখছেন চুল? এর একটিও কালো নেই। এই দেখছেন মুখ? মুখের চামড়া বুলে পড়েছে। দাঁতের কথা তো আগেই জানেন। কিন্তু কেন আমার এই দুর্দশা? এই যুদ্ধের আঘাতে, স্নায়ুর উপর অবিরাম ধাক্কা। আমার আয়ু শেষ করে দিয়েছে এই ছটি বছর! আমি—আমি সম্পূর্ণ অকালে একেবারে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি—সম্পূর্ণ অকালে, আপনি বিশ্বাস করুন।”

শালধারী মাত্র একটি বিশ্বাসঘূচক শব্দ করলেন, তাঁর মুখ থেকে কিছুক্ষণ আর কোনো কথা শোনা গেল না। আমার মনে সহসা নতুন আলোকপাত হল! আমি এই স্তম্ভোৎসবে একেবারে উঠে বললাম। বৃদ্ধের যুক্তি আমি কাজে লাগাব। তাঁর কথায় আমারই আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি মিলে গেল, হয় তো মুক্তিও এতেই মিলবে। এখন একমাত্র ভাবনা রইল, ভাবী স্বপ্নের কন্যাকে কি বলে ভোলাব? তবু পকেট থেকে ডায়েরি বের করে কয়েকটা পয়েন্ট নোট করে নিতে লাগলাম।

এমন সময় আমার সমস্ত আশা নির্মূল করে কোটধারী বলে উঠলেন, “মশাই বিশ্বাস করতে পারেন আমার বয়স আটত্রিশ বছর? বিশ্বাস করতে পারেন, চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কি অমানুষিক বেদনায় একখানি কাঁচা মন ব্যয়ে বেড়াচ্ছি একখানা পাকা দেহের মধ্যে?”

আমার আর ভাববার ক্ষমতা ছিল না। এর যদি বয়স আমার সমান হয়, তাহলে ইনি যে আমার ভাবী স্বপ্নের নন সে কথা ভেবে তৎক্ষণাত্ আমার কিছু ‘আরাম’ বোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু এতক্ষণ ধরে যাকে অন্তর থেকে পূজনীয় করে তুলেছি—মনে হল তিনি যেন আজ আমাকে নানাভাবে ঠকাবার জন্যই উচ্চত হয়েছেন। হঠাৎ একটা আশাভঙ্গের বেদনায় চেয়েও নিজের অসুস্থমানস্কতির এতখানি দারিদ্র্য উপলব্ধি করে বেশি বেদনা পেলাম। সমস্তই

কেমন যেন একটা ধাঁধা বলে বোধ হতে লাগল। যেন গাড়ির মধ্যে একটা ভৌতিক ক্রিয়া চলছে—যেন সমস্তই অবাঞ্ছনীয়, সমস্তই মায়ী।

সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল যখন শালধারী বললেন, “মশাই কে কাকে অবাধ করবে তাই ভাবছি। আমার বয়স কত মনে হয়? বিশ্বাস করবেন, আপনার চেয়ে আমি মাত্র দু-বছরের বড়? বলিনি এতক্ষণ, কারণ দরকার হয় নি। কাউকেই বলি না, চুপ করে থাকি, কৌতুক বোধ করি মাঝে মাঝে নিজেকে বৃদ্ধ মনে করে।”

কোটধারী একেবারে হো হো করে হেসে উঠলেন এই কথা শুনে। হাসতে হাসতেই বললেন, “তা হ’লে দেখছি আমার নিজের কথা সত্যিই সবার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে! এ যুদ্ধের ধাক্কায় তা হ’লে ক্ষীণজীবী সব বাঙালী যুবকেরই এই দশা ঘটেছে।—আমি একা অন্তকূল মুখুঞ্জেরই শুধু বড়ো হই নি!”

শালধারী তড়িৎগতিতে দাঁড়িয়ে উঠে অন্তকূল মুখুঞ্জেকে জাপটে ধরলেন, এবং গলা ফাটিয়ে উচ্চারণ করলেন, “তুই অন্তকূল? তুই আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি মস্তোষ!”

এইবার আমার পালা। আমার হাত-পায়ে প্রকৃত যৌবনশক্তি ফিরে এলো, আমি এক লাফে নিচে পড়ে দুজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলাম—“আর আমি যে বিনয় রে! চিনতে পারছিস তোরা?”

এর পর যা ঘটল তা অকথ্য। চলল বেপরোয়া চিংকার। তিন অকাল-বৃদ্ধের কোলাহলে ইউরোপীয় ভদ্রলোক রক্তচক্ষু খুলে কর্কশ কণ্ঠে হাঁকলেন “হোয়াটস আপ্ দেয়ার?”

“নাথিং সাহেব, উই ওল্ড ফ্রেণ্ডস্ মীট আণ্ডার নিউ সারকমস্ট্যান্সেস্”— বলে আমি সাহেবকে আশ্বস্ত করলাম। সাহেব পাশ ফিরে গুলেন।

সাহেবকে সত্য কথাই বলেছিলাম। আমরা তিন জনেই সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধু—মাত্র ছ-সাত বছর আমাদের দেখা হয় নি।

এত কোলাহলেও পঞ্চম যাত্রীটির কোনো অসুবিধা হয় নি। তাঁর চেহারা দেখে মনে হল বহু বাঙালীকে মেরে ইনি সম্প্রতি স্ফীত হয়েছেন, তাই তাঁর নাক-ডাকা একই ভাবে চলতে লাগল।

## প্রতিযোগ

পৃথিবী একদিন অগ্নিপিশুৎ ছিল, তারপর ধীরে ধীরে আগুন নিবে এলো, ধোয়াটে জিনিস জমাট বাঁধল, জল এবং স্থল দেখা দিল, তারপর একক সেল্‌দেহী প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব ঘটল, তারপর সেই প্রাণী বিবর্তনের ধারাপথে মানুষরূপে দেখা দিল, তারপর সে মানুষ ভাবা শিখল, দেশবিদেশের পরিচয় সংগ্রহ করল এবং পৃথিবীর ভূভাগের একটি ক্ষুদ্রতম অংশের নাম দিল পাবনা জেলা। সেই পাবনা জেলার একটি ছোট্ট গ্রামে পদ্মানদীর ধারে হরেন দাস তার সঙ্গীদের নিয়ে বসে আলাপ করছে।

সে বলছে “দূর দূর, গাঁয়ে আবার মানুষ থাকে? না আছে বেলগাড়ি, না আছে থিয়েটার বায়োস্কোপ, না আছে সাহেবমেম, যত সব মুখখু চাষার আড্ডা। আর, কাজের মধ্যে কি? না, মাঠে লাঙ্গল নিয়ে তা-তা কর, না হয় জাল নিয়ে গাঙে মাছ ধর, না হয় কুড়ুল দিয়ে গাছ কাট। এমন গ্রামের মুখে লাধি মারি।”

উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে গ্রামের হীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে হরেনের দিকে। হরেন চেয়ে থাকে পদ্মার শ্রোতের দিকে। সেই শ্রোত বেয়ে হরেনের মন গ্রাম ছেড়ে কোন্‌ সূদূরে চলে যায়। তারপর হঠাৎ বলতে থাকে, “আমি তো বাবা, এ গাঁয়ে বেশি দিন থাকতে পারব না, সে তোরা যাই বলিস। ঘেন্না ধরে যায় না রোজ রোজ একপাল রোগা মুখখু চাষার মুখ দেখে দেখে? দম বন্ধ হয়ে আসে না এই জেলখানায়? পেটে চর পড়ে যায় না মুড়িচিঁড়ে খেয়ে খেয়ে?”

কথাগুলো হরেন এমন চালের সঙ্গে উচ্চারণ করে যাতে এই প্রশস্ত উদার নদীর কলগান মুখরিত, সহস্র স্বপ্নস্বভিবিজ্জড়িত ছোট্ট গ্রামখানি সঙ্গীদের চোখে অতি কুৎসিত কালিমালিপ্ত হয়ে দেখা দেয়। তাদের মনে হয় এই বিপুল স্নেহবর্ষী গ্রামখানির মধ্যে কোথায় যেন একটি মস্ত ফাঁকি আছে, কিন্তু কোথায় তা তারা বুঝতে পারে না।

হরেন খুব গম্ভীর ভাবে বলে, “দেখে নিস তোরা, হরেন দাস কবে সটকেছে গাঁ থেকে।”

হরেন ম্যাটি কুলেশন ক্লাসে পড়ে। গ্রামেই এক ডাঙা স্কুল আছে। কিন্তু স্কুলকে সে বড় গ্রাঙ্ক করে না। সে সাধারণ চাষী গৃহস্থের ছেলে হয়েও ঐক্যতো

এবং অহঙ্কারে গ্রামের সবার মনে ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে। ওর জামাকাপড় পরার ভঙ্গিতে, ওর চালচলনে, ওর কথার উচ্চারণে, বতদূর সম্ভব গ্রামাতা বর্জনের চেষ্টা আছে। শিক্ষকেরা বিরক্ত হয়ে বলেন, ছোকরা মহা ওস্তাদ। গ্রামের লোকেরা বলে, ও একটি কুলাঙ্গার। কিন্তু সে অগ্র্য কারণে।

হরেনের বাবা বিশ্বস্তুর দাসের অবস্থা গ্রামের অনেকের চেয়েই ভাল। পুহু হলেও স্বখী পরিবার। সবার মনে ঈর্ষা জাগানোর পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু এ ছাড়াও কারণ আছে। বাবা ছেলেকে আদ্বারা দেয়, প্রশ্রয় দেয়, এমন দুর্নীতির দৃষ্টান্তে গ্রামের ছেলেদের মাথা খাওয়ার চেষ্টা করাতেও ছেলেকে কিছুই বলে না। ছেলে জেলা-শহরে গিয়ে মাঝে মাঝে চুল ছাটিয়ে আসে, আর কি বাহার তার। এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত পিছনে গুর দিয়ে চাঁছা। এই দুষ্কায়েব পয়সা দেয় তার বাবা—অথচ দরকার মতো দায়ে-ঘায়ে ঠেকলে দুটো টাকা হাওলাত পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্তুর দাস অবশ্য মাঝে মাঝে বিরক্তিব ভান করে বলে, “তোমার চোদ্দ পুরুষে যা করেনি, তা করতে তোমার লজ্জা হয় না? হরেন জবাব দেয়, “আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ ম্যাট্রিকুলেশন পড়েছে?” এর পব আর বিশ্বস্তুরের বলবার কিছু থাকে না।

গ্রাম যে তার জগ্ন নয়—এ ধারণা হরেনের মাথায় কোথেকে ঢুকল তা কেউ জানে না। কিন্তু সে এই আশাতেই অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত হচ্ছে অনেক দিন ধরে। এর জগ্নই সে গ্রাম্য ভাষার সঙ্গে কলকাতার উচ্চারণ মিশিয়ে কথা বলে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে ইংরেজী শব্দরও মিশেল আছে। সে জানে কথার সঙ্গে ইংবেজী না মেশালে ভদ্রলোকের ভাষাই হয় না।

গ্রামের হিতৈষী লোকেরা বিশ্বস্তুরকে বলে, “হরেনকে গাঁয়ে আটকে রাখতে পারবে না, দাসের পো। সময় থাকতে বিয়েটি দিয়ে ফেল, নইলে অল্পতাপে কাটবে সারাটা জীবন।”

কিন্তু হরেন বিয়ের প্রস্তাবে ক্ষেপে যায়। মাকে বলে, “গাঁয়ের মুখু মেয়ের জগ্ন নগেন আছে।”

নগেন ওদের শরীকের ঘরের ছেলে। দুই শরীকে বিবাদ, যেমন হয়ে থাকে। বিশ্বস্তুর নকুলেশ্বর দুই ভাই, কিন্তু এখন ওদের সবই আলাদা। বিশ্বস্তুর চতুর, নকুলেশ্বর সাদাসিদে। স্তত্রাং একই জমিজমার উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নকুলেশ্বরের অবস্থা খারাপ। নকুলেশ্বর ছোট থাকতেই বিশ্বস্তুর বাকী খাজনায় সম্পত্তির অনেকখানি অংশ নিলামে চড়িয়ে বেনামীতে আত্মসাৎ করেছে।

তাই ওদের দেমাক একটু বেশি। ছেলোদের মধ্যেও এই বিষ ছড়িয়েছে। হরেন নগেনকে ছোট নজরে দেখে। ওকে তাচ্ছিল্য করে। সে জন্তু নগেন দাস ওর মুণ্ডপাত করে, কিন্তু বাইরে কিছু করতে পারে না। পড়াশোনার দিক দিয়েও ও হরেনকে নিচে ফেলতে পারে না, সেইজন্য মনে মনে জলতে থাকে, হিংসা জেগে ওঠে ওর মনে, কিন্তু সে অসহায়ের হিংসা। সুতরাং সে যতই চেষ্টা করে হরেনকে ছাড়িয়ে উঠতে, ততই সে আরও যেন নিচে পড়ে যায়। হরেন দেখতে দেখতে ইংরেজীতে অনেক উন্নতি ক'রে ফেলল, নগেনের সেই কারণেই ইংরেজী ভাষার উপর ঘৃণা জন্মাল। হরেন প্রাণপণে শহরে হলে উঠল, নগেন আরও বেশি ক'রে গ্রাম্য ভাব ফুটিয়ে তুলল তার চালচলনে।

ইতিমধ্যে সামান্য একটি ঘটনায় হরেন গ্রামের মধ্যে রীতিমতো একটি উদ্ভেজনার সৃষ্টি ক'রে বসল। ঘটনাটি এমনই অপ্রত্যাশিত এবং অতর্কিত যে মুহূর্তকালের জন্তু হরেনের শত্রু মিত্র সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

হরেন স্ত্রীমারের এক সাহেবের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলে এসেছে! বাপ্‌রে, কি কাণ্ড! স্বয়ং হেডমাস্টার পর্যন্ত ভয় পায় সাহেবের সামনে যেতে! পথ চলতে সবাই সবিশ্বয়ে হরেনের দিকে চেয়ে থাকে! সাহেব আর হরেন মুখোমুখি, সেই অকল্পিত দৃশ্যটি কল্পনায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে।

অন্য ছেলোদের আর মাথা উঁচু ক'রে চলবার উপায় রইল না। সবাই বলে, বিশ্বস্তর দাসের ছাওয়াল ছাওয়াল নয়, হীরের টুকরো। আর তোরা হতভাগারা সব অকালকুস্মাণ্ড।

চক্রবর্তীর সঙ্গে দত্তের দেখা।

“ওহে শুনেছ?”

“আজ্ঞে দাঠাকুর, কে না শুনেছে?”

একদল ছেলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, চক্রবর্তী তাদের ডেকে বলল, “মুখে একেবারে কালি মাখিয়ে দিয়েছে না? একই গাঁয়ের ছেলে, ছোটলোকের ছেলে, আর তার কাছে কি না তোদের মাথা হেঁট হল?”

ছেলের দল কোনো রকমে মাথা নিচু ক'রে সবে পড়ল।

চক্রবর্তী দত্তের চোখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল, তারপর চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে চাপা সুরে বলল, “হারামজাদা ছেলে খিরিষ্টান হবে, গাঁ ডোবাবে বলে দিচ্ছি।”

দত্ত মোৎসাহে বলল, “তাতে আর সন্দ আছে।”



হরেনের বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থিতিস্থাপক হওয়ার ব্যর্থতা বেড়েই চলল। কেউ তা বোধ করতে পারল না। এবং একদিন সবাই স্তম্ভিত হয়ে শুনে হরেন স্থিতিস্থাপক উঠে কোথাও চলে গেছে।

চক্রবর্তী বলল, “শালা ছেলে গেছে না বাঁচা গেছে।”

দত্ত বলল, “আগেই বলেছি দাঠাকুর, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে।”

সরকার বলল, “এখনও বিশ্বাস নেই বাবা, ফিরে এসে আরো কি কেলেকারি ক’রে বসে, দুদিন সবু ক’রে দেখ।”

চক্রবর্তী প্রস্তাব করল বিশ্বস্তরকে কিছু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। বিশ্বস্তর শ্রম হয়ে হাঁকা টানছিল! তার স্ত্রী একটু দূরে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে। চক্রবর্তী তাকে শুনিয়ে বিশ্বস্তরকে বলতে লাগল, “ভাবনার কি আছে এতে ? ও ছেলে তোমার ঠিক ফিরে আসবে।”

দত্ত বলল, “তবে ছেলে সাহেব হবে—”

সরকার বলল, “তাতে আর হয়েছে কি ? হাতে না খেলেই হল।”

চক্রবর্তী বলল, “তাই বা খাওয়া যাবে না কেন ? প্রাচীর ক’রে নিলেই হবে।”

ঘটনাটি বিশ্বস্তর পরিবারের পক্ষে ঘটই মর্মান্তিক হোক, গ্রামের সবাই বেশ একটা উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দ অনুভব করতে লাগল। নগেনের পক্ষেও ঘটনাটি এক রকম ভালই হল। হরেনকে সে শত্রু মনে করত, সে শত্রু সরে গেল। তদুপরি গ্রামের সবাই এখন তার দিকে মনোযোগ দিল। তারা ওকে বোঝাতে লাগল হরেনের মতো ছেলে গ্রামে ছিল বলেই নগেনের উন্নতি হয়নি। বলা বাহুল্য নগেনও তাই মনে করে।

হরেনের পদমর্যাদা পাবার জন্য নগেনও ভাষার সঙ্গে ইংরেজী মেশাল; লোকে বলল, এই তো উন্নতি হচ্ছে। নগেন ঘাড় কামিয়ে ফেলল, লোকে বলল, হরেনের চেয়ে নগেন কিসে কম ? নগেন উগ্র রঙচঙা জামা পরল, লোকে বলল, চমৎকার। কেবল এই অস্বাভাবিক বর্ণবাহুল্যে গ্রামের শুকনো কুকুরগুলো ভয় পেয়ে নগেনের পিছনে পিছনে তাড়া ক’রে ফিরতে লাগল।

কিছুকাল বেশ ভালই কাটল। নগেনের ভাগ্যতরীখানা বেশ উজ্জিয়ে আসছিল, এমন সময় এক দমকা বাতাসে তার পাল ছিঁড়ে তরী মাঝপথে ঘুরপাক খেতে লাগল, সম্পূর্ণ যে ডুবে গেল না সে কেবল নগেনকে নিয়ে আরও একটু খেলাবে বলে।

মাস তিনেক পরে বিশ্বস্তরের নামে চিঠি এলো—লিখেছে হরেন। এতদিনের নিরুদ্দিষ্ট ছেলের উদ্দেশ্য পাওয়া গেল সত্যি সত্যি।

এই চিঠি সকলের আগে পড়ল পোস্টমাস্টার, তারপরে পোস্টম্যান, তারপরে ডাকঘরে উপস্থিত সবাই। চিঠি বিশ্বস্তরের হাতে পৌঁছানর আগেই তার কাছে খবর পৌঁছে গেল, হরেন কলকাতা আছে, এবং এক সদাগরি আপিসে চাকরি করছে। আরও লিখেছে আপিসের সাহেবরা তার কাজে খুব খুশি স্তরাং ভবিষ্যতে খুব উন্নতির আশা আছে।

একটা বোমা এসে যেন ফেটে পড়ল।

“দামের বেটা যে তাক লাগিয়ে দিলে হে?”

“তখনই সন্দেহ হয়েছে মনে মনে, ও ছেলে একটা কিছু করবেই।”

চক্রবর্তী দ্রুত পায়ে বিশ্বস্তরের বাড়িতে গিয়ে বলল, “যা ভেবেছি ঠিক তাই হল কি না?”

দত্ত গিয়ে ফলাও ক’রে বলতে লাগল, “আমি কিন্তু অবাক হইনি দাম মশায়। বুঝলেন না? এ যে হতেই হবে। সূর্য পূব দিকে ওঠে এতে কি কেউ অবাক হয়? তুমিই বল না?”

একবার চক্রবর্তী বলে, একবার দত্ত বলে। কেউ সহজে উঠতে চায় না। চক্রবর্তী মনে মনে অধীর হয়ে বলল, “দত্ত, চল এবারে উঠি।”

দত্ত বলল, “আপনি এগোন, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।”

চক্রবর্তী উঠে যাবার পর ক’দিন আগের প্রস্তাবিত হাওলা তটা আজ চেয়ে বসল। গোটা দশেক টাকা আজ তাকে দিতেই হবে।

বিশ্বস্তর খুশি ভাবেই টাকাটা তাকে দিয়ে দিল। পূর্বেকার অনাদায়ী পাঁচটা টাকার কথা আর তার তুলতে ইচ্ছে হল না।

দত্ত চলে যেতে না যেতে চক্রবর্তী এসে তারও কিছু নিবেদন পেশ ক’রে রাখল।

হরেনই যে ভবিষ্যতে গ্রামের একমাত্র ভরসা এ বিষয়ে কারো আর সন্দেহ নেই, তাই তারা অতি নিষ্ঠার সঙ্গে হরেনকে উপলক্ষ ক’রে তাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন গড়ে তুলতে লাগল। এবং অবসর পেলেই নগেনের বাড়ি গিয়ে নকুলেশ্বরকে বলতে লাগল, “ছেলেকে আর গাধার মতো পাড়িয়ে লাভ কি? ও সব ছাড়িয়ে চাষের কাজে লাগিয়ে দাও।”

বলা বাহুল্য বিশ্বস্তরের প্রতি তাদের আত্মগত্য প্রকাশের এ এক নিষ্ঠুর গ্রাম্যপন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নগেন অত্যন্ত আহত হয়, তার পড়া এগোয় না, মনে হয় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু কোথায় সে যাবে? বাইরে যাবার পথ তার বন্ধ,

বাইরের সহানুভূতি সে পায় না, এমন অবস্থায় বাধা হয়েই সে খরের দরজা বন্ধ করে পড়াশোনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল, এবং ধারাপ ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও যথাসময়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করল। এ ঘটনাও দাস-পরিবারের পক্ষে অস্বাভাবিক, কিন্তু তবু কোনো উৎসাহ সে পেল না একমাত্র বাপমায়ের কাছ ছাড়া। নকুলেশ্বর ওকে বুঝিয়ে বলল, “ভাগ্য যখন এই দিকেই ফিরেছে তখন চালিয়ে যা যতদূর পারিস।”

নগেনও বুঝে দেখল, এ ছাড়া বড় হবার আর পথ নেই। কালক্রমে আইন পাস করতে পারলে গ্রামের মধ্যে কিছু খ্যাতির পাওয়া যাবে—তার আগে কিছু হবে বলে বিশ্বাস হয় না। যুদ্ধের বাজারে কষ্ট করেও সে আই-এ পড়তে গেল জেলা-শহরে।

স্বদীর্ঘ দুটি বছর গেল। বড়ই দুঃখের দুটি বছর। কিন্তু সে সকল দুঃখ ভুলে গেল যখন সে জানতে পারল আই-এ পরীক্ষায় সে পাস করেছে।

এই বছরে হরেনও বহুদূর এগিয়ে গেছে। সম্প্রতি তার চিঠি এসেছে, যুদ্ধের কাজে খুব বড় একটা কনট্রাক্টের কাজের ভার সে পেয়েছে। জানাতে ভোলেনি যে এই সৌভাগ্য সহজে কেউ পায় না, কিন্তু সাহেববা তাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে না বলে তাকেই এত বড় দায়িত্বের কাজটি দিয়েছে। শুধু চিঠি নয়, হাজারখানেক টাকাও পাঠিয়েছে সে বাবার নামে। এই টাকায় বাড়িঘানা নতুন করে ফেল, আরও টাকা যা দরকার জানালেই পাঠাব।

এতবড় খবর এ গ্রামে ইতিপূর্বে আর আসেনি। এক হাজার টাকার ইনিশিওর করা চিঠিও এ গ্রামের ডাকঘরে অভূতপূর্ব। ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল এই ঘটনায়। এই উত্তেজনার ঘূর্ণিপাকে নগেনের আই-এ পাসের কৃতিত্ব কোথায় তুলিয়ে গেল! এই উপলক্ষে নকুলেশ্বর সামান্য কিছু উৎসবের আয়োজন করে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু তারা খাওয়া উপলক্ষ করে সর্বক্ষণ হরেনের গুণগানেই কাটিয়ে দিল। হরেন কনট্রাক্টের কাজ শেষ করলে কি ভাবে গ্রামের চেহারা ফিরিয়ে দেবে, এবং কি কি করলে গ্রাম শহর হয়ে উঠবে তারও পরিকল্পনা তারা মুখে মুখে তৈরি করে ফেলল নকুলেশ্বরের বাড়িতে খেতে খেতে। বলা বাহুল্য নগেন সম্পর্কে তারা একটি কথাও বলল না।

দাস-পরিবারে কেউ আই-এ পাস করে নি এটা মস্তবড় ঘটনা, কিন্তু দাসবংশে কেউ সাহেবের কৃপালাভ করে নি সেই ঘটনাই আজ সবচেয়ে বড় হয়ে উঠল। ব্যর্থ হল নগেনের আই-এ পাস করা।

এই আঘাত প্রচণ্ড বেগে নগেনের মনে এক ধাক্কা মারল। সে হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। শপথ করল মনে মনে এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

দিনের পর দিন চলে যায়। যুদ্ধ খেমে গেছে, লোকে সাময়িকভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে, কিন্তু নগেনের মন ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। ভাগ্যদেবতা তাকে কোন্ পথে টানছে তা সে জানে না, কিন্তু এক অদৃশ্য প্রবল টান সে অনুভব করছে দিনের পর দিন।

ইতিমধ্যে হরেনের অলৌকিক সব কীর্তি কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হরেন নাকি লাখ-লাখ টাকা জমিয়ে ফেলেছে, মোটর গাড়ি কিনেছে, বাড়িও নাকি কিনেছে কলকাতা শহরে।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। যুদ্ধের বাজারে টাকা লুটে নেবার যে সুযোগ পাওয়া গেছে তা এবারে কোনো চতুর লোকেরই হাতছাড়া হয়নি। কত ফ'ড়ে এই সুযোগে বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। ধূর্ত হরেনের পক্ষে লাখ-লাখ টাকা করা কিছুমাত্র অসম্ভব ঘটনা নয়।

বিশ্বস্তরের কোঠাবাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। তাকে কিছুই ভাবতে হয়নি; চক্রবর্তী, দত্ত, সরকার—সবাই মিলে বাড়ি তৈরির সমস্ত ব্যয়টা স্বতঃপ্রসূত হয়ে ঘাড়ে নিয়ে বিশ্বস্তরকে উদ্ধার ক'রে দিয়েছে। রাজপুত্রের বাবা হয়ে নিজেকে এসব তদারক করা শোভা পায় না, এ কথা শুনা বিশ্বস্তরকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে, এবং এই নিঃস্বার্থ পাঁচহাজার টাকার কাজে তিন মুক্খি মাত্র হাজারখানেক টাকা 'গায়েব' করতে পেরেছে, তার বেশি কিছু তারা লোভও করে নি, নেয়ও নি।

নগেনের বাড়িতেও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তার বাবা আর বেঁচে নেই। হঠাৎ কলেরার আক্রমণ হয়েছিল। নগেনকে দু'একজন সাহায্য দিতে এসেছিল। চক্রবর্তী দুঃখ ক'রে বলেছিল, "হরেন যখন গায়ের উন্নতির ভার নেবে তখন গায়ে আর কলেরা হবে না। আহা, নকুলেশ্বর সে কটা দিন যদি বেঁচে যেত!"

বাড়ি তৈরির খবর পেয়ে হরেন আরও টাকা পাঠিয়ে আদেশ করেছে, সীমার ঘাট থেকে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা ভাল ক'রে তৈরি করিয়ে রাখতে, মাসখানেক পরেই সে একদিন দেশে যাবে।

রাজপুত্র দেশে আসবে, এ খবর গ্রামের মধ্যে একটা শিহরণ জাগিয়ে তুলল। চক্রবর্তী সবুগে এগিয়ে এলো রাস্তা তৈরির জন্ত। হাজার টাকার ব্যয়। চক্রবর্তী তার প্রাপ্য অর্ধেক অংশটা উজ্জল ক'রে দেখতে লাগল কলনার চোখে। কিন্তু হল না। দত্ত এবং সরকারকে বাদ দেওয়া গেল না, কাজেই

রাস্তা বতটা ভাল হতে পারত, ততটা ভাল হল না। যেটুকু হল সেও ওদের পিতৃপুরুষের পরম সৌভাগ্যবশত ক'দিনের বৃষ্টিতে ধুয়ে পড়ায় মিশে গেল।

হায় হায় করতে লাগল সবাই। চক্রবর্তী দত্ত দু-দফায় দুঃখ পেল। প্রথমত, রাস্তা ভেঙে গেল; দ্বিতীয়ত, গেলই যদি তা হ'লে সেই রাস্তার জন্তে সাড়ে তিন শ টাকা খরচ করল কেন? শ'খানেক টাকার উপর দিয়েই যেত। এদিকে হাতেও থাকত তিনভাগে তিনশ টাকা ক'রে।

গতস্ব শোচনা নাস্তি—চক্রবর্তী পরবর্তী চালের জন্ত প্রস্তুত হতে লাগল। সে সংস্কৃত বই খুলে ভাল ভাল আশীর্বচন মুখস্থ করতে লাগল প্রাণপণে, হরেন এলেই সেগুলো তার মাথায় বর্ষণ করবে, এবং তারই জ্বোরে নিজের একপাল অপদার্থ ছেলেকে মানুষ করবার জন্ত তার হাতে সমর্পণ করবে।

দত্তও বসে নেই। সে তোরণ তৈরির কাজে লাগল। সরকার শোভাযাত্রার বন্দোবস্ত করল। হরেনের মতো সুসস্তান যে স্কুলে মানুষ হয়েছে সে স্কুলও চুপ ক'রে রইল না, তারাও হরেনকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করবে বলে প্রস্তুত হল। পাবনা শহরে গিয়ে স্কুলের অভাব অভিযোগের তালিকা সহ রিপোর্ট এবং অভিনন্দনপত্র ছেপে আনল। আশা ক'রে রইল হাজার পাঁচেক টাকা আদায় করা যাবেই। স্কুলের নাম হরেন্দ্র হাই স্কুল দেওয়া হবে এই বকম একটা প্রস্তাব করবেন হেডমাষ্টার, কিন্তু সে কথা আর কাউকে জানালেন না।

কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। কে জানত হরেন এক মোটর গাড়ি সঙ্গে নিয়ে আসবে? সে আগে পাবনা এসেছিল একটা জরুরি কাজে, অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে সেজন্য ছোট একখানা গাড়ি সঙ্গেই রেখেছিল। তা ছাড়া গ্রামে এসে মোটরে ক'রেই বাড়িতে পৌঁছবে এ কল্পনাও ছিল। কিন্তু স্ট্রীমার থেকে নেমে পথের অবস্থা দেখে সে তো আগুন। এত টাকা খরচ ক'রে এই পথ। থীফ্—সবাই থীফ্। চক্রবর্তী কাঁপতে লাগল, তার আশীর্বচন সব ভুল হয়ে গেল। সরকার এবং দত্ত কোনো রকমে বাকী অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত পান্ধী এনে হরেনকে বাড়িতে তুলল। হরেন হেঁটেই যাবে বলে উচ্চত হয়েছিল, কিন্তু তার পথরোধ ক'রে তাকে এত বড় হীন কাজ থেকে সবাই বাঁচিয়ে দিল।

হরেন রাজা হয়ে ফিরেছে এই খবরটাই গ্রামের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তার মোটর গাড়ির খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকের গ্রামে। যুদ্ধের কৃপায় গাঁয়ের লোকেরা এয়ারোপ্লেন দেখেছে, কিন্তু মোটরকার আজ পর্যন্ত

দেখেনি। হরেন গিড়ে বাড়িতে উঠল, কিন্তু হাজার হাজার নবনারী পদ্মানদীর ধারে এনে জ্বল মোটরগাড়ি কেমন দেখতে।

হরেন বাড়ি থেকে কোথাও বেরোল না। প্রথম থেকেই তার মেজাজ বিগড়ে গেছে। তারপর বাড়ির চেহারা দেখেই বুঝতে পারল বাড়ির কন্ট্রাক্টে কত টাকা চুরি হয়েছে। সে নিজেও কন্ট্রাক্টের কাজ করে, 'মাসতুতো ভাই'দের পরিচয় তার কাছে আর অজানা থাকবার কথা নয়। হরেন গুম্ব হয়ে রইল। তার কাছে কেউ যেতে সাহস করল না, সবাই তার গাড়ি দেখতে ঝুঁকে পড়ল। আশেপাশের সমস্ত গ্রামে একটা বিপ্লব বেধে গেল। দৈনন্দিন বাজার ঠিকমত বলল না, কারো বাড়িতেই যথাসময়ে উঠন জ্বলল না।

কিন্তু এই মহা উত্তেজনা আর হেঁচ-এর ভিতর নগেনের স্থান কোথায়? হরেন তাব কথা একবার জিজ্ঞাসাও করল না। এটা অবশ্য সে আশা করেনি—কিন্তু আজ তার মনটা অত্যন্ত বিগল হয়ে পড়ল। যে দু-একজন বন্ধু লোক ছিল তারাও আজ সমস্ত দিন তার কাছে এলো না, তারাও মোটর গাড়ির উত্তেজনায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে! এই দুঃখটা তার বড্ড বেশি বেছে উঠল মনে। মনে যেন বেদনার ঝড় বয়ে চলেছে। তাব বাবার কথা মনে এলো। তার নিচু মাথা নিচু হয়েই ছিল চিরদিন—তার মায়ের মক বেদনারই বা কোন্ সান্ত্বনা দিতে পারল সে?

কোনো দিকেই তার কোনো জোর ছিল না, কিন্তু জেদ ছিল। এই জেদের বশেই সে আই-এ পাস ক'রে বি-এ পড়তে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু আজ তার মনে হল তার জীবনের গতি চিরদিনের জন্ম স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় সে পড়ে থাকবে না কোনো মতেই। চারদিকের নির্মম ঘা খেয়ে খেয়ে তাব কঠিন জেদ কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগল।

মোটর গাড়ির জন্ম তার এই অপমান? .

আচ্ছা...তাই হোক ..

নগেন অস্পষ্ট স্বরে আপন মনেই এক অভাবনীয় শপথ ক'রে বলল। গ্রাম্য আবহাওয়ায় ছোটলোকদের মধ্যে বর্ধিত নগেন এই সব তুচ্ছ মান অভিমানের উপর দিয়ে আজ আর উঠতে পারল না।

বিছানা থেকেও মাসখানেকের মধ্যে প্রায় আর উঠল না। মাসখানেক পরে তাকে দেখা গেল পাশের গ্রামের এক জোতদারের বাড়িতে যেতে।

ক'দিন ধরে পর পর সেখানে গেল। কিন্তু তার কল ঘা হল তা আত্ম-হত্যারই নামান্তর

গাঁয়ের লোকেরা যদিও হরেনের কাছ থেকে বিশেষ কিছু আর আশা করছে না, এবং তাকে ঘুষু ছেলে বলে অভিহিত করেছে, তবু তারা আজও নগেনের প্রতি প্রসন্ন হতে পারল না। তারা তবু বলতে লাগল, “নগেনের মতো হিংস্রটে তারা আর দেখেনি—এই হিংস্র তার মাথা খারাপ হয়েছে।”

কিন্তু কথাটা তারা মিথ্যা বলেনি। নইলে এমন সম্পত্তি কেউ এত শস্তায় বিক্রি করে? এমন মাটি কেউ মাটির দরে বিক্রি করে? একশ বিঘে খামার জমি মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকায়? কেন, হরেনের কাছে চাইলে এই টাকাটা সে অমনি দিতে পারত না? হাজার হলেও ভাই তো?

নগেন বিষাক্ত হাসি হাসল এ সব শুনে।

চক্রবর্তী একদিন এসে বড়ই দরদেব সঙ্গে বলল, “নির্বংশে হতচ্ছাড়া, আমাকে একবার জানালি নে?”

চক্রবর্তীর দিকে নগেন অগ্রিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

চক্রবর্তীকে না জানানো তার নিতাস্তই অপবাদ—জানালে সে নিজে কিনতে পারত। হাতে তাব কিছু কাঁচা টাকা এসেছে সম্প্রতি।

কিন্তু নগেন এক মুহূর্তে সকল বন্ধন ছিন্ন ক’রে জীবনে আজ এই প্রথম নিভীক ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াল মুক্ত আকাশের নিচে। আজ কারো জগু তার কোনো ভয় নেই, লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, এতদিন সে পড়ে পড়ে বিনা প্রতিবাদে অসহায়ের মতো মার খেয়েছে, কিন্তু আজ সে মারবার জগু প্রস্তুত। তার মনের বন্ধন যে মুহূর্তে খুলে গেছে, সেই মুহূর্তে সে সম্পূর্ণ নতুন এক শক্তি অনুভব করেছে নিজের মধ্যে। এই শক্তি অদম্য, দুর্বার। এ তাকে কোন্ পথে টানবে তা সে জানে না। এরই অতি প্রবল আকর্ষণে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল অজানা অন্ধকার জগতে।

কলকাতা শহর। নগেন ছুটে চলেছে মোটরে। আজ সে গাড়ির মালিক! মোটর গাড়ি হলে কৌলিগু হয়, না? তার মনে পৈশাচিক আনন্দ। এই গাড়ি নিয়ে সে গ্রামে ফিরবে। কিন্তু তার আগে হরেনের কাছে তার কৌলিগু প্রমাণ ক’রে যাবে। আজ এক মুহূর্তের জগুও সে হরেনের সমপদস্থ হবে এই কল্পনা তাকে উন্মাদ ক’রে তুলেছে। হরেন চমকে যাবে তাকে মোটরে দেখে! তাকে খাতির করতে এগিয়ে আসবে। মর্খ, টাকার মর্খাদা ভিন্ন আর কোনো মর্খাদা সে বোঝে না।

নগেনের মন ক্রমশ হিংস্র হয়ে ওঠে।

ড্রাইভারকে বলে, “আরও জোরে চালাও, আরও জোরে।” “কত দূর পথ ? পথ যে ফুরায় না ?”

অধৈর্ষে সে ছটকট করতে থাকে।

ঠিকানা সে ড্রাইভারকে দিয়ে দিয়েছে। সে ঠিক পথেই নিষে চলেছে গাড়ি।  
যহু ছুটন্ত গাড়ির সংঘর্ষ বাঁচিয়ে বে-আইনী গতিতে ছুটে চলেছে সে।  
এরই জন্ত সে যে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ বাঁজ রেখেছে।

আর কত দূর ?...

গাড়ি চোরগাঁ ছাড়িয়ে, কালীঘাট ছাড়িয়ে, টালিগঞ্জই এসে পড়ল।  
গাড়ির বেগ কমল। ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট নম্বরের কাছে এলো, আরও ধীরে প্রবেশ  
করল ফটকের মধ্যে।

ভিতরে প্রশস্ত মাঠ...ভুল হল না তো ?...এখানে এয়ারোপ্লেন কেন ?—  
নগেনের জকৃষ্ণিত হল।

গাড়ি বিধাগ্রস্তভাবে এগিয়ে চলল।

এয়ারোপ্লেনখানা তখনি রওনা হচ্ছে। কিন্তু এ যে ছুটে আসছে তাদেরই  
দিকে ! মাটি থেকে একটু উঁচু হল, আরও উপরে উঠল ! প্রোপেলারের  
আঁশায়ে কান ফেটে যাচ্ছে। মুহূর্তে এয়ারোপ্লেনখানা নেী—ক’রে তার গাড়ির  
প্রায় পনেরো হাত উপর দিয়ে কামানের গোলার মতো ছুটে উপরে উঠে গেল।

কোথায় এলো সে ?

গাড়িসুদ্ধ এগিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, “হরেন কোথায় ?”

সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র জনতার মধ্য থেকে একজন আকাশের দিকে চেয়েই বলল,  
“ঐ যে উপরে !”

আর একজন উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, “দেখ দেখ এরই মধ্যে কত উপরে  
উঠে গেল, দেখ।”

নগেন টলতে টলতে গাড়ি থেকে নেমে আকাশের দিকে চাইল। কিন্তু  
কোথায় এয়ারোপ্লেন ?...সমস্ত আকাশ এত অন্ধকার কেন ?...পায়ের নিচে  
থেকে পৃথিবী সরে যাচ্ছে কেন ?...

সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত পৃথিবী ধোঁয়াটে ছিল—পৃথিবী কি আবার সেই অবস্থায়  
ফিরে গেল ?...

‘কত উপরে উঠে গেল’ এই শব্দটি শুধু সহস্র সৃষ্টির মতো তার মর্মে বিঁধতে  
লাগল—চারদিকে আর কোনো শব্দ নেই, কোনো দৃশ্য নেই।

—‘ফিরে চল’ কথাটি শুধু উচ্চারণ করার মতো চেতনা তার তখনও  
অবশিষ্ট ছিল।



## ফেল

অক্ষয়কুমার গত ছবছরের মতো এবারেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে পিতাকে বলল, “বাবা, আমি ফেল করেছি।”

পিতা অক্ষয়কুমার শুনে গভীরভাবে শুধু বললেন, “হঁ।”

অরূপ কিছুক্ষণ লজ্জিত ভাবে মাথা নিচু ক'রে রইল; তারপর ধীরে ধীরে মূখ তুলে কিছু বলতে গেল, কিন্তু বলা হল না। সে দেখতে পেল তার পিতার মুখখানা চার্লি চ্যাপলিনের মতো বেদনাক্রান্ত। সে সরে পড়ল।

সন্ধ্যাবেলা আবার পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ। অরূপের সলজ্জ ভাবটা কেটে গেছে। সে সহজেই পিতাকে বলল, “আমাকে আব পড়তে বলবেন না, আমি এখন কিছুকাল বাইরে একটু ঘুরে বেড়াতে চাই। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতেই ভবিষ্যৎটা চিন্তা ক'রে নেব।”

অক্ষয়কুমার আপন মনেই যেন বলতে লাগলেন, “কলকাতার পথে পথে এত হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষের জগৎ এত ভিখারীর মৃত্যু, তার মধ্যে যে পড়তে পার নি সে তো বুঝতেই পারছি।”

অরূপ যেন সে কথার প্রতিবাদ ক'রে বলল, “মনের দুর্ভিক্ষ আরও কঠিন, বাবা।”

“সে আবার কি?”—অক্ষয়কুমার চমকিত হলেন। কথাটা তাঁর ভাল লাগল না।

অরূপ বলল, “মনের দুর্ভিক্ষে আত্মার মৃত্যু।”—বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

অক্ষয়কুমার গভীরতর চিন্তাক্রিষ্ট হয়ে ঘরে গিয়ে বসে পড়লেন। অরূপের মনে হল যেন বিমর্ষ বাস্টার কীটন সামনে থেকে সরে গেল।

অরূপকুমার যে-পথে পা বাড়িয়েছে সে-পথ পরীক্ষা পাসের পথ নয়। কিন্তু সে কথা সে পিতাকে কেমন ক'রে বলে?—কলকাতার সেই সর্বগ্রামী স্মৃতি! উঃ, দেশভ্রমণ করলেই কি তা যাবে। তবু সে চেষ্টা করবে।

কলকাতা শহর তার নিয়ন্ত্রিত আলোকের রহস্যময় পথে তাকে যে টেনে বের ক'রে আনে প্রতিদিন। তারপর সে গিয়ে পৌছয় সম্পূর্ণ এক অন্ধকার আবেষ্টনে। সেইখানে তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক বিচিত্র আনন্দময় জগৎ। সেখানে স্বর্গীয় সঙ্গীত, সেখানে সুখদুঃখ হাসিকান্নায় রচিত মহামানবের বিশ্বয়কর সংসার—সেখানে মাহুষের হৃদয়ের আবেগময় অহুভূতি তার হৃদয়ে অপূর্ব স্পন্দন জাগিয়ে তোলে।

এই বহুস্তর জগতের সঙ্গে অরূপের সমস্ত রক্তকণিকা আত্মীয়তা গড়ে তুলেছে, এ থেকে দূরে পালাবার তার উপায় নেই।

দেশ ভ্রমণ ?

মুখে বলল বটে, কিন্তু তার সমস্ত সত্তা ভিতরে ভিতরে একথার প্রতিবাদ করতে লাগল। যাকে সে হৃদয় সমর্পণ করেছে তার স্মৃতি মন থেকে মুছে যাবে না, যেতে পারে না।

“আপনি যদি দুঃখ পান, তাহ’লে আমি আবার কলকাতাতেই ফিরে যাব।” একটু পরেই অরূপ তার পিতাকে গিয়ে বলল।

রিটায়া-করা অক্ষয়কুমার মধুপুরের তাঁর নবনির্মিত কুটীরে বসে পুত্রের এই কথায় অনেকখানি তৃপ্তিলাভ কবলেন।...কিন্তু মনের দুঃখ। তার মানে কি ? —কথাটা তাঁর মনের কোণে একটু তিল পরিমাণ স্থান অবিকার ক’রে রইল।

কলকাতা শহরে অরূপকুমার সে কোন্ আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে ? সে আকর্ষণ সিনেমার। কলেজে পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে সে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় গেছে। প্রথমে সপ্তাহে একদিন, তার পব দুদিন, তারপব প্রত্যহ এবং এক। সিনেমা তাকে গ্রাস করেছে।

সিনেমাগল্পের নায়ক নায়িকা তার পরম আত্মীয়। তাদের হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত তার হৃদয় আলোড়িত করে। জীবনের বহু স্বপ্ন সিনেমার ভিতর দিয়ে সে সফল হতে দেখে। সিনেমার অভিনয় তার মনে নতুন স্বপ্ন জাগায়। অভিনয় লোকের কেন ভাল লাগে, আর্টের আবেদন কোথায় সার্থক, এ সব বিষয় পাঠ্য পুস্তকে পড়তে গিয়ে সে চমকিত হয়েছে। তাতে সে পেয়েছে নিজেরই সমর্থন। যা ছিল বিশ্লেষণমাত্র, তাই তাকে আরও বেশি ক’রে প্রেরণা জুগিয়েছে। অভিনয়-শিল্পের প্রতি তার আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে।

মানুষের জীবনে যে সব সুখদুঃখের খেলা সে অভিনয়ের ভিতর দেখতে পায়, নিজের জীবনের সঙ্গে তা মুখ্যভাবে জড়িত নয়। সেখানে যে মর্গভেদী দুঃখের দৃশ্য দেখে, তাতে তার চোখে জল আসে, কিন্তু তবু তার সঙ্গে সে নিজে সম্পর্কিত নয়। যে হত্যাকাণ্ড এবং অপরাধমূলক অগ্ন্যাগ্নি নিষ্ঠুরতার বীভৎসতা তাকে আহত করে, তা থেকে তাকে দূরে পালিয়ে যেতে হয় না। আফ্রিকার ঝঁকলের ভীষণ-দর্শন হিংস্র সিংহের সম্মুখে সে অবলীলাক্রমে বসে থাকতে পারে। নরখাদকদের পল্লীতে, আগুণ জ্বলে, যখন তারা কোনো শিকার করা মানুষকে পুড়িয়ে খাবার আগে উৎসব করে, তার মধ্যে বসে থাকতেও তার ভয় হবে না।

জীবনের সমস্ত স্ত্রী এবং কুশী প্রকাশ একই জায়গায় বসে এমন নিশ্চিত মনে দেখার মোহ থেকে সে নিস্তার পাবে কিসে? সিনেমা দেখতে দেখতে সে নিজেকে কখনও প্রেমিক, কখনও অত্যাচারী বর্বর, কখনও হিংস্র বাঘ, কখনও সিংহের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে।

অরুপের কাছে প্রথমে শিল্পের আকর্ষণই ছিল প্রধান, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শিল্পীরা এসে তার মন অধিকার করল। হালউডের সব শিল্পী। তারা তার সমস্ত সত্বাকে নাড়া দিতে লাগল। সে ফিল্মফিতে মন দিতে পারে না, ইকর্নাম্বলে মন দিতে পারে না। শেফালীয়ার পডতে গেলে আরও বিপদ। প্রত্যেকটি নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দবেদনামিশ্রিত স্মৃতি ছেগে ওঠে তার মনে। রোমিও জুলিয়েট পডতে নরমা শিয়ারার, টোমং অব দি স্র পডতে মেরি পিকবোর্ড। লক্ষ্য পথে পা বাড়াতে প্রতি পদে এক একটি ফুল ফুটে ওঠে, ফুলের শোভায় গন্ধে মন মেতে ওঠে, লক্ষ্যের কথা ভুলে যায়।

আচ্ছা, ফেল করার মূলে কি এই সিনেমা? কিন্তু ফেল করার দামেই তো সে জীবনের সাধকতা বিনেছে। ফেল করা কি লজ্জাবর? তা যদি হয় তা হ'লে সিনেমা তাব কারণ নয়। আর যদি সিনেমাই ফেল করার কারণ হয় তা হ'লে সে বেন অন্য জন্ম ফেল করে।

কিন্তু আবার সে পরীক্ষা দিতে রাজি হ'ল কেন? তাব বিজ্ঞা যেখানে এসে থেমেছে সেইখানেই যে তার সীমা এ কথায় তার সন্দেহ নেই। সে ভাল করেই জানে, সে বিজ্ঞায় বিশ্ববিজ্ঞার আলয়ে বার বার মাথা খুঁড়লেও ডিপ্লোমা নামক পাচমেণ্টের কাগজগানা তার ভাগ্যে জুটবে না।

কিন্তু তবু অন্তরের আকর্ষণকে সে এড়াতে পারল না। এবারেও সে পরীক্ষা দিতে রাজি হ'ল। বুদ্ধিমান পুত্রের বুদ্ধিতে ত্বন ধরল কেন সে খবর পিতা জানতে পারলেন না। তিনি অগাস্ত স্নেহশীল বনেই কোনো সন্দেহ তার মনে জাগেনি। তবে ছবাব ফেল করাতে পুত্রের উপর বিরক্ত না হয়ে তিনি পারেননি। চটেও গেছেন মাঝে মাঝে, কিন্তু প্রকাশে নয় মনে মনে। সে সময় মনের পা থেকেই অদৃশ্য জুতো বেরিয়ে অতি গোপনে পুত্রের পিঠে গিয়ে পড়েছে।

সেই দিনই রাতে শুয়ে শুয়ে অক্ষয়কুমারের মনে একটি কথা হঠাৎ খোঁচা দিল। অরুপ তৃতীয় বার পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাবে বাইরে ঘুরে বেড়াতে চায় কেন? তার মনে কিসের দুর্ভিক্ষ?

এ কথার অর্থ কি?

এর ভিতর কি কোন ইঙ্গিত নেই ?

সে কি মর্মান্বিত ভাবে এই কথাই বোঝাতে চায়নি যে সংসারে আর তার মন নেই ? কিংবা ঘরে ?

অর্থাৎ সে কি... অক্ষয়কুমার চকিতে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন ।

চিন্তার আভাস মাত্রে তাঁর সমস্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে এসে জমা হওয়ার্তে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, তাই উঠে বসে চিন্তাটি সমাপ্ত করলেন... সন্ন্যাসী হতে চায় ?

গভীর রাতে অক্ষয়কুমারের চোখে আর এক অন্ধকার নেমে এলো । তিনি হঠাৎ কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়লেন ।

তিল পরিমাণ সন্দেহটা ক্রমেই তাঁর মনে তাল পরিমাণ রূপ নিতে লাগল ।

তিনি দেখতে পেলেন পুত্র জটাজুটধারী হয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

উপায় কি ?

একই মাত্র উপায় আছে ; তাকে সন্ন্যাস থেকে ভ্রষ্ট করতে হবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের পরের ধাপই যদি হয় বিশ্বভূদন, তবে তাকে সেই বিপজ্জনক পদপাত থেকে বাঁচাতে হবে ।

অক্ষয়কুমার নিজে বিপত্তীক । ভেবেছিলেন পুত্র কুতী হওয়ার আগে গৃহের শৃঙ্খলা তিনি যেমন ক'রেই হোক সস্থ করবেন । কিন্তু তা আর হল না ।

পাত্রী এক রকম ঠিকই ছিল । অক্ষয়কুমারের এক বন্ধুর কন্যা । তার প্রতিই তাঁর লক্ষ্য ছিল । মেয়েটি ম্যাট্রিক পাস, বড় সুশ্রী, বড় সরল ।

মেয়ের দিক থেকেই এতদিন প্রস্তাব চলছিল, অক্ষয়কুমার বরাবর বলে আসছিলেন ছেলে এম-এটা পাস করলেই আর কথা নেই । কিন্তু নাধ্য হয়ে এখন তাঁকেই প্রস্তাব করতে হল ।

কিন্তু হায়, তিনি জানতে পারলেন না, তিনি কি হারাচ্ছেন !

অরূপ স্তম্ভিত হল সব শুনে । মন তার একেবারেই প্রস্তুত নয় । কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে বুঝতে পারলে—বন্দোবস্ত এমন কঠোর ভাবে পাকা, যে এ থেকে তার নিষ্কৃতি নেই ।

চূপচাপ মাঠের ধারে বসে বসে সে কদিন মুনটাকে প্রস্তুত করতে লাগল ।

ক্রমে বিবাহিত জীবনের কল্পনাটা তার কাছে ভালই লাগল । সিনেমাত্তেও সে বিবাহদৃশ্য অনেক দেখেছে । হঠাৎ-পরিচয়ের পর প্রেমের পথে ক্রত ধাবন এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহ ।

কিন্তু... সিনেমায় প্রথম দৃশ্যই ষাদের বিয়ে হয় তারা তো স্থায়ী হয় না । তবে কি সে ভুল করবে ? না না । ভুল সে করবে না । এর মধ্যে এক

অতীতপূর্ব রোমাঞ্চ আছে। এ যেন আলো থেকে অন্ধকারে—জানা থেকে অজানায় ঝাঁপিয়ে পড়া। আর এই তো বীরের পথ—এই পথেই সে জীবন নাট্যের প্রধান ভূমিকায় নামতে পারবে।...

বিবাহের পর বরবধুর প্রথম মিলন-রাত্রি।

অরূপের হৃদয়ে পুলক, মনে উন্মাদনা।...নীহারিকা! বেশ নামটি। ওকে ডাকা যাবে, মনোহারিকা!... চোখ দুটি ঠিক গ্রেটা গার্বোর মতো। ক্রদুটো কামিয়ে সূক্ষ্ম ধনু রেখার মতো ক'রে দিলেই কুইন ক্রিষ্টিনা!

অরূপ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নীহারিকার মুখখানির দিকে।...কিন্তু কি নিয়ে আলাপ করা যায়?

সমস্তা কঠিন।...অরূপ বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। প্রথম বায়েই স্ত্রীর মনে রেখাপাত করা চাই। সাধারণ কথায় চলবে না। প্রথমেই একটা নাটকীয় ভঙ্গী চাই। সিনেমা ছবিতে দেখা সমজাতীয় দৃশ্যের কথা মনে আনার চেষ্টা করল সে। কিন্তু কাজের সময় কোনোটাই কি মনে পড়ে?...তবে কি সে স্ত্রীর কাছে হার মানবে? তার কাছে ছোট হবে?

অবশেষে মরীয়া হয়ে ডাকল, “নীহারিকা”—

নীহারিকার বুকে তখন আনন্দের ঢেউ ভেঙে পড়ছে। স্বামীর মুখের প্রথম সম্ভাষণ। তার নিজের নাম যেন একটি স্বতন্ত্র রূপ ধরে তার কানে ধ্বনিত হল।

“নীহারিকা”—

নীহারিকার মুখে কোনো কথা নেই।

আবার ডাকল, “নীহারিকা।”

নীহারিকা অশ্রুট স্বরে বলল, “কি?”

অপ্রস্তুত অরূপের মুখ থেকে ফস্ ক'রে বেরিয়ে এলো “তুমি ‘মিনচ্কা’ দেখেছ?”—অরূপ জানল না, তার বিবাহিত জীবনের ফাঁসীর ছকুম বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে।

নীহারিকা নির্বাক।

“দেখেছ? কি সুন্দর, না?”

অরূপ বুঝতে পারছে প্রথম মিলনের ঠিক সুরটি সে লাগাতে পারছে না—কিন্তু তবু যেন কোন্ এক অদৃশ্য অন্ধ শক্তি তাকে এই পথে জোর ক'রে ঠেলে দিল।

“বল, নীহারিকা !”

নীহারিকা ভীতভাবে বলল, “কি বলব ?”

“নিনচ্কা ?”

“আনি না সে কি। দেখিনি।”

নীহারিকা নিজের অজ্ঞতাজনিত মহা অপরাধে এতটুকু হয়ে গেছে।

অরূপ স্তম্ভিতভাবে দেখছে তার অজ্ঞতার পরিধি।

“গ্রেটা গার্বোকে দেখেছ ?”—স্বর এবারে দৃঢ়।

নীহারিকা কেঁদে ফেলল।

অরূপ বিছানায় অর্ধশায়িত ছিল লাফ দিয়ে উঠে বলল।

বিবাহ এত বড় ফাঁকি ?

সে আর স্থির থাকতে পারল না, সর্পাহতের মতো ঘরের মধ্যে ছটফট করতে লাগল আর আপন মনে, শূণ্য দৃষ্টিতে, বিড়বিড় ক’রে বলতে লাগল—“টু বী, অর নট টু বী”—“টু বী, অর নট টু বী—”

পরদিন অকপের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। আরও দুদিন কেটে গেল। তৃতীয় দিনে চিঠি পাওয়া গেল। “ব্যর্থ বিবাহে জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, অতএব মার্থকতার অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করলাম। বি-এ ফেল করেছি, বিয়েতেও ফেল করলাম, আমার অপরাধ মার্জনা করবেন।”

আরও কিছু দিন পরে খবর পাওয়া গেল, বোম্বাইতে কোন এক সিনেমায় নাটকের ভূমিকা নিয়ে সে বেশ জমিয়ে তুলেছে।

# ভেলকি

১

যে ঘটনা ঘটবে, আগে থাকতেই তার ছায়াপাত হয়, এই রকম একটা প্রবাদ ইংরেজদের মধ্যে চলতি আছে। কিন্তু আমরা ঘটনার ছায়াকে উক্ত ঘটনার কারণ বলে মনে করা ঠিক নয়, একটা আর একটার পূর্বে ঘটে মাত্র।

আমার কাছে কিন্তু সবই ইন্দ্রজাল বলে বোধ হয়। যেন কোনো অদৃশ্য জাদুকর আড়ালে বসে সূতো টানছেন, আর তারই টানে টানে কেউ বলছে শান্তি চাই, কেউ বলছে রক্ত চাই, কেউ আরামে বসে চা খাচ্ছে, কেউ হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করছে। অর্থাৎ সবই কার্যকারণ শৃঙ্খলে বাঁধা।

এই ভাবে দেখতে গেলে যাবতীয় ঘটনাপারস্পর্য পুঞ্জীভূত হয়ে মনকে পিষে মারতে চায়, সুতরাং তত্ত্বকথা বেশি দূরে না টেনে দৃষ্টিকে সুশীল, মাধব আর মিহিরের সঙ্কীর্ণ পরিসরে নিবদ্ধ করা যাক।

সুশীল ওকালতি পাস করেছে সম্প্রতি, মাধব এম. এ. পরীক্ষায় ফেল করেছে, মিহির গত এম-এসসি. পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণী লাভ করেছে। কিন্তু বুদ্ধিপ্রখরতায় ওদের মধ্যে মিহিরের ব্যক্তিত্বই আর সবার উপরে।

বয়স ওদের কারোই চব্বিশের বেশি নয়, সবাই অল্পবিস্তর ছিটগ্রস্ত. বিষয়-বুদ্ধির ছোঁয়াচ লাগে নি কারো মনে, মন এখনো অপরিণত, যদিও কোনো বিষয়ে আলোচনা কালে বুদ্ধি ওদের মুহূর্তের মধ্যে বেশ সজাগ হয়ে ওঠে। বহু জনের মতে যে সিনেমা ছবিটি সবচেয়ে নিরুপ্ত, টিকিট কিনে সেইটি দেখতে যায় ওরা আমোদ বেশি পাওয়া যাবে বলে, তা নিয়ে হাসা যাবে বলে। বাজার থেকে নিরুপ্ত বই বেছে বেছে কেনে, আলোচনা এবং উত্তেজনার বিষয়বস্তু পাওয়া যাবে বলে। রেডিও খুলে চীনদেশীয় সঙ্গীত শোনে প্রতিবেশীকে বিভ্রান্ত করবে বলে। প্রবীণেরা বলেন, ওরা বালকই রয়ে গেল, সাবালক হল না।

সন্ধ্যাবেলা। সুশীল বন্ধুদের আগমন অপেক্ষায় তার বৈঠকখানা ঘরটিতে বসে 'লিসেনার' সম্পাদক রিচার্ড ল্যান্ডার্টের লেখা বি. বি. সি.র. আভ্যন্তরীণ অবস্থা সংক্রান্ত একখানা বই পড়ছিল। তার এক জায়গায় ইণ্ডিয়ান রোপ ট্রিক বা ভারতীয় দড়ির খেলার কথা বেশ বিস্তারিত ক'রে লেখা আছে। সেই জায়গাটা সে বেশ তদগতচিত্ত হয়ে পড়ছিল।

২

এমন সময় মাধব এসে হাজির। সুশীল তাকে পেয়ে যেন একটা বিরাট নৈরাশ্রের হাত থেকে বেঁচে গেল।

“আচ্ছা বলতে পার লোকে ম্যাজিক দেখে অবাক হয় কেন?”

মাধব তার অভ্যস্ত আসনখানি দখল ক’রে বলল এবং বলল, “লোকে একটু আমোদ উপভোগ করতে চায়, তা যে কোনো উপলক্ষেই হোক না, আপত্তি কি? তা কি বই পড়ছিলে?”

“বইখানা ম্যাজিক সংক্রান্ত নয়”—বলে সে তার ভিতরকার ঐ অধ্যায়টি মাধবকে পড়ে শোনাল, এবং বলল, “ম্যাজিকের কৌশলটা তো একটা ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়। হাতের মুঠোয় একটা টাকা ছিল, মুঠো খুলে দেখা গেল টাকাটি নেই—এতে অবাক হবার কি আছে? যদি জানা থাকে টাকাটা থাকবে না, আর সবাই যদি সেটা আগেই ভেবে নেয়, তা হ’লে আমোদটা কোথায়?”

মাধব হেসে বলল, “আগে ভাববে কেন? যাতে না ভাবতে পারে জাদুকর সেই চেষ্টাই তো করে।”

এমন সময় উক্ত বন্ধমকে মিহিরের আবির্ভাব ঘটল, আর সঙ্গে সঙ্গে দু’জনেরই চোখ আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু’জনের দ্বন্দ্ব তৃতীয় ব্যক্তির দেখা মিললে দু’জনেই মনে করে তাকে নিজের দিকে টেনে যুক্তির জোর বাডানো যাবে।

মিহির একটু বিশ্বয়ের সঙ্গে তাদের দিকে চেয়ে বলল, “সামনে বই খোলা এবং দু’জনেই সীওয়িস, ব্যাপার কি?”

সুশীল বলল, “জাদুবিদ্যা। বলছিলাম ম্যাজিক জিনিসটা আদিম প্রকৃতিকে তুষ্ট করে। যখন লোকে প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাতেই অলৌকিকত্ব খুঁজত সেই সময়ের মন এখনও ঘাদের মধ্যে আছে তারাই ভেলকিতে ভোলে।”

মিহির বলল, “একটু চা খাওয়াবে?”

সুশীল ব্যস্তসমস্তভাবে উঠে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা ক’রে এলো।

“ভাগ্যিস আদিম লোকেরা চা খেত না, নইলে হয়তো শুনতে হত এটাও আদিম অতএব এতে আনন্দ নেই।” বলে মিহির হাসতে লাগল।

মাধব বলল, “আদিম বল, এডাম বল, বা আদমি বল, এড়াবার উপায় নেই, কারণ আমরা সবাই আদিম—একেবারে আদিম আদমি।”

সুশীল বলল, “আমরা আদমি নই, মানুষ।”

মিহির বলল, “তুমি একটা অমানুষ।”

সুশীল বলল, “মানুষ বলেই চট ক’রে অমানুষ হতে পারি, কিন্তু আদমি তা পারে না, অনাদমি হওয়া কঠিন।”



“কিন্তু তোমার জাদুবিজ্ঞান কখন বল—বৈঠকখানা ঘরকে জাদুঘরে পরিণত করলে কেন দেখা যাক।”

স্বশীল বলল, “আমার মতে ভেলকি জিনিসটি হাত দাফাইয়ের ব্যাপার, ওটা আর্টের পর্যায়ে পড়ে না। ওতে পরিণত মন ভোলে না, ছোটদের মন ভোলে, এই কথাটাই মাধবকে বোঝাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ওকে ভোলাতে পারছি না, এখন তোমার মতটা জানতে পারলেই একটা মীমাংসা হয়ে যায়।”

মিহির বলল, “চিন্তাশক্তিকে পোলারাইজ ক’রে বসে আছ দেখছি। চারদিকে ছড়ানো আলোকবশ্বিকে নিয়ন্ত্রিত ক’রে এমন করা যায় যাতে তা শুধু নিয়ন্ত্রকের খুশীমতো এক দিকে ছড়াবে। চিন্তাকেও সেই রকম নিয়ন্ত্রণ করার দরকার মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু তর্কের সময় নয়। তর্কের সময় বিষয়বস্তুর চারদিকে চিন্তাটাকে বিকিরণ কর, দেখবে তুমি যা দেখছ তার চেয়ে আরও বেশি দেখা যায়।”

স্বশীল কিঞ্চিৎ অসহায়ের মতো মিহিরের দিকে চেয়ে বলল, “বুঝলাম না কথাটা।”

“না বোঝার কিছু নেই, সোজা কথা। অর্থাৎ যা কিছুতে মন ভোলে তা সবই জাদু। ভিতরের কৌশলটা জানলেই কি তার মাধু্য কমে? তোমার এই আদমিকেও তো বৈজ্ঞানিক-আদমি টুকরো টুকরো ক’রে দেখেছে, সবই কতকগুলো রাসায়নিকের যোগাযোগ। জাদুকরের জাদু ফাঁস হয়ে গেছে অনেক কাল, কিন্তু—কি বল মাধব—মাহুঘের রহস্য কিছু কমেছে কি?”

মাধব কিছু রোমাণ্টিক ধর্মী, সে ইতিমধ্যেই তার কোনো প্রিয়জনকে কল্পনার চোখে রহস্যাবৃত ক’রে দেখতে শুরু করেছিল, মিহিরের প্রশ্নে চমকে উঠে বলল, “আমিও তো তাই বলি—নইলে তোমার দা ভিকি, মিশেল-আজ, রাফায়েল এত পূজা পেতেন কি ক’রে?”

মিহির বলল, “তারা তো তুলিতে এঁকেছেন মাহুঘকে, আমরা মনে মনে এঁকে চলেছি সর্বক্ষণ।”

মাধব চমকে উঠে ভাবল, টের পেয়েছে না কি মিহির তার মনের কথা?

মিহির বলতে লাগল, “আসল কথা কি জান? এই যে তোমার টেবিলে—কি বইখানা পড়ে আছে—এ-রি-য়ে-ল অ্যা-ও হি-জ কো-য়া-লি-টি। কি বিষয়ের বই এটা?—এর প্রথমেই দেখছি টেম্পেস্ট থেকে উদ্ধৃতি—

“All hail, Great Master, grave Sir, hail : I come  
To answer thy best pleasure”...

আশ্চর্য নয় কি এই এরিয়েল? এই টেম্পেস্ট নাটক? শেক্সপীয়ার কি জাদুকর  
নন? যে শব্দগুলো ব্যবহার করে তিনি তাঁর নাট্যজগৎ সৃষ্টি করে গেছেন  
সে শব্দগুলো কি অভিধানে মেলে না? সেগুলো তুমি সাজাও না নিজের  
ইচ্ছামতো—হও না দ্বিতীয় শেক্সপীয়ার? বাংলা শব্দকোষ নিয়ে বসে, হও না  
দ্বিতীয় রবি ঠাকুর?”

সুশীল বলল, “তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ—কোথায় ম্যাজিক আর কোথায়  
সাহিত্য!”

মিহির সজাগত চায়ের দিকে চেয়ে বলল, “দাঁড়াও আগে চা খেয়ে নি।”

চা খাওয়ার পরে মিহির এমন এক বক্তৃতা দিল যাতে সুশীলের আর কিছু  
বলবার রইল না। সে বুঝতে পারল বিশ্বক উপভোগের ক্ষেত্র বিস্তৃত, সবারই  
মূল উদ্দেশ্য মন ভোলানো, তবে এটুকু স্বীকার্য যে জাদুবিদ্যা নিয়ন্ত্রণীর আর্ট।  
আরও বৃদ্ধ ম্যাজিক দেখার সময় কোণল টের পাওয়াটা বড় কথা নয়, জাদুকর  
তাঁর সাহায্যে কতখানি মন ভোলাতে পারল সেটাই বড় কথা।

ঘরের মধ্যকার উবেজ্ঞনাপূর্ণ আবহাওয়াটা এতক্ষণে কেবল একটুখানি  
স্বাভাবিক হয়ে আসছিল, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল।

ওদের আর এক বন্ধু, উপেন, বেশি বকম উত্তেজিতভাবে এসে বলল, “এখনও  
ঘরে বসে আছ তোমরা?”

“কেন, হঠাৎ উঠে যাবার কি ঘটেছে?” প্রশ্ন করল মাধব।

“অমর সিং এসেছে কলিকাতায়।”

“অমর সিং?”—সবাই একসঙ্গে চোঁচিয়ে উঠল। “বল কি? কবে  
এসেছে?”

“বিশেষ সংখ্যা কাগজ বেরিয়ে গেছে এই খবর নিয়ে—পড়ে দেখ।”

সবাই উপেনের হাতের কাগজ খুলে মস্ত বড় বড় অক্ষরের মোটা শিরোনামা  
পড়ল—“কলিকাতায় বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর অমর সিং।”

“দেখতে হবে এই অমর সিং-এর খেলা।” বলল মিহির।

“আমিও দেখব।” বলল মাধব।

“আমিই কি বাদ যাব?” বলল সুশীল।

বলা বাহুল্য এর পর আর কোনো আলাপ জমল না। এত বড় একটা  
উত্তেজক খবর, একেবারে অভাব্য, অচিন্ত্য খবর। সূতরাং শহরের বিরাট  
মানবস্রোতের সঙ্গে এদের চিন্তাস্রোত অমর সিং-এর দিকে প্রবলবেগে ধাবিত  
হয়ে চলল। মনে সন্দেহ জাগল তবে কি ঐ প্রবাদটাই সত্য? অমর সিং

আসবে বলেই কি জাদুবিদ্যা এদের মনে তার পূর্বাভাস জাগিয়েছিল ?  
হয় তো তাই ।

২

পৃথিবী ভ্রমণ শেষ ক'রে উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম সকলদিকের জাদুকরদের পরাজিত ক'রে এক-জাহাজ মেডেল-ও অগ্নাত্ত পারিতোষিক নিয়ে অমর সিং এসেছেন কলকাতা শহরে । বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর উদ্যা এবং হুডীনির প্রধান শিগোবা অমর সিং-এর কাছে তার মেনেছেন, ভারতবর্ষের এটা জাতীয় গৌরব ।

এত দিন সবার জানা ছিল হাতকড়া লাগানো অবস্থায় বাস্তবন্দী জাদুকরের বাস্তব থেকে অনায়াস নির্গমনই হচ্ছে জাদুবিদ্যার চরম খেলা । যেমন খুশি, যেখানে খুশি, দর্শকদের নিজ হাতে তৈরি সিন্দুকে তালার পর তাল লাগিয়ে যেখানে ইচ্ছা বন্ধ ক'রে রাখা হোক না, সেই বন্ধন এবং বন্দিত্ব মুহূর্তে ঘুচিয়ে জাদুকর বেরিয়ে এসে দর্শকদের সঙ্গে কোলাকুলি করেন—এর চেয়ে বড় কৌশল আর নেই । কিন্তু অমর সিং এ কৌশলকে ছাড়িয়ে বহু উর্বে উঠে গেছেন । অর্থাৎ তিনি বেরিয়ে আসেন না, আবিভূত হন না, অদৃশ্য হন । রাত্রে কালো ঘবনিকার সম্মুখে দর্শকদের দিকে কড়া আলো ফেলে অদৃশ্য হওয়ার যে খেলা সবাই জানে, অমর সিং-এর খেলা সে খেলা নয় । তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে লোকবেষ্টনীর কড়া পাহারার মধ্যে সবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অদৃশ্য হন ।

এ খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে চোখে ধুলো দেওয়া নেই । শিবজীর অদৃশ্য হওয়া, স্ত্রীভাষ বস্তুর অদৃশ্য হওয়া, অথবা লায়েক আলির অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে এর তুলনা চলে না । এ একেবারে অলৌকিক । অতএব লৌকিক আকর্ষণ যে এর সবচেয়ে বেশি হবে সে কথা বলা বাস্তব্য মাত্র ।

৩

রেখাচিত্রে সূর্যোদয়ের ছবি আঁকবার একটা পরিচিত প্রথা আছে । একটি দিগন্তজ্ঞাপক রেখা, তার সঙ্গে সংলগ্ন একটি অর্ধবৃত্ত এবং তা থেকে বিচ্ছুরিত অনেকগুলি সরল রেখা সূর্যরশ্মির পরিচয় বহন করে ।

গত এক সপ্তাহ ধরে কলকাতা শহরের একটি বিশেষ অংশে এই রকম একটি সূর্যোদয়ের বৃহৎ রেখাচিত্র বিমানভ্রমণকারীরা আকাশ থেকে দেখতে পাচ্ছে ।

বিষয়টিতে রহস্য কিছুই নেই। ঐ অর্ধবৃত্ত হচ্ছে অমর সিং-এর প্রকাণ্ড প্যাভিলিয়ন, আর রশ্মিরেখাগুলি সাতটি বিভিন্ন 'কিউ'-এর রেখা।

প্রথম দু'দিন খেলা দেখানো সম্ভব হয় নি, শহরের যাবতীয় লোক একসঙ্গে গিয়ে ভেঙে পড়েছিল সেখানে, অনেকে হাড় ভেঙেও পড়েছিল, অবশেষে সেনাবিভাগের সাহায্যে ভিড় নিয়ন্ত্রিত ক'রে, সাতটি বিভিন্ন 'কিউ' রচনা ক'রে স্তবে দেখানো সম্ভব হয়েছে। বৃদ্ধ পুরুষ, বৃদ্ধা মহিলা, যুবক পুরুষ, যুবতী মহিলা, বালক, বালিকা, এবং খোকা ও খুকীর ( এটি সম্মিলিত ) পৃথক গেট এবং 'কিউ' করাতে এবং সমস্ত আসনের নম্বর ক'রে দেওয়াতে সবার পক্ষেই খুব সুবিধাজনক হয়েছে। প্রত্যেক গেট-মুখ পর্যন্ত যে এক একটি লাইন দাঁড়িয়েছে তার পিছনের দৈর্ঘ্য সীমাহীন।

বহু লোক মহুমেন্টের মাথায় উঠে এই দৃশ্য দেখছে, কারণ এরও একটি আশ্চর্য শোভা আছে। তা ভিন্ন প্রত্যেক দুটি কিউ-এর মধ্যবর্তী স্থানে একটি ক'রে সাজোয়া গাড়ি স্থাপিত হওয়াতে দৃশ্যটি সুন্দরতর হয়ে উঠেছে।

সাত দিনের চেষ্টার ফলে সূশীল, মাধব এবং মিহির বসতে পেরেছে ভিতরে গিয়ে। বহু রকমের খেলা, বিচিত্র সব ভেলকি, একটার পর একটা দেখানো হচ্ছে। কত ঘড়ি চূর্ণ হয়ে আবার নতুন হল, কত পায়রা বেরিয়ে উড়ে গেল একটা টুপীর মধ্য থেকে, কত তাসের খেলা, টাকার খেলা, ভূতের খেলা, কিন্তু তবু সেগুলো যেন দর্শকদের মনে ধরছে না। এরা শুধু দেখতে চায় সকল খেলার সেরা খেলা—অমর সিং-এর অস্তর্ধান।

সেই খেলা অবশেষে দেখানো হল। কঠিন দর্শক-প্রাচীর-বেষ্টিত অমর সিং প্রথমত ভারতীয় তান্ত্রিক সাধনা, হঠযোগ এবং বহু প্রকার কৃচ্ছ যোগের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিলেন এবং বললেন, “এবারে আসি।”

সবাই চমকিত বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে দেখে অমর সিং নেই।

দীর্ঘস্থায়ী করতালিতে চন্দ্রাতপের নিচে এক অভূতপূর্ব আনন্দ পরিবেশ। হঠাৎ দেখা গেল অমর সিং দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপালের পাশে।  
—বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়।

রাষ্ট্রপাল উঠে দাঁড়িয়ে জাহকরকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে বললেন, “আজকের পৃথিবীতে অমর সিং-এর মতো ঐজ্জ্বালিক আর কেউ নেই।”

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হতে না হতে এক স্থলকার ব্যক্তি বলে উঠলেন “জুড়ি আছে। সেই জুড়ির কাছে অমর সিং শিশু।”

দর্শকেরা এ কথা শুনে আর কেপে গেল, বলল, “হতে পারে না—ও রকম

কমলাব কথা আঁহরা শুনেছে চাই না।" এই চিংকায়েব মধ্যে সুলীল, মাধব, মিহির এবং উপেনের কণ্ডও শোনা গেল।

সুলকায বললেন, "সত্য কথা বলছি।"

গঙগোলের সস্তাবনা দেখে রাষ্ট্রপাল ক্রুড চলে গেলেন সেখান থেকে। জনতা সুলকাযকে চ্যালেঞ্জ ক'রে বলল, "নিযে আসুন আপনার জাদুকরকে।"

সুলকায বললেন, "তঁার মঞ্চ এখানে নয়, উত্তর-প্রদেশে, সেখানে গিয়ে দেখতে হবে তঁার খেলা।"

তখন সুলকাযের পরিচয় নেওয়া হ'ল, এবং সবাই বুঝতে পারল, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তিনি, তঁার কথা অবিশ্বাস করা যায় না।

হে হে পড়ে গেল সভাস্থলে। সে কি উত্তেজনা! কি উৎসাহ! সঙ্গে সঙ্গে কমিটি গঠন করা হয়ে গেল এবং ঠিক হল, স্বয়ং অমর সিং সেখানে গিয়ে সেই খেলা দেখবেন এবং তিনি নিজে যদি স্বীকার করেন সে খেলা তঁার খেলার চেয়েও চমকপ্রদ, তা হ'লে সে কথা মানা হবে, অস্ত্রাধায় হবে না।

কিন্তু অমর সিং-এর মুখে একটি কথা নেই। অমর সিং কিছু না বললে চ্যালেঞ্জ করার কোনো মানে হয় না। বহু সাধ্যসাধনা ক'রে শেষ পর্যন্ত তঁাকে রাজি করানো হল। সুলীল, মাধব, মিহির বলল, "আমরাও যাব আপনার সঙ্গে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এর মধ্যে কোথায়ও ধাক্কা আছে, কিন্তু সেটা কি তা না দেখা পর্যন্ত বলা শক্ত।"

সুলকায ব্যক্তিটি সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা ক'রে ফেললেন এবং ঠিক হল উত্তর-প্রদেশের প্রদেশপাল স্বয়ং খেলায় উপস্থিত থাকবেন।

সে খেলার কথা যা শোনা গেল তা সবাই অবিশ্বাস্ত। কিন্তু যদি সত্য হয়, তা হ'লে অমর সিং-এর ভাগো কি হবে তা অনুমান ক'রে সবাই শিউরে উঠল। শোনা গেল প্রকাণ্ড একটি পাহাড় সবার সম্মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে। কথার ফাঁকি নেই এর মধ্যে, কেউ হয় তো মনে করতে পারে পাহাড় তো ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় অথবা অ্যাটম বোমায়, কিন্তু ব্যাপার তা নয়। পাহাড়ের চারদিকে যত ইচ্ছা লোক থাকতে পারে, পুলিশ থাকতে পারে, দৈগ্গদল থাকতে পারে, কিন্তু তবু প্রকাশ্য সূর্যালোকে দৃশ্য পাহাড় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

সুলীল মিহিরকে বলল, "ভাবতে পারছ কিছু?"

মিহির বলল, "কৌশলটা আমার কাছে অবাস্তব, আমার কাছে এ রকম

একটি ঘটনাই হচ্ছে বড় কথা। কি ক'রে হয় জানতে চাই না, বুঝতেও চাই না, আমি শুধু উপভোগ করতে চাই।”

মাধব বলল, “আমি আর্টের জগতই আর্ট কথাটা বোল আনা মানি না, তাই ওর কৌশলও খুঁজি, উদ্দেশ্যও খুঁজি।—সব আমি তুলিয়ে বুঝতে চাই।”

সুশীল বলল, “তোমরা সবাই মিলে যা চাও আমিও তাই চাই।”

দিন ঠিক হয়ে গেল। কলকাতা থেকে অমর সিং-এর সঙ্গে বিমানে গেল পঞ্চাশ জন বিচারক। তার মধ্যে মিহির, সুশীল ও মাধব। পরে দেখা গেল উপেনও তার মধ্যে স্থান পেয়েছে কোনোমতে।

য়েলগাড়িতে যে কত লোক গেল তার সংখ্যা নেই। তারা সবাই যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছল উত্তর-প্রদেশে। সব আয়োজন আগে থাকতেই পাকা করা ছিল।

বিপুল জনতা, বিপুল উল্লাস, বিপুল উত্তেজনা। একটি দিন ধরে কি ঘে হয়ে গেল তা প্রকাশের ভাষা নেই।

## ৪

খেলা দেখানো শেষ হয়েছে। নিখাস রোধ ক'রে সবাই সকল ভেলকির চরম ভেলকি দেখেছে। কিন্তু কলকাতার উৎসাহীদের চোখে সকল আলো নিবে গেছে, তাদের সকল আশা ভেঙে গেছে, সকল উৎসাহ জল হয়ে গেছে, রক্তের চাপ কমে গেছে, ধাত বসে গেছে, কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে, মেরুদণ্ড বঁকা হয়ে গেছে, কনুই-হাঁটুর অস্থিবন্ধনী টিলে হয়ে গেছে, কটিদেশ বেদনায় টনটন করছে, কপালের শিরা দপ দপ করছে, পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেছে।

আর অমর সিং ? তাঁর অবস্থা অবর্ণনীয়, সবচেয়ে সঙ্কটজনক। অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে হাঁসপাতালে আনা হয়েছে, হাত-পা ঠাণ্ডা—গরম সেক দিচ্ছে নার্সরা, উত্তেজক ইন্জেকশন দিচ্ছে ডাক্তাররা, উপরস্থ পেটে কিছুই থাকছে না বলে শিরার ভিতর গ্লুকোসের জল ঢোকানো হচ্ছে।

দীর্ঘ সাত দিন কাটল এই ভাবে। ম্যাজিক বিষয়ে সকল তত্ত্বকথা ওদের মনে গুলোটপালট হয়ে গেছে। সবারই মুখ বুলে পড়েছে, সবাই নির্বাক, শুধু বসে বসে বিষন্ন দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকানো।

দিন তিনেক পরে একে একে সবাই কলকাতা ফিরতে লাগল। অমর সিং বিমানে ফিরলেন, ফিরল না শুধু সুশীল, মাধব আর মিহির।

কলকাতায় ধারা ফিরে এলো, তাদের আর কাউকে কিছু বলতে হল না, খবর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তা ছাড়া বলবার কিছু ছিল না।

সেখানে যে খেলাটি সবাই দেখল সেটি হচ্ছে এই যে পাহাড়টি ঠিক পাথরের পাহাড় ছিল না, দশ লক্ষ মণ চিনির বস্তার পাহাড়।

সরকারের লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, পুলিশ ছিল, সেনাদল ছিল, স্বয়ং প্রদেশপাল ছিলেন, সরকারী খাতায় চিনির হিসাব ছিল, তাতে লেখা ছিল মাত্ৰ লক্ষ মণ চিনি উদ্ধৃত আছে। কিন্তু জাহ্নবীচন্দ্রের ছোঁয়া লেগে সবার সামনে চিনির পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল, পড়ে রইল নিচের স্তরের পাটাতনগুলি, এবং হিসাব ক'রে দেখা গেল সাড়ে ন'লক্ষ মণ ঘাটতি পড়েছে।

কি ক'রে এটি সম্ভব হল তা সরকারী বুদ্ধি, বে-সরকারী বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, অবৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অগম্য। স্বয়ং অমর সিং-এর জাহ্নবী-কৌশল পরাহত।

সুশীলরা পড়ে রইল উত্তর-প্রদেশে, একটি প্রশ্নের উত্তর তাদের চাই-ই, নইলে তারা ফিরবে না পণ করল।

ওরা তিন বন্ধু জাহ্নবীচন্দ্রের পদধূলি নিতে লাগল প্রতিদিন। কিন্তু তবু প্রশ্নের উত্তর মিলল না। মিহিরের মুখে একমাত্র প্রশ্ন, এত বড় পাহাড় গেল কোথায়!

অবশেষে জাহ্নবীচন্দ্র ওদের অবস্থা দেখে করুণাভরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, “সিঙ্গাপুর”।

পরদিনই কাগজে খবর বেরল, সিঙ্গাপুরে উত্তর-প্রদেশের সাড়ে ন'লক্ষ মণ চিনির চোরা চালান ধরা পড়েছে।

## বহুরূপী

এখন কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে সাংবাদিক, ত্রিশ বছর আগে এ বকর ছিল না। তখন আমরা সাংবাদিককে দেখতে ধবরের কাগজের অফিসে যেতাম।

বর্তমানে সাংবাদিক-পশুলেশন বৃদ্ধির কারণ—এ যুগটাই হচ্ছে সংবাদের যুগ। দুই যুগের সংবাদেও তফাৎ কত। আগে ঘটনা আগে ঘটত, এখন সংবাদ আগে ঘটে। চাই সাংবাদিক প্রতিভা।

কিছুকাল আগে এক সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হঠাৎ আলাপ। আমার বাড়ির সামনে কয়েকদিন তাঁকে ঘুরতে দেখেছিলাম একখানা নোট বই ও পেন্সিল হাতে। দেখতাম তিনি মাঝে মাঝে সে নোট বইতে কি সব টুকে রাখছেন। পুলিশের লোক ভেবেছিলাম আগে। অদম্য কৌতূহল বশত একদিন দু'এক কথায় আলাপ শুরু করলাম, ক্রমে আলাপ জমে উঠল।

তিনি যে সাংবাদিক সে পরিচয় তিনিই দিয়েছিলেন।

তখন কলকাতা শহরে দুর্ভিক্ষে পথে পথে লোক মরছিল। একদিন বলেছিলাম তাঁকে, “কেমন দেখছেন সব?” আমার প্রশ্নটি অবশ্য নিতাস্তই অর্থহীন; উদ্দেশ্য, কোনো বকমে একটু আলাপ জমানো।

তিনি বললেন, “অদ্ভুত।”

“কি পরিমাণ লোক মরছে?”

“স্বাভাবিক।”

কথাটা ভাল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, “স্বাভাবিক মানে কি? রিপোর্টটা কি ভাবে লিখছেন? যত লোক মরছে ততটাই কি আপনি আশা করছেন?”

“মৃত্যুর কথা কিছু লিখছি না।”

“কেন?”

“আমাদের দেশে ওটা খবর নয়।”

“বলেন কি? এত মৃত্যু, এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু!”

সাংবাদিক বললেন “আমার চোখে এর কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়।”

“আপনি অস্বাভাবিক করলেন আমাকে।”



“আমি ঠিকই বলছি। খবর কাকে বলে বোধ হয় জানেন না। কুকুর মাম্বকে কামড়েছে এটি খবর নয়, মাম্ব কুকুরকে কামড়ালে খবর হয়। কিলতেবর এক কাগজের অফিসের গল্পটা জানেন? বার্তা সম্পাদকের কক্ষে সবাই বিচলিত, উত্তেজিত কোনো খবর সেদিন আসে নি। এ দিকে রাত বায়েটা বাজে, শেষ কপি দেবার সময় উপস্থিত। এমন সময় এক সহকারী তার নিজের কুকুরটি পাশের ঘর থেকে ধরে এনে টেবিলে তুলে তার পা কামড়াতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে খবর তৈরি হয়ে গেল। সম্পাদক তাঁর সহকারীকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলেন।”

“তা হলে যারা মরছে তাদের খবর কি ক’রে হতে পারে?”

“হতে পারে, যারা মরছে তারা যদি মারতে পারত। কিন্তু যাক সে কথা, আজ গোটা দুই খবর পেয়েছি। একটুকু আগে দু’জন কেরানি আমার পাশ দিয়ে বলতে বলতে ছুটে গেল—ভরপেট খেয়ে এ ভাবে হেঁটে অফিসে যেতে তাদের বডই কষ্ট হচ্ছে, ভিডের জন্ম ট্রামে-বাসে উঠতে পারেনি তারা।”

“খবর হল কোথায়, বুঝতে পারছি না।”

“কেরানি হয়েও পেট ভরে খেতে পেয়েছে এটি অবশ্যই খবর। আর একটি খবর—অবশ্য এটি আগেই আমার জানা উচিত ছিল—এই শহরে কোথাও ঘি পাওয়া যায় না।”

আমি বললাম, “এ তো পুরানো খবর, আমরা সবাই জানি, কারণ সব ঘি-তেই ভেজাল থাকে।”

সাংবাদিক বললেন, “ভেজাল ঘিও পাওয়া যায় না।”

“বলেন কি, হঠাৎ কি হ’ল? আমি তো জানি ভেজাল ঘি-তে বাজার চেয়ে গেছে, আপনি অসম্ভব কথা বলছেন।”

“অসম্ভব কথা বলছি বলেই সংবাদ হিসাবে এর দাম খুব বেশি। আর অসম্ভব বলেই এ তথ্য আবিষ্কারে আমার দেরি হয়েছে।”

কথাটা শুনে একটু বিরক্ত বোধ করলাম। বললাম “মিথ্যাকে সত্য বলে চালানোটাও কি সংবাদ সৃষ্টি না কি?”

সাংবাদিক এ প্রশ্নে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন “সত্য আর মিথ্যা বলে কোন জিনিস নেই। ও দুটির মাপকাঠি কি? আপনি চোখে দেখেছেন বলে ভাবছেন ঠিক দেখছেন, এই তো? কিন্তু একটা জিনিস বা একটা ঘটনার কতটুকু আপনি এক সঙ্গে এক সময়ে দেখতে পান? প্রত্যেকটি জিনিস বা ঘটনার অনেকগুলো ভাইমেনশন আছে, স্থান ও কালের মধ্যে তার

বিস্তার আছে, আপনি হাজার চেষ্টা করলেও একই সময়ে কোনো জিনিসের সব দিক দেখতে পান না, আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ তা পায় নি। অতএব আপনার কাছে যা সত্য তাই বলছেন সত্য, শুধু আমার কাছে যা সত্য সেটি আপনি মানছেন না। কিন্তু যত্ন দিয়ে যেনে দেখলে বুঝতেন সবই আংশিক সত্য। আসল জিনিসের একটুখানি অংশ দেখেই আমরা সত্য মিথ্যা নিয়ে এত মারামারি করি।”

আমি বললাম “কিন্তু তাই বলে কোনো জিনিস আছে এবং নেই একই সঙ্গে সত্য হয় কি ক’রে?”

“তাও হয়, মশায়, একই সঙ্গে একটি জিনিস চলছে এবং চলছে না, একই সঙ্গে একটি জিনিস ছোট এবং বড়, ভাল এবং মন্দ হতে পারে। বিজ্ঞান এ কথা স্বীকার করেছে। আপেক্ষিকবাদ পড়ুন, তা হ’লেই বুঝতে পারবেন আপনি যাকে একমাত্র সত্য বলে চেপে ধরে আছেন, দেখবেন তা আপনার মুঠোর মধ্যেই মিথ্যা হয়ে আছে।”

আমি বললাম “তা যদি হয় তাহ’লে আপনার কথাগুলোও তো সত্য না হতে পারে?”

“অবশ্যই না হতে পারে। আমি তো বলছি না যে আমার কথা ঠিক সত্য।”

“তাহ’লে বাজারে ঘি ও নেই, ভেজাল ঘি-ও নেই, এই দুটি কথা কে আপনি খবর হিসাবে চালাবেন কি ক’রে?”

“এটা সম্পূর্ণ পৃথক প্রশ্ন। আপনি যেদিক থেকে দেখে বলছেন বাজারে ভেজাল ঘি আছে, আমি সেদিক থেকে দেখছি না। আমি অন্য দিক থেকে দেখে বলছি বাজারে ঘি-ও নেই ভেজাল ঘি-ও নেই।”

“তা হ’লে কি আছে?”

“আছে ‘বিশুদ্ধ ঘি’ অথবা ‘খাঁটি ঘি’। ঘি নেই। ‘বিশুদ্ধ ঘি’ অথবা ‘খাঁটি ঘি’ ঘি থেকে পৃথক। তেমনি ধরুন বাজারে দুধ নেই, আছে শুধু বিশুদ্ধ দুধ। হোটেল নেই, আছে পবিত্র হোটেল।”

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হচ্ছিলাম, এমন সময় সামান্য কিছু দূরেই গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটতে আমাদের আলোচনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। একখানা বাস দারুণ শব্দ করে থেমে গেল, সবাই চিৎকার করে উঠল এক সঙ্গে। মুহূর্তে সেই বাস ঘিরে দুর্ভেদ্য ভিড় জমে উঠল। শোনা গেল বাস একটি স্কুলের মেয়েকে চাপা দিয়েছে।

ভিড় ঠেলে দুর্ঘটনা দেখবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমার ছিল না, বলা বাহুল্য

আমার সঙ্গে আলোপ-রত সাংবাদিক বহু পূর্বেই অদৃশ্য হয়েছিলেন সেই ভিড়ের মধ্যে ।

অতিরিক্ত আরও একটি দুর্ঘটনা ঐ একই সঙ্গে ঘটেছে শোনা গেল বাইরে থেকেই । বাস-এর ড্রাইভারকে উপস্থিত জনতা ইতিমধ্যেই মেরে আধমরা করে ফেলেছে ।

পরদিন খবরের কাগজে দুর্ঘটনার বিবরণ পড়তে অতি-উৎসাহ বশতঃ তিন খানা কাগজ কিনলাম । সত্য-দৃষ্টি সম্পর্কে নবলব্ধ জ্ঞানই আমাকে এ কাজে প্রেরণা যুগিয়েছিল । যাচাই করে দেখছিলাম বিভিন্ন রিপোর্টার একই ঘটনা কিভাবে দেখেছে ।

একখানা কাগজ লিখেছে, মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল পথে, বাস তার ঘাড়ে এসে পড়ে । আর একখানা কাগজ লিখেছে—বাস-চালকের কোনো দোষ নেই, মেয়েটি এমন অতর্কিতে চলন্ত বাস-এর সামনে এসে পড়ে যে সে অবস্থায় বাস থামানোর প্রসঙ্গই ওঠে না । আর এক কাগজ লিখেছে মেয়েটি কলার খোসায় পা পিছলে চলন্ত বাস-এর নিচে পড়ে গেছে ।

কয়েকদিন পরে দেখা হল সাংবাদিকের সঙ্গে । বললাম, “আপনি সেদিন ঠিকই বলেছিলেন—একই ঘটনা নানা ভাবে দেখে ।”

“কি করে বুঝলেন ?”

“দুর্ঘটনার পর দিন আমি তিনখানা কাগজ কিনেছিলাম—দেখলাম কোনোটার সঙ্গেই কোনোটা মেলে না, তিন কাগজে তিন রকম রিপোর্ট ।”

তিনখানা কাগজের নাম বললাম । সাংবাদিক মৃদু হেসে বললেন, “ঐ তিনখানা কাগজেরই রিপোর্টার আমি নিজে ।”

## যুক্তির স্বাদ

কাপড়ের জন্ত একদিন, তেলের জন্ত একদিন—চন্দ্রনাথ এই দুই ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে। কাল কাপড় কিনেছে একবেলা লাইনে দাঁড়িয়ে, আজ দাঁড়িয়েছে তেলের জন্ত। একা মানুষ, ছুটি না নিলে কাপড়, তেল, কয়লা, কিছুই কেনা হয় না।

লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চন্দ্রনাথের পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। পরশা দিয়ে জিনিস কিনবে তার জন্ত এত শাস্তি কেন? কি পাপ করেছে দেশের লোক? ছ-চার ডজন চোরাবাজারীর জন্ত এত লোক ভুগবে? তারাই হবে সবার ভাগ্যবিধাতা? ক্যাবিনেট মিশন আসছে! গোষ্ঠীর মাথা আসছে। দেশ স্বাধীন হচ্ছে লাইনে দাঁড়িয়ে!

চন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধৈর্য রাখতে পারে না, সামনের লোকটিকে এই অবিচারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে, কিন্তু সে লোকটি নির্বিকার। সে শুধু ওর কথায় একবার চকিতের জন্ত চোখ ফিরিয়ে ওর চেহারাখানা দেখে নেয়, তারপর যেমন ছিল ঠিক তেমনি নিজীবের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। চন্দ্রনাথ মনে মনে বলে ভেড়ার পাল সব, একটু চটতেও জানে না।—একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হলে সময়টা একটু সহজে কাটতে পারত।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে দোকানের দরজায় পৌছতে দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা কেটে গেল চন্দ্রনাথের, কিন্তু হায় রে অদৃষ্ট! তার পাল ষখন এলো, তখন দোকানে আর তেল নেই।

তার মানে একটি মশস বিনা তেলে কাটাতে হবে।

ছুটি এ মাসে সে আর পাবে না।

দোকানীকে খুন করতে ইচ্ছা হল তার। চিংকার করে দোকান কাটাতে ইচ্ছা হল তার। দোকানের আমবাবপত্র ভেঙে একটি দাঙ্গা বাধাবার ইচ্ছা হল তার। কিন্তু কিছুই সে করল না।

করতে পারল না।

দুঃসাহসের বয়স চলে গেছে। শক্তিও অস্বহিত।

আঠায়ো বছরের চাকরি তার সকল শক্তি হরণ করেছে। স্তব্ধতা মনে মনে গভর্নেন্টকে অভিশাপ দিতে দিতে খালি টিন হাতে বাড়ি ফিরতে হল তাকে।

একটি দিনের ছুটি অথচ কিছুই হয় না।

এই স্বার্থতা, এই নিষ্ফল প্রয়াসের জালা চন্দ্রনাথ আর কেন মল্ল করতে পারছে না। উত্তেজনার চরম অথচ কিছুই করবার নেই। তেলের অভাবে জ্বল লেহু ভাল বাছ খেতে হবে, তিন টাকা মেয়ের বাদাম তেল কত দিন কেনা যায়? কিনবে না বাদাম তেল। আশ্রয়বন্ধনার কাজে সে নতুন ব্রতী নয়, এ তার অভ্যাস হয়ে গেছে। তার জন্ম আর ভাবনা কি? ভাবনা হচ্ছে মনের জালা জুড়ানো যায় কিসে?

আচ্ছা, খবরের কাগজে অনেকে অভাব অভিযোগ জানায়, তাতে কি কিছু হয় না? না হলে এত চিঠি ছাপা হয় কেন? আর কিছু না হোক নিজের কথাটি তো পাঁচ জনকে শোনানো যায়? তাতেও অনেক শাস্তি। চূপ ক'রে বলে থাকার চেয়ে অস্তুত ভাল। হাজার হাজার লোক চিঠি পড়ে, তাতে একটা সাঙ্কনা আছে বৈ কি। সেও কেন লিখবে না? লিখলে নিশ্চয় তা ছাপা হবে।

অবশেষে চিঠি লেখাই সে ঠিক করল। এককালে কলেজে পড়ার সময় রচনাশক্তি তার ভালই ছিল, বহুকাল পরে একখানি পত্র রচনার স্ফোরণ পেয়ে তার মনে বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হল। অনেক খুঁজে একখণ্ড কাগজও সে সংগ্রহ করল, কারণ কাগজেরও দুর্ভিক্ষ লেগেছে। কিন্তু হায়!—লেখা যে বেরোয় না কলম থেকে! খবরের কাগজে যে চিঠি ছাপা হবে, তার চেহারা কেমন হবে? মন অত্যন্ত আত্মচেতন হয়ে উঠল, যত লেখে তত কাটে, কিছুতে চিঠির ভাষায় ঠিক সুরটি লাগে না। অবশেষে কাটতে কাটতে দেখে কাগজ শেষ হয়ে গেছে।

মনে আগুন জ্বলছে অথচ কলমে ভাষা নেই!

ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর গলদঘর্ম হয়ে উঠে পড়ল চন্দ্রনাথ। অসহায় সে সকল দিকেই। মনটা বিধিয়ে উঠল তার। মনে পড়ল লাইনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। এখন দেখল কাগজে চিৎকার করার ক্ষমতাও তার নেই।

চন্দ্রনাথ দ্রুত আত্মস্থ হল। আশ্রয় মাহুঘের মন! কল্পনাবলে বা হঠাৎ উত্তেজনায় নিজেকে যত বড় করেই দেখুক, সেই অতিকার চেহারার পরমাণু দীর্ঘ হয় না। কারণ কয়েক মুহূর্ত পরেই তার মনে এই তত্ত্বকথার উদয় হল যে চূপ ক'রে যাওয়াই ভাল। অনেকেই তো চূপ ক'রে আছে। তারাও তেল

পায় না, কাপড় পায় না, অথচ বেশ নিশ্চিন্ত মনে অফিস করে, সন্ধ্যাবেলা বকে বলে :দাবা খেলে, হারমোনিয়াম তবলা নিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত আসব জমায়। এতটাও কিছু আবার বাড়াবাড়ি। এত দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও এত সুখে আছে দেখানোর চেষ্টা। চন্দ্রনাথ ওর মধ্যে নেই। ওরা উচ্ছন্ন থাক, চন্দ্রনাথ বাড়াবাড়ি করবে না। দুঃখ নিয়েও না, সুখ নিয়েও না।

দিনটা চন্দ্রনাথের সত্যই খারাপ কাটল। ছুটি পেয়েও তার সদ্যবহার হল না। বাড়ির বন্ধু আবেষ্টনে মনটা তার হাঁপিয়ে উঠতে লাগল। ইচ্ছে হল বাড়ির বাইরে গিয়ে একটু ঘুরে বেড়ায়! নিরুদ্দিষ্টভাবে চলতে চলতে একেবারে পৌঁছল গিয়ে ময়দানে। বহু বৎসর পরে তার মন একটুখানি খোলা আকাশের জন্তু আর্ত হয়ে উঠেছে।

আঃ! কি মুক্তি কি আনন্দ! একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল সে সেইখানে। ময়দানের হাওয়া তার ক্ষত মনের উপর একটা মধুর প্রলেপ লাগিয়ে দিল, একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল তার মনে।

এ রকম দায়িত্বহীন ভাবনাচিন্তাহীন খোলা আকাশের নিচে বসে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেবার কল্পনা ছাত্রজীবনে কতবার সে করেছে, এবং সে কল্পনা মিলিয়েও গেছে সে জীবনের সঙ্গে সঙ্গী। কিন্তু তবু এতদিন পবে অথচ সে দিনের সেই পরিচিত হাওয়াটাই যেন আজও সেদিনের সেই স্নিগ্ধতা বহন করে বয়ে চলেছে।

একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনের ফাঁকে, এতদিন পরে, ভাগ্যের হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া এই ক্ষণমুক্তির অবসরটুকু তার কাছে পরম উপাদেয় বলে বোধ হতে লাগল। উদার আবেষ্টনে একটুখানি বসেই তার পুনর্জন্ম ঘটল। জীবনভর বাজার করা, খাওয়া, আর অফিসে ছোটা, হাস্যকর মনে হতে লাগল। যেন ওসব স্বপ্ন, সব মিথ্যা।

সব চেয়ে মজার কাণ্ড, আকাশ, মাঠ, বাতাস সম্পর্কে কতকগুলো ফিল্মের গানও অবচেতনার নিভৃত সমাধি থেকে হঠাৎ জেগে উঠে তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল।

খোলা আকাশের এত শক্তি ?

এ জে ভয়ানক ব্যাপার !

চন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে পড়ল।

যে মানুষ ছিল এত বড়, যার দৃষ্টিস্তা ছিল পর্বতপ্রমাণ, সেই মানুষ এই বিরাট আকাশের নিচে এত ছোট হয়ে যেতে পারে !

কীটের মতো ছোট !

ভাবনা চিন্তার পাহাড় পড়ল ধসে ।

একটা মধুর আনন্দে মশগুল হয়ে চন্দ্রনাথ গুলে পড়ল সবুজ ঘাসের বিছানায় ।  
চোখ দুটি তার বুজে এলো অতি সহজেই ।

হাওয়ার ভেসে চলেছে যেন...দেহমনের সকল গ্লানি তার মুছে গেছে ।

ভাবছে মনে মনে, যেমন ক'রে হোক প্রতিদিন এইখানে একবার ক'রে  
আগতে হবে, এসে মুক্তিমান ক'রে প্রতিদিন নতুন মানুষ হয়ে ফিরতে হবে ।  
দিনের গ্লানি ময়দানের আকাশ-গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে প্রতিদিন ।...

হঠাৎ কার স্পর্শ ?

চন্দ্রনাথ বিদ্বাংস্পৃষ্টের মতো তড়াক ক'রে উঠে বসল । স্তম্ভিত বিশ্বয়ে চেয়ে  
দেখে এক ভীষণ গুণ্ডা । সে আঙুলের ইসারা ক'রে বলছে, বাবুজি, কি আছে  
মেহেরবানী ক'রে দিয়ে দাও ।

অন্য হাতে তার এক ছোরা—সঙ্ঘাত অঙ্ককারে যেন জ্বলছে ।

বিমূঢ় চন্দ্রনাথ ঘন্থের মতো উচ্চারণ করল—কি আছে ? কিছু তো  
নেই ।

ছোরার তীক্ষ্ণ ফলক চন্দ্রনাথের পাজর স্পর্শ করল । গুণ্ডার চোখ দুটিতে  
ব্যঙ্গের হাসি ।—চন্দ্রনাথ মস্তমুগ্ধ ।

একেবারে সর্বাঙ্গীন মুক্তি । মনের বোঝা আগেই নেমেছিল, এবারে  
নামল অঙ্গের বোঝা । চন্দ্রনাথ বলেছিল কিছু তো নেই, কিন্তু দেখা গেল তার  
কথা ঠিক নয় । পকেটে আড়াইটি টাকা ছিল, গায়ে শার্ট ছিল, চাদর ছিল,  
হাতে ঘড়ি ছিল, চোখে চশমা ছিল, পায়ে একছোড়া নতুন জুতো ছিল,  
পরিধানে ধুতি ছিল ।

গেঞ্জি গায়ে, খালি পায়ে, ল্যাকটপরা, উদ্ভ্রান্ত চন্দ্রনাথ বিকশয় ফিরছে  
ময়দান থেকে—যেন কুস্তির আখড়া থেকে ফিরছে ।

তৃতীয় আর একটি মুক্তির স্বাদ এখন কেবল তার বাকী রইল—কিন্তু সে  
মুক্তির ডাক কবে আসবে কে জানে ।

( ১৯৪৭ )

# একটি দেব-নৈতিক গল্প

১

অম্বুদ্বীপে এমন একটা সময় ছিল যে-সময়ের কথা ইতিহাসে লেখা নেই। সেই সময়ে এই দ্বীপ দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল : পূর্ব অংশ ও পশ্চিম অংশ। দুই অংশে একই জাতীয় লোক বাস করত কিন্তু তবু এদের মধ্যে একটা বিষয়ে গুরুতর ভেদ ছিল।

ভেদের বিষয় হচ্ছে ছাতা ও পাগড়ী।

পূর্বের লোকেরা বলত, ছাতাই হচ্ছে মাথা রক্ষার একমাত্র উপায়, কেননা ছাতা একই সঙ্গে মাথা থেকে মুক্ত এবং ছাতার সঙ্গে যুক্ত। একই সঙ্গে ত্যাগ এবং ভোগ। একই সঙ্গে মিলন এবং বিচ্ছেদ। একই সঙ্গে সীমা এবং সীমাহীনতা।

পশ্চিমের লোকেরা বলত, পাগড়ী হচ্ছে মাথার রক্ষক এবং ভ্রমণ। যে জিনিস মাথা বাঁচাবে, মাথার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা হওয়া চাই ঘনিষ্ঠ। একেবারে অঙ্গাঙ্গী ভাব। তিলেক বিচ্ছেদ নেই। যাকে বন্ধু বলে মানব তাকে বন্ধু বলেই চেপে ধরবে। তার অনেক ছেড়ে অনেক ধরে রাখার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। যাকে একবার মাথায় তুলে নিয়েছি তাকে চিরদিনই মাথায় রাখব। পাগড়ী আমাদের চিরশিরোধায়।

পূর্বের লোকেরা যখন ছাতার গৌরব প্রচারে একটু বেশি মুগ্ধ হয়ে উঠত, তখন পশ্চিমের লোকেরা অপমানিত বোধ করে তাদের মাথা ভাঙত। আবার পশ্চিমের লোকেরা যখন পাগড়ীর গুণগানে দেশ কাঁপিয়ে তুলত, তখন পূর্বের লোকেরা তাদের উপর গিয়ে হানা দিত।

এমনি করে কেটে গেল তাদের বহু যুগ। পূর্ব পূর্বই থেকে গেল, পশ্চিম, পশ্চিম।

কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমে যত বৈপরীত্যই থাক, তবু দুইয়ের মাঝখানে একটা মিলন-রেখা থাকেই। সেইখানে স্বভাবতই একটা মিলন-ভূমি গড়ে উঠতে থাকে। সেইখানে বিরোধ যত হয় তীব্র, ঠোকাঠুকি যত হয় কঠিন, ততই পরস্পর আঘাত প্রত্যাঘাতের ভিতর দিয়ে একটা মিশ্রণ ঘটতে থাকে। এদেরও হয়েছিল তাই। এইখানে পূর্বের লোকেরা পাগড়ী এবং পশ্চিমের লোকেরা ছাতা সহজেই ব্যবহার করতে শুরু করল। আর নতুন বিরোধেরও সূত্রপাত হল তাই থেকেই।



পূর্বের চরম পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিমের চরম পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ হল। অতি মারাত্মক ব্যাপার। পূর্বের লোক পাগড়ী পরবে—এই অভূতপূর্ব ব্যাপার পূর্বের লোকেরা কিছুতেই সহ্য করবে না। ছাতাই তাদের ধর্ম, ছাতাই তাদের মর্ম, ছাতাই তাদের জীবন। এত বড় সভ্যতা তাদের গড়ে উঠেছে ছাতাকে কেন্দ্র করে। তারা হয়েছে ছত্রপতি, দানামুদাসেরা হয়েছে ছত্রধর। ছাতার কথা মনে হলে গর্বে তাদের বুকের ছাতি ফুলে ওঠে। এই ছাতা তাদের একতাসূত্রে গেঁথেছে, ছাতা ত্যাগ করা আর ঐক্যবন্ধ পূর্বের ছত্রভঙ্গ হওয়া একই কথা।

পূর্ব যতই ছাতার মাহাত্ম্য অনুভব করে, পশ্চিমও ততই পাগড়ীর প্রতি তাদের ভক্তি বাড়িয়ে তোলে। পশ্চিমবাসী যে-কোনো লোক পাগড়ীর জন্ত প্রাণ দিতে পারে, পাগড়ীর মান বাঁচাতে প্রাণহরণের চেয়ে পুণ্য আর হতে পারে না। পাগড়ী দেওয়া আর শির দেওয়া তাদের চোখে এক। পাগড়ীর বদলে শির নেওয়াই তাদের ধর্ম।

আপোষ প্রয়াসী মধ্যবর্তীদের নিয়ে এইভাবে বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে—আর তার ফলে পূর্ব-পশ্চিমবাসী সবার শান্তি ভঙ্গ হয়। যুগ যুগ ধরে চলে এই অশান্তি। দুই পক্ষই ক্রান্ত হয়ে পড়ে একদিন।

কিন্তু কোনো মতেই আপোষ সম্ভব হয় না।

দুটি মাত্র আপোষ প্রস্তাব উঠেছিল :

এক—ছাতা ও পাগড়ী একই সঙ্গে সবাই ব্যবহার করলে কেমন হয়।

দুই—ছাতা ও পাগড়ী একই সঙ্গে ত্যাগ করলে কেমন হয়।

প্রথমটির বিরুদ্ধে বলা হয় পূর্ব-পশ্চিম সংস্কৃতি এক সঙ্গে মিলতে পারে না, তাতে সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে।

দ্বিতীয়টির বিরুদ্ধে বলা হয়, সংস্কৃতি মানেই ধর্ম, সুতরাং সংস্কৃতি ছাড়া মানেই ধর্ম ছাড়া, আমরা তাতে রাজি নই। স্ববর্গে নিধনঃ শ্রেয়ঃ।

২

মৌমাংসা হল না, উপরন্তু দুপক্ষেরই উত্তাপ ক্রমশঃ এত বেড়ে গেল যে একটা বড় রকমের সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠল। নানারকম প্ল্যান চলতে লাগল আক্রমণের।

এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল জম্বুদ্বীপে।

কিছুদিন ধরেই অনাবৃষ্টি চলছিল দেশে। খবর প্রচার হয়ে গেল, এবারে ঋতু শস্তের অভাবে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য।

সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মাঠে শস্ত নেই!

পরস্পর আক্রমণের এমন সঙ্ঘবন্ধ পরিকল্পনাটাও মাঠে যারা গেল। উদ্বোধনকারীরা হতাশ হয়ে পড়ল। পূর্ব-পশ্চিম দুদিকেই বৈজ্ঞানিকেরা অভিনব অস্ত্র তৈরি করেছিল, কবিরা দেশের লোকের মনে হিংস্রতা জাগানোর জন্য গান লিখেছিল—সবই যে বৃথা যায়! দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কি লড়াই করা যায় না? ধর্মের চেয়েও কি পেট বড়?—দুর্ভিক্ষই এই মীমাংসা ক'রে দিল। দেখা গেল, না খেয়ে কিছুই করা যায় না।

এলো দুর্ভিক্ষ প্রবল মূর্তিতে। পূর্বপশ্চিম দুদিকের লোকেরাই মরতে লাগল হাজার হাজার। অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানেরা অর্ধাহারে দিন কাটাতে লাগল। এই মহাবিপদে দুপক্ষই ভুলল তাদের বিরোধ, দুপক্ষই পরস্পরের আরও কাছে সরে এলো।

দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এলো মহামারী। বছরের পর বছর চলল মড়কের লীলা। পূর্ব-পশ্চিম মরতে লাগল একই নিয়মে। ছাতা এবং পাগড়ী কারও মাথা বাঁচাতে পরল না।

এখন উপায়?

পূর্ব প্রাণ করল পশ্চিমকে, পশ্চিম প্রাণ করল পূর্বকে।

আবার বসল পরামর্শ সভা।

প্রাণ বাঁচাতে হবে।

পূর্বকে বাঁচতে হবে, পশ্চিমকে বাঁচতে হবে। অর্ধাহারে অনাহারে দুঁকে দুঁকে জীবনধারণের কোনো অর্থ হয় না।

পূর্ব পশ্চিমকে ডেকে বলল, ভাই, ছাতা মিথ্যা, ত্যাগ করলাম ছাতা।

পশ্চিম পূর্বকে ডেকে বলল, পাগড়ী আমরা আগেই ফেলে দিয়েছি। আমরা দুদিকের লোকই এখন বিগত মহুগ্ৰহের নিরাপদ ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছি, এখনও যদি আমরা আমাদের নিশ্চিত ধ্বংসের কোনো প্রতিকার খুঁজে না পাই তা হ'লে ষিক আমাদের মহুগ্ৰহের।

পূর্ব বহু চিন্তা ক'রে বলল, অমৃতের অধিকারী হতে হবে।

সে চেষ্টা তো আমরা করেছি কিন্তু কোনো ফল হয় নি।

আমরাও করেছি, তাতেও কোনো ফল হয় নি।

তা হ'লে চেষ্টা ক'রে লাভ কি?

লাভ আছে। এতদিন আমরা চেষ্টা করেছি পৃথকভাবে, এবারে চেষ্টা করতে হবে এক সঙ্গে মিলে।

তা হ'লে হবে ঠিক ?

হবে, যদি মিলনটা ঠিক হয়।

মিলতেই হবে অমৃতের জন্ম। অমৃত না পেলে আমরা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাব। ..কিন্তু মিললেই যে অমৃত লাভ করব, তার নিশ্চয়তা কোথায় ? দেবতারা তো বলেছেন, অমৃত তাঁরা ছাড়তে রাজি নন।

আমাদের মেলবার পরেও তাই বলবেন, কিন্তু আমরা তা শুনব না। কেন না এবারে ছোর ক'রে অমৃত আদায় করব, আর ভিক্ষা নয়।

আমাদের মিলিত শক্তি কি দুর্বল হবে না ?

মিলিত শক্তিতে স্বর্গ আক্রমণ করলে দেবতারা বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন

৩

স্বর্গের আজ সতাই বিপদ। এতদিনের অমৃত ভোগের মেঘাদ এবারে বোধ হয় ফুরিয়ে যায়।

ঋষীপের লোকেরা একজোট হয়ে স্বর্গে আসছে অমৃত দখল করতে। দেবতাদের মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনা এবং ভয়মিশ্রিত অস্থিরতা জেগে উঠেছে।

স্বয়ং ব্রহ্মা স্বর্গের রক্ষী-ব্যবস্থাগুলো পরীক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছেন। দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় তাঁর বাহিনী প্রস্তুত ক'রে আত্মরক্ষার জন্ম যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে তাঁর দূরবীণ। ব্রহ্মা হাঁকলেন, সেনাপতি ?

কার্তিকেয় চমকিত হয়ে আদেশের অপেক্ষায় চূপ ক'রে রইলেন।

ব্রহ্মা প্রশ্ন করলেন, পারবে ?

কার্তিকেয় বিনীতভাবে বললেন, ভাবছি।

তা হ'লে ভাব—বলে ব্রহ্মা ইন্দ্রের দ্বারস্থ হলেন।

অমৃত কার কাছে আছে ?

ইন্দ্র বললেন, আজ্ঞে, আমারই কাছে রেখেছি।

ব্রহ্মা প্রশ্ন করলেন, পারবে ?

কি ?—নির্বোধের মতো ইন্দ্র পান্টা প্রশ্ন ক'রে বসলেন।

ব্রহ্মা মহা বিরক্তভাবে বললেন, তোমার মাথা ।

মাথা রক্ষা করতে পারব কি না প্রশ্ন করছেন ?

সে প্রশ্নে আমার দরকার নেই । অমৃত রক্ষা করতে পারবে কি না বল ।

চেষ্টা করব ।

ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বললেন, তোমরা সবাই দেখছি কাপুরুষ, দৈববিশ্বাসী, অদৃষ্টবাদী । তোমরা অপদার্থ । জন্মদ্বীপের লোকদের কি ক'রে ঠেকিয়েছ তাই ভাবছি ।

আজ্ঞে, সোজা উপায়েই ঠেকিয়েছি ; বলেছি দোষ না ।

ওরা অমৃত চায় কেন, বলেছে ?

বলেছে, ওরা দেবত্ব লাভ করতে চায় । ওদের মধ্যে হিংসাদ্বেষ মারামারি কাটাকাটি চলছে বহুদিন । ওরা বহু রকম দুঃখ ভোগ করেছে যুগের পর যুগ, আর পাবছে না । ওরা আমাদের সঙ্গে এখন কো-প্রসূপেবিটি চায় ।

তুমি এই সব চূপ ক'রে শুনেছ, এবং আশ্চর্য্যের জন্ম কিছুই বল নি ?

আজ্ঞে, বলবার আর কি আছে ।

কেন বলনি যে আমরা অমৃতের অধিকারী হয়েও তোমাদেরই মতো ছোটলোক, হিংসা দ্বেষ হানাহানিতে তোমাদের মতোই পটু ? কেন বলনি যে অমৃত পেলেও তোমাদের দুঃখ ঘুচবে না ?

বললে বিশ্বাস করত না বলেই বলি নি ।

এখন বাঁচবে কি ক'রে ওদের হাত থেকে ? ওরা এবারে একজোট হয়ে আসছে, এবারে তো আর মুখের কথায় কাজ হবে না, এবারে যে লড়াই করতে হবে ।

ইন্দ্র চিন্তিতভাবে বললেন, আজ্ঞে মানুষের সঙ্গে তো কোনো দিন লড়াই করি নি ।

তা হ'লে জয়লাভে তোমাবও সন্দেহ আছে । যা ভেবেছিলাম তাই হল শেষটায় । তা হ'লে এখন যে যার পথ দেখ । আমি চললাম নারদকে খুঁজতে । —বলেই ব্রহ্মা ছুটলেন নারদের এলাকার দিকে ।

পথে বিশ্বকর্মার সঙ্গে দেখা ।

বিশ্বকর্মা ব্রহ্মাকে ছুটতে দেখে সভয়ে প্রশ্ন করলেন, প্রভু, ব্যাপার কি ?

ব্যাপার অতি গুরুতর । এখন সব বলবার সময় নেই । তুমি সাইরেন বাজাবার জঞ্জ প্রস্তুত হয়ে থাক । ইচ্ছিত পেলেই বাজিয়ে দেবে ।

বিশ্বকর্মা বললেন, তথাস্ত, তবে—

তবে কি ?

মন্দাকিনী নদীর উপর যে সেতুটি তৈরি করেছিলেন, সমরাজ তার উপর দিয়ে স-বাহন পারাপার করাতে সেতুটি ভেঙে পড়েছে, সেইটি মেরামত করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

ব্রহ্মা বললেন, সেতুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস কর। কেন, প্রশ্ন করো না, যা বলি চোখ বুজে শুধু মেনে যাও। এখন আর সময় নেই। জম্বুদ্বীপের মাহুঘেরা আসছে স্বর্গ আক্রমণ করতে, হুঁশিয়ার থাক।

ব্রহ্মা আবার ছুটে লাগলেন। কিছুদূর গিয়েই দেখেন, একটা নিরিবিদলি জায়গায় নারদ বসে তাঁর চারদিকে ধূম্রজাল সৃষ্টি করছেন।

ব্রহ্মা এগিয়ে গিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করতেই নারদ হাতের ইসারায তাঁর ধ্যান ভাঙতে নিষেধ করলেন।

তাঁর চারদিকে ধোঁয়ার আবরণ ক্রমেই গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল, কিছুক্ষণ পবে তার তাঁকে দেখাই গেল না।

ব্রহ্মা অত্যন্ত বিবিক্ত হবেন নারদের এই স্বার্থপর ব্যবহারে। যারা প্রবীণ তাঁদের উচিত আর সবাইকে বাঁচাব পথ ক'রে দেখা, তা না ক'বে নারদ নিজেকে রক্ষা করতেই বাগ্র। এই পলায়নী রুত্তি নারদের পক্ষে অতি জঘন্য মনোগুত্তির পরিচায়ক।

ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ডেকে নারদের চাবিত্তিক কৃটির কথা নিবেদন করলেন।

ইন্দ্র বললেন, কিহ্ব এখন আমাদের প্রত্যেকেরই তো ও ছাড়া আর পথ নেই। আপনিও তাই বলেছেন।

ব্রহ্মা বললেন, সে বলেছি তোমাদের জন্ম। তোমাদের উচিত ছিল মেয়েদের পাডায় গিয়ে তাদের আশ্রয়ক্ষার ব্যবস্থা করা তাবা হয়তো এখনও কিছুই জানে না।

ব্রহ্মার কথা শেষ হতে না হতে তাদের হাজার হাজার মন্তুঘের ঝগুস্বর ভেসে এলো তাঁদের কানে। তারা মাঝামাঝি পথে এসে পড়েছে, তাদের দূরগত ধনি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র দুজনকেই দিশাহারা ক'রে দিল।

ইন্দ্র, আমি চললাম নন্দন কাননের দিকে, পার তো তুমিও এসো—বলে ব্রহ্মা উন্নাদের মতো ছুটে পালালেন।

ইন্দ্র বললেন, আপনি আগে পালান, আমি অমৃত ভাঙটি নিয়ে এখুনি আসছি।

ইন্দ্র অমৃত ভাঙটি ঘাড়ে ঝুলিয়ে একটু পরেই নন্দনকাননের দিকে ছুটে চললেন।

মানুষদের কোলাহল আরও কাছে শোনা যেতে লাগল। তারা এসে পড়েছে স্বর্গে। বিশ্বকর্মা সাইরেন বাজিয়ে দিয়েছেন। সঙ্কে সঙ্কে দেবসেনাপতি তাঁর বাহিনীকে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছেন, তার কোনো পাত্তা নেই। মেয়েরা নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করেছে।

অম্বুদ্বীপের লোকেরা সম্পূর্ণ মশস্ত্র হয়ে এসেছে। ব্রহ্মা ধোঁয়ার আবরণে বশেই বুঝতে পারলেন তারা সংখ্যায় কয়েক হাজার হবে।

নারদ আরও শুনেতে পেলেন তারা নানাবকম স্লোগান আওড়াচ্ছে, তার মোটামুটি অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা এবারে দেবতাদের শক্তি চূর্ণ করে অমৃতভাণ্ড লুণ্ঠন করে নেবেই।

নারদ ধূম্রকুণ্ডলীর ভিতর থেকে সব শুনে আরও একাগ্রচিত্তে প্রতিকার চিন্তা করতে লাগলেন। তবে একটা বিষয়ে তিনি এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন যে মানুষেরা দেবতাদের সহজে খুঁজে পাবে না, কারণ তাঁরা যে ইতিমধ্যেই আত্মগোপন করেছেন এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই।

## 8

নারদের ধারণা ঠিক।

মানুষেরা স্বর্গে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তারা এখানে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। সাইরেন বাজার শব্দ শুনে তারা যতটা উল্লসিত হয়ে পড়েছিল, দেবতাদের আশ্রয়স্থলের কোনো সন্ধান না পেয়ে তারা তেমনি দমে গেছে।

তারা এসে জড়ো হল মন্দাকিনী নদীর ধারে।

কিন্তু আসতে না আসতেই ঝপাং করে নদীতে এক শব্দ! সবারই দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল।

কি হল? কি হল?—চেয়ে দেখে একটা গাভী তার ল্যাজটি শূন্যে তুলে নদী পার হয়ে যাচ্ছে।—গোরু এলো কোথেকে?

কামধেনু!

সে নদীর ধারে একটি ঝোপে লুকিয়ে ছিল, বিপদ বুঝতে পেরে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কামধেনুই যেন তাদের পথ দেখিয়ে দিল। তারাও নদী পার হবে। তারা আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আজ এম্পার কি ওম্পার একটা কিছু করবেই। তা ছাড়া দেবতাদের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে ওরা স্পষ্টই বুঝতে পারল তাঁরা ইতিমধ্যেই

প্রায় হার স্বীকার করেছেন। আত্মসমর্পণ তাঁদের করতেই হবে, না হয় তো স্বর্গ থেকে তারা নড়বে না।

ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মন্দাকিনীর জলে।

নদীটি বেশি প্রশস্ত নয়, পঁচিশ কিংবা ত্রিশ গজ হবে।

স্বর্গীয় নদীর জলে পথক্রান্ত মানুষদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

নদী থেকে উঠেই সম্মুখে দেখতে পেল পারিজাত বৃক্ষ। এই বিখ্যাত বৃক্ষের কথা এবং এর বিখ্যাত পুষ্পের কথা তাদের আগে থাকতেই জানা ছিল। তারা গিয়ে দাঁড়াল সেই গাছের নিচে। প্রচুর ফুল ফুটে ছিল গাছে, কিন্তু আপাতত তারা সে দিকে মন দিতে পারল না। মনোযোগ দিলে ইন্দ্রের পক্ষে একটু মুশকিল হত, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই অমৃতভাণ্ড নিয়ে সেই গাছের ডালেই গা ঢাকা দিয়ে বসে ছিলেন।

ওদের একজন প্রশ্ন করল, যদি কারও দেখা না পাই ?

আর একজন প্রশ্ন করল, স্বর্গটা দখল করলে কেমন হয় ?

আর একজন বলল, দেবতারা পৃথিবীতে গিয়ে জম্বুদ্বীপে বসবাস করুক, আমরা থাকি এখানে।

ইন্দ্রের কানে এই সব মারাত্মক কথা গিয়ে তাঁকে আরো উতলা ক'রে তুলল। স্বর্গও যাবে, অমৃতও যাবে, এ যে এক মহা বিপদ !

ওদের আর একজন বলল, স্বর্গ দখল করা এখন আর কঠিন মনে হচ্ছে না, কিন্তু এখানে আমরা খাব কি ?

যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন।

একজন প্রশ্ন করল, স্বর্গেও কি খাওয়া দরকার হয় ?

আর একজন বলল, না হলে ইতিমধ্যেই খেতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন ?

আর একজন বলল, তোমার একাধি ইচ্ছেয় তো বিচার হবে না।

দুহাজার লোক সম্মুখে বনে উঠল, আমরা মনাই খেতে চাই, ক্ষিদেয় পেট জ্বলতে আরম্ভ করেছে।

ইন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, হায় যে দুর্ভিক্ষের দেশের লোক !

একজন প্রস্তাব করল, কামধেনুকে খুঁজে বের করতে হবে।

ওদের কেউ কেউ কামধেনুর পরিচয় জানত না। তারা এ প্রস্তাবে হতাশ হয়ে বলল, তাকে দিয়ে চাষ করিয়ে, ফসল ফলিয়ে তবে খাব ?

প্রস্তাবকারী বলল, না। ওকে পেলেই আমাদের সকল ক্ষুধার অবসান।

ওর কাছে যা চাইবে তাই পাবে এবং চাওয়ামাত্র পাবে।

সে আবার কেমন গোক ?

ও আসলে গোকই নয়। গোকর ছদ্মবেশে ও হচ্ছে স্বর্গের কমিশন এজেন্ট।  
ও সব সময় সবার কাখনা পূরণ করে।

কামবেশু ওদের কাছাকাছি এক গর্তে লুকিয়ে ছিল, সে এ-কথায় বেশ  
কৌতুক অনুভব করল।

৫

ওরা এইখানে নানা রকম আলোচনা এবং আক্রমণ আর অসুস্থকান পরিকল্পনা  
শেষ ক'রে চারটি পৃথক দলে বিভক্ত হল এবং চতুর্দিকে অসুস্থকানে বেরিয়ে  
পড়ল।

ইন্দ্র বৃক্ষতল নিরাশদ জ্ঞান কবায় তাঁর আশ্রয় শাখা থেকে নিচের দিকে  
পা বাড়াতেই গাছের মাথা থেকে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন ধ্বনিত হল, ওরা কি চলে  
গেছে ?

ইন্দ্র চমকে উঠে চেয়ে দেখেন, ব্রহ্মা তাঁর পূর্বের এক ডালে বসে আছেন।

ইন্দ্রের অণু পেয়ে তিনিও এলেন নিচে। এসেই প্রশ্ন কবলেন, বিপদকর্মা  
কোথায় ? তাকে ডেকে তাড়াতাড়ি এখন এমন একটা দুর্গ তৈরি কবানো  
দরকার, যেখানে মানুষেরা আর প্রবেশ করতে না পারে। নারদ ধোঁয়াব মধ্যে  
বসে আছে— ও নিতাস্তই নিবোধ, ওকে এখন ডেকে আন।

ডেকে আনতে হল না। দেখা গেল নারদ বীণা বাজাতে বাজাতে তাঁদের  
দিকেই আসছেন।

ব্রহ্মা বললেন, তা হ'লে কি মানুষের জন্মস্থানে ফিরে গেল ? তা হ'লে কি  
নারদের বীণাকে 'অল ক্রিয়াব' মনে করতে পারি ?

নারদ কাছে এগিয়ে এসে বললেন, পারেন। তার কারণ আমি স্বর্গের  
বিপদ আশঙ্কা ক'রেই ধ্যান বসেছিলাম। বিশ্বাস ককন, এ রকম একাগ্রচিত্ত  
ধ্যান আমি ইতিপূর্বে আর কখনও করিনি। আমার বিশ্বাস আমি সাফল্যও  
লাভ করেছি। কিছুক্ষণ ধ্যানে বসেই আমি দেখলাম মুক্তির উপায় অতি  
সহজ। আমরা মানুষের সম্পর্কে এতদিন একটা মস্ত বড় ভুল ক'রে আসছিলাম।  
আমরা ভেবেছিলাম অসুস্থকানের লোকেরা কখনও একসঙ্গে মিলতে পারে না।  
তাই যখনই পূর্বের লোকেরা এসেছে তখনই বলেছি অমৃত দেব না,  
পশ্চিমের লোকদেরও ঐ এক কথাই বলেছি। আমরা জানতাম, ওরা



যতদিন পৃথক থাকবে ততদিন আমাদের কোনো আশঙ্কাই নেই। শুধু পূর্ব বা শুধু পশ্চিম কখনও পৃথকভাবে আমাদের কাছ থেকে অমৃত কেড়ে নিতে পারে না। আমরা এই ভেবেই এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম।

ব্রহ্মা বললেন, এখন কি ভাবে ওদের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যর্থ করবে ?

নারদ বললেন, সেটা মুখে না বলে একেবারে কাজেই দেখিয়ে দিই। মানুষেরা তো দেবতাদের ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর আবার ফিরে এদিকেই আসছে। আপনারা নিভীকচিত্তে এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন এবং আমি যা করি, বিনা প্রতিবাদে তা দেখুন।

ব্রহ্মা বললেন, তোমার কথা বরাবরই বিশ্বাস করেছি, এখনও করলাম, কিন্তু যা পরীক্ষামাপেক্ষ তার উপর তোমার এতখানি ভবসা করা কি ঠিক হচ্ছে ?

নারদ বললেন, দেখুনই না। আমার বিশ্বাস আমি সফল হব। পারব স্বর্গকে বাঁচিয়ে দিতে। ঐ তো মানুষেরা সব এসে পড়ল।

ইন্দ্র ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, অমৃতভাণ্ডটা কি সামনেই পড়ে থাকবে ?

নারদ বললেন, যেমন আছে তেমনি থাকবে।

ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র হতানুস্ত সন্দ্বিগ্নচিত্তে এবং সভয়ে নারদের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কামদেবতার-পড়া পারিজাত ফুলগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগল।

৬

জম্বুদ্বীপের লোকেরা আসছে যেন বন্যার স্রোতেব মতো। তারা দেখতে পেয়েছে ব্রহ্মা, নারদ, ইন্দ্রকে। তারা মুহূর্তে মুহূর্তে অধিকতর উল্লাসে নন্দন-কাননের প্রান্ত কাঁপিয়ে তুলছে। তাবা ঢুঁকার, তাগা ঢুঁদাস্ত, তাগা ঢুঁদ, তাগা ঢুঁপনেয়। তাদের স্রোত যদি প্রতিহত না করা যায় তা হ'লে তারা সমস্ত স্বর্গকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তারা গর্জন করতে করতে আসছে, বর্ষাব নদীয়ে মতো তারা পাক গেয়ে ফুলে ফুলে উঠছে।

ব্রহ্মা কম্পিত কণ্ঠে নারদকে বললেন, বাবা, এখনও হয় তো সমফ আছে।

নারদ বললেন, নির্ভয়ে অপেক্ষা করুন, পিতঃ।

ইন্দ্র মাথা নিচু করে রইলেন, উট পাখীর বিপদাশঙ্কায় বালিতে মাথা গুঁজে থাকার মতো।

ভয়ে তিনি অমৃতভাণ্ডের কথাও ভুললেন।

জম্বুদ্বীপের সম্মিলিত জলপ্রপাত মাথার উপর ভেঙে পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নারদ হাত তুলে বললেন, শুরু হও। আমরা আজ তোমাদের অমৃত দান করব বলেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি। এই নাও অমৃত।

নারদ অমৃতের ভাণ্ডটি তাদের সম্মুখে এগিয়ে দিলেন।

জলপ্রপাত মগ্নবলে যেন প্রস্তুত হইত হইল।

আর পাথর হয়ে গেলেন ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং কামধেনু।

এই অপ্রত্যাশিত সম্প্রদান-এষণা দেখে জম্বুদ্বীপের লোকেরা কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না। এত বড় প্রতিক্রিয়া তাদের মনে আর কিছুতে এতদিন হয় নি। এ অভিজ্ঞতা তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন।

একজন মাত্র অমৃত ভাণ্ডটি দখল করার জন্য হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু মধ্যপথে তারও হাত থেমে গেল।

অমৃত তারা কেড়ে নিতে এসেছিল, কিন্তু এ যে দিতে চায়।

আরও একজন হাত বাড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু তারও মনে সন্দেহ জাগল, দিতে চায় কেন ?

সবাই পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে সন্মুখে শুধু বলে, এ কি হল। এ যে দিতে চায়।

সাহসী লোকটি বলল, সত্যিই দিতে চান, না প্রতারণা ?

নারদ গম্ভীরভাবে বললেন, অমৃতভাণ্ড তোমাদের সামনেই।

ওরা এ কথায় আবার চমকিত হল, আবার ওদের মনে সন্দেহ জাগল।

একজন এগিয়ে এসে পরীক্ষা করে বলল, অমৃতই বটে। এ বকম বর্ণ এবং গন্ধ আর কোনো বস্তুর হতেই পারে না। বনস্পতি মেশানো থাকলেও শতকরা পাঁচের বেশি নেই।

ওরা আবারও কিছুক্ষণ পরস্পর মুখ-চাওয়া চাওয়ি করে বলল, আমরা অমৃত নিতেই এসেছি, নিয়েই যাব, কিন্তু তার আগে নিজেদের মধ্যে একটুখানি পরামর্শ করে নিই, কারণ অমৃত আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। ওর ফলাফল কি হতে পারে এতদিন বিস্তারিতভাবে ভাবার দরকার হয় নি, আজ সেটা বিশেষ দরকার মনে করছি।

দূরে একটি লতাকুণ্ড দেখা যাচ্ছিল, গোপন পরামর্শের পক্ষে স্থানটি উত্তম বিবেচনা করে ওদের দলপতিরা সেইখানেই গেল।

সেখানে স্বর্গের নর্তকীদল লুকিয়ে ছিল, তারা মাহুঘের শব্দ পেয়ে পিছন দিক দিয়ে লতাকুণ্ড ভেঙে পালিয়ে গেল।

দলপতিদের পরামর্শ সভা বসল এইখানে। একঘণ্টা আলোচনার পর, অমৃত ভোগ করতে পারলে জম্বুদ্বীপের কি অবস্থা হবে, সে বিষয়ে ওরা সম্পূর্ণ একমত হল।

ওরা কল্পনা ক'রে খুশি হল যে—

( ১ ) কারও কোনো দুঃখ থাকবে না।

( ২ ) সবাই স্বাধীনভাবে সুস্থদেহে প্রফুল্লমনে বাঁচতে পারবে।

( ৩ ) অকালমৃত্যু সম্পূর্ণ লোপ পাবে।

[ ৪ ] দেশে প্রচুর ফসল ফলবে।

[ ৫ ] কোনো অভাব না থাকতে পরস্পরের মধ্যে অগ্নায় প্রতিযোগিতাও থাকবে না।

[ ৬ ] পূব এবং পশ্চিম দুদিকেরই সম্পদ সমানভাবে বৃদ্ধি পাবে।

[ ৭ ] ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

আলোচনা শেষ ক'রে সবাই খুব খুশি হয়ে উঠল। সবাই বলল, এখন অমৃত নিশ্চিত মনে দখল করা যেতে পারে, কোনো দিক দিয়েই আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না। অতএব অবিলম্বে অমৃতভাণ্ডটি হস্তগত হওয়া দরকার।

সভা ভঙ্গ হল, সবাই উঠল।

একজন কিছু উঠল না। সে বলল, মস্ত একটা সন্দেহ ঢুকেছে আমার মনে।

সন্দেহ ! সন্দেহের কথায় সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। তাইতো সন্দেহ যখন আছে তখন তাদের মনেও তো তা জাগা উচিত। এত সহজে তা হ'লে মতের মিল হওয়া ঠিক হয়নি।

সন্দেহ যাদের মনে জাগেনি তারা নিজেদের নির্বোধ মনে করতে লাগল।

সন্দেহবাদী বলল, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা মানে কি জান ?

ওর মধ্যে কি কোনো প্যাচ আছে না কি ? ওরা সবাই প্রশ্ন করল।

সন্দেহবাদী বলল, আছে। ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা মানে হচ্ছে গিয়ে, পূব ইচ্ছে করলে পাগড়ী ব্যবহার করতে পারবে, পশ্চিম ইচ্ছে করলে ছাতা ব্যবহার করতে পারবে।

সবাই হতাশ ভাবে বসে পড়ল।

পূর্ব অনেক চিন্তা করে বলল, তাই তো, তা হ'লে অমৃত নিয়ে আমাদের লাভ কি ?

পশ্চিম বলল, আমরাও ভাবছি, লাভ কি ? অমৃতে তা হ'লে তো সমস্যা মিটছে না। বিরোধ বিরোধই থেকে যাচ্ছে, উপরন্তু আমাদের স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গেলে এবং মনে এবং দেহে নতুন শক্তি লাভ হলে আমাদের মধ্যে আগের চেয়েও বেশি করে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে।

পূর্ব বলল, এটা সম্পূর্ণ ন্যায় কথা।

একজন আপোষপন্থী ছিল, সে বলল, বেশির ভাগই যদি ভাল হয় তবে একটা বিষয়ের সুবিধা ছাড়লে ক্ষতি কি ?

পূর্ব-পশ্চিম সমন্বরে বলল, ছাড়তে হয় তো অমৃতই ছাড়ব, ধর্ম ছাড়ব না।

দুপক্ষই উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে এলো নতাকুল থেকে এবং এসেই নারদকে গিয়ে বলল, অমৃত স্বর্গেই থাক।

ব্রহ্মা এতক্ষণে স্বপ্নির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ব্রহ্ম রূপাহি কেবলম্।"



স্বর্গে বিরাট উৎসবের আয়োজন চলছে। দেবতারা আজ মুক্তি দিবস পালন করবেন, এই উপলক্ষে নারদকে মানপত্র দান করা হবে।

ব্রহ্মা নারদকে বলছেন, আমরা স্বর্গে বসে অনেক কিছু সৃষ্টি করেছি, কিন্তু বিভেদসৃষ্টিতে তুমি অধিতীয়।

নারদ বিনীতভাবে বললেন, আপনাকে স্মরণ করেই ধ্যানে বসেছিলাম। হঠাৎ এই সত্যটি মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যে, 'দেব না' বলে যদি অকৃতকার্য হয়ে থাকি, তা হ'লে 'দেব' বললে সফল হতে বাধ্য। পরীক্ষাতেও তার প্রমাণ হয়ে গেল, এখন আর আমাদের ভয় নেই। ওরা যখনই আসবে, বলতে হবে, এই নাও অমৃত। ওরা আর নিতে পারবে না। যদি নিতাস্তই নেয় তা হ'লে দেখবে পাত্রটিই নিয়েছে, অমৃত তলার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে গেছে, কারণ, দেবার আগে পাত্রটি ফুটো করেই দেব।

## প্রায়শ্চিত্ত

সকালে পারিবারিক টেবিলে বসে চা কেক ইত্যাদি উপভোগ করাট  
স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু মিস্টার চক্রবর্তী চায়ের টেবিলে বসেও আজ যেন কেমন  
দৃষ্টিস্তাগ্রস্ত। চা খেতে বিবেকে আটকাচ্ছে। থেকে থেকে পূর্বরাত্রে স্বপ্ন  
মনে এসে ধাক্কা মারছে। সমাজ আক্রান্ত, লড়াই আসন্ন, কর্তব্য কর্তিন। তা  
ফেলে চা খাওয়া ?

পাশের বাড়ির মিস্টার ভট্টাচার্যের অবস্থাও প্রায় একই। তাঁর সমস্ত  
রাত ঘুম হয় নি। তাঁর স্ত্রীও না। সামনে সাপ্তাহিক ম্যানচেস্টার  
গার্ডিয়ান খানা পড়ে আছে, মন লাগছে না। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

পরবর্তী আর একটি বাড়িতেও ঐ একই ছবি। মিস্টার মুখার্জির সামনে  
চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। তাঁর স্ত্রীর মাথাও দপদপ করছে।

নিকটস্থ আরও অন্তত দশখানা বাড়িতে ঐ একই কারণে শান্তি ভঙ্গ  
হয়েছে। মাত্র একটি লোকের অনাচারে সমাজের বাধন ছিঁড়ে যায় যায়।

সবার শত্রু সমাজদ্রোহী নটবর সান্যালকে নিয়ে কি করা যায়। তাঁর স্ত্রী  
দুর্গারানী আরও অসহ্য।

গত রাত্রে উত্তেজনা চরমে উঠেছে। নটবর সান্যাল শাসিয়েছেন, তিনি  
যা করছেন তাই করবেন। রাত বারোটা পর্যন্ত দৃঢ়শ্রদ্ধালাবদ্ধ সমাজকে  
অপমানিত ক'র মাথা উঁচু ক'রে ফিরে গেছেন। তাঁর এই চ্যালেঞ্জ সমাজ  
পতিদের বুকে সন্ত্রাস আঘাত হেনেছে। অতএব আর দেরি করা চলে না।  
নিজেদের কিছু দুর্বলতা আছে বলেই, অনাচার ফেনেও, কোনো রকমে  
সান্যালকে এতদিন তো তাঁরা মেনে এসেছেন, কিন্তু অবস্থা চরমে উঠেছে,  
আর নয়।

নটবর সান্যাল ধনী, অতএব মাঝে মাঝে টাকা ধার পাওয়া যায়। এমন  
লোককে অকারণ কষ্ট ক'রায় তাই কারো গা ছিল না এতদিন। কিন্তু বাইরের  
গণ্যমান্য লোকের সামনে তাঁকে নিজেদের একজন বলে পবিচয় করিয়ে দেওয়ার  
হীনতা আর যে সহ্য করা যাচ্ছে না। তাই আগে যা ছিল অচ্যুত-উপরোধ  
তা এখন আক্রমণের পর্যায়ে উঠেছে নেহাৎ বাধ্য হয়েই। আর সেই কারণেই  
একা অনাচারীর বিরুদ্ধে তাঁরা সবাই এমন ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন। এবারে  
নটবর সান্যালকে সত্যি ভাবে হেঁচকি দেবে, যদিও মৌখিক দাঙ্গা কমেই।

যেয়ে মহলে লজ্জাটা হয়েছে আরও বেশি। দুর্গারাগীকে এতদিন তাঁরা আভাসে ইঙ্গিতে তাক্কিল্য ক'রে আসছিলেন, তাঁর ছোঁয়া লাগলে অপবিত্র বোধ করেছেন, বাগ্নাঘরে এলে বাগ্নাঘর ভিডিটি দিয়ে ধুয়েছেন, এবারে হাতেকলমে তাঁকে একঘরে করতে হবে, উদ্রলোক বুঝুন—সত্যমেব জয়তে।

নটবর সান্ত্বালের কানে এসেছে সব কথাই। সমাজসুধ সবাই একদিকে হলে শুধু টাকার জোরে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা কঠিন, একথা স্বামীস্বী দুজনেই সমস্ত রাত জেগে আলোচনা করেছেন। দুজনে একমতও হয়েছেন এ বিষয়ে।

ক্রমে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে এলো।

দু'তিন দিন ধরে সমাজপতিরা ঘোরতর উত্তেজিতভাবে জটলা ক'রে অবশেষে দিন ঠিক ক'রে ফেললেন। নটবর সান্ত্বালকে চরম পত্র দেওয়া হল তাঁদের সামাজিক বিচারালয়ে উপস্থিত হতে। অপরাধীকে তাঁরা যথেষ্ট-সময় এবং সুযোগ দেবেন—তাঁদের নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত যদি তিনি মেনে নেন। না মানলে তার ফল কি হবে তা তাঁকে শোনানো হবে। তিনি এ সমাজে যাতে বাস করতে না পারেন তার সফল এবং অব্যর্থ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে—শুধু একঘরে হবেন তাই নয়।

সভায় সবাই উপস্থিত হয়েছেন।

ঘড়ি দেখছেন সবাই, সময় হয়ে এসেছে। মুখার্জি ও চক্রবর্তী হয়েছেন মুখপাত্র। ষা কিছু বলবার প্রথমে তাঁরাই বলবেন। নটবর সান্ত্বাল রণসাজে সজ্জিত হয়েই আসবেন এটা তাঁরা এক রকম ধরেই নিয়েছেন।

কিন্তু এত আয়োজন বৃথা হল। এ কি ব্যাপার ?

নটবর সান্ত্বাল এলেম চোবের মতো।

ঘাবড়ে গেলেন সবাই। আক্রমণের জোর কমে এলো।

মিস্টার চক্রবর্তী সংক্ষেপে বললেন, “ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সামাজিক”—

মিস্টার মুখার্জি বাক্যটাকে আরও একটু এগিয়ে দিয়ে বললেন, “সমাজের দিকে থেকে”—

কথাটা আর শেষ করা হল না। নটবর বললেন, “ধা হয় ব্যবস্থা করুন, আমি রাজি।”

সমাজপতিরা বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিছু মনঃক্ষুণ্ণও বটে, কিন্তু হঠাৎ বুঝতে পারলেন, এ তো তাঁদেরই জয়। নটবর সান্ত্বাল তাঁদের সঙ্গে লড়াই করতে আসেন নি, পরাজয় স্বীকার করতে এসেছেন।

তখন আনন্দে এবং বিজয়গর্বে তাঁরা প্রায়শ্চিত্তের আগেই নটবরকে জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগলেন।

মিস্টার চক্রবর্তী বললেন, “দেখুন তো সামান্য বিলেত যাওয়া নিয়ে কি কাণ্ডটাই করলেন এত দিন। সবাই যাচ্ছে, শুধু আপনি জেদ করে বসে আছেন!”

নটবর সামান্য বললেন, “ব্যবস্থা করুন তবে। কি করতে হয় কিছুই তো জানি না।”

মিস্টার মুখার্জি বললেন, “কোনো ভাবনা নেই, পাসপোর্টের ব্যবস্থা, স্টুট তৈরি সব আমরা করিয়ে দিচ্ছি। টাকা আছে আপনার, বিলেত ঘুরে এসে স্নাতে উঠুন, মাথা উচু করে চলুন, নইলে আমরা যে লজ্জায় মারা যাই।”

মিস্টার মিত্র বললেন, “এক সঙ্গে থাকতে হচ্ছে, অথচ আপনাকে বন্ধু বলে পবিচয় করতে কি লজ্জাই পেয়েছি এতদিন।”

মিস্টার দত্ত বললেন, “স্বামী স্ত্রী মিলে মুরগী খাওয়াটা অভ্যাস করে ফেলুন আজ থেকেই।”

একটা আনন্দ কোনাহলে বৈঠকখানা মুখরিত হয়ে উঠল। মিসেস মুখার্জি কোথেকে একটা মুরগীব কাটলেট এনে নটবরের হাতে দিয়ে বললেন, “খান।”

মিসেস চক্রবর্তী বললেন, “বিলেত ফেরৎ গোঁড়াদের সমাজে বাস করে বিলেত যেতে রাজি না হওয়া একটা উচ্ছ্বলতা, একটা মস্ত বড় অফেন্স।”

মিস্টার দত্ত বললেন, “গোঁড়ামিটা থাকা ভাল সমাজের পক্ষে, ওটাই হল তার বাঁধন, কথাটা আশা করি আর ভুল হবে না নটবরবাবু।”

নটবর সামান্য বিকৃত মুখে কাটলেট চিবোতে চিবোতে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন—ভুল হবে না।

## বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ

নায়েবী আর নবাবীতে যে কালে কোনো তফাৎ ছিল না, সেই কালের মানুষ তারিণী রায়।

তারিণীও নায়েব ছিলেন এক জামিদারের, অথচ মাসিক বেতন ছিল মাত্র ত্রিশ টাকা। এই টাকায় তিনি দেশের গ্রামে মস্তবড় দোতলা বাড়ি করেছিলেন, অনেক টাকার মালিক হয়েছিলেন। এবং তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী নায়েবী আসলে নবাবীরই নামান্তর ছিল। পাকী অথবা ঘোড়া ভিন্ন চলতেন না, হুকুম ভিন্ন কণ্ঠে অণ্ড কোনো ধ্বনি ফুটত না, মদ ভিন্ন পাকস্থলীতে অণ্ড কোনো পানীয় নামত না। বুদ্ধি ছিল পাকা, এবং সে বুদ্ধির প্রায় ষোল আনাই শয়তানের কাছ থেকে পাওয়া। চিরজীবন কেবল নিয়েই এসেছেন, দেননি কাউকে কিছু। অবশ্য একটি জিনিষ দিয়েছেন তিনি অনেকবার—প্রজার ঘরে আশুন। প্রজাদের জন্ত বাজনার ব্যবস্থাও করেছেন—নিলামের ডিক্রীজারীর সময়।

কিন্তু কালের এমনি গতি—এ হেন তারিণীকেও একদিন ঘোর দুর্দশায় পড়তে হল, আর সেও বয়স যখন সত্তরের কোঠায় সেই সময়। যে সূয়ের তাপে তিনি তপ্ত হয়েছিলেন, বাংলাদেশের সেই সূর্যসমাজের তেজ কালক্রমে নিবে যাওয়াতে তারিণীর তাপও দ্রুত কমে এলো। আধুনিক কালটাই বড় ভয়ানক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যায় না। চোখ রাঙিয়ে কাজ চলত যখন, এখন সে যুগ অতীত।

তারিণীর নগদ টাকা যা ছিল তাও অতিলোভে পরহস্তগত, চক্রবুদ্ধির চক্রটা হঠাৎ অচল হয়ে পড়ল, কোনোটাই আদায় হল না। শেষকালে জমি পুড়িয়ে পুড়িয়ে কৃত্রিম তাপ বজায় রাখতে হল কিছুকাল, তারপর তারিণী আর নায়েব নয়, নবাব নয়, একেবারে নবু হবুর মতো সাধারণ মানুষ। শুধু বুদ্ধিটিতে ছিল জীবনস্বত্ব, সেইটি রইল হাতে, যদিও তাঁর নিজের ধারণা বুদ্ধি থাকলে তাঁর এ দুর্দশা হত না।

দুর্দশা তাঁর সত্যিই হয়েছিল, খাওয়া জ্বোটে না এমনি অবস্থা। একমাত্র পুত্রকে লেখাপড়া শেখাননি, পৈতৃক জুতোয় পা ঢুকিয়ে নবাবী করবে আশা ছিল। ভাগ্যক্রমে সেই পুত্রও এখন দায় স্বরূপ হল, উপরন্তু পুত্রের এক কণ্ঠার বিষের বয়স হওয়ায় সমস্তা গুরুতর হয়ে দেখা দিল।



টাকা ভিন্ন সে মেয়ে অচল। যে কোনো উপার্জনকর আধুনিক যুবক কিছু লেখাপড়া জানা মেয়ে চায়, টাকার প্রসন্ন তো আছেই। টাকার অভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূরণ করা চলে রূপের দ্বারা, গুণের দ্বারা, কিন্তু সেদিকে পথ বন্ধ। এদিকে মেয়ের বয়স চলেছে বেড়ে, ঘরে রাখা আর চলে না। কাছাকাছি ভাল ছেলে অনেক আছে, তারা নিঃস্বার্থ কাজ অনেক ক'রে থাকে, কিন্তু বিয়ের বেলায় কোনো ছেলে অকারণ বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে চায় না। এমন কি ভূতো নামক যে যুবকটি যে-কোনো দুঃসাহসিক কাজে সর্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সেও বিবাহ বিষয়ে স্বাধীন নয়। ছেলেটি ভাবপ্রবণ অত্যন্ত বেশি, ভাবের তারটি চড়া স্বরে বেঁধে দিলে তার অসামান্য কাজ নেই, একেবারে খাটি বাঙালী। অথচ সময় কালে দেখা যায় তারিণী রায়ের প্রায় পায়ে ধরাকেও সে বেশ এড়িয়ে যেতে পারে। তারিণীর নবাবী কণ্ঠে হয়তো মর্মস্পর্শী স্বর বেরোয় না।

বহুর খানেক ধরেই তারিণী এই ছেলেটিকে নানাভাবে ভঙ্গিতে চেষ্টা করে আসছেন, তার বাবার কাছে বার্থ হয়ে তার কাছেই আবেদন জানাতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু কাছে গেলেই সে পালিয়ে যায়।

তারিণীর বুদ্ধি সত্যিই ভেঙে পড়ার মুখে। অবশেষে আর কোনো উপায় না দেখে তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করলেন।

আত্মহত্যার জ্ঞান নয়। যাদের তিনি এতকাল সামাজিক মর্ষাদায় ছোট বলে জেনেছেন তাদের কাছে এই পরাজয় সত্যিই মর্মান্তিক। সোজা পথে কাজ হবে না, অথচ বক্র পথটিও যে কি তা বুদ্ধির অতীত। মন গলানোর ভাষা তাঁর জানা নেই। বুদ্ধির পথেই আরও একবার চেষ্টা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই রুদ্ধভাবে রুদ্ধপথের প্রবেশ মুখ খুঁজতে তিনি সুদীর্ঘ বারোটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন। পরদিন সকাল বেলাই বিদেশ যাত্রা। হয়তো কোনো পথের সন্ধান তিনি পেয়েছেন।

তিনদিন পরে তারিণী রায় যখন ঘরে ফিরে এলেন তখন তাঁর এক আশ্চর্য পারবর্তন দেখা গেল। যেন মুমূর্ষু লোকটি হঠাৎ নতুন জীবন লাভ ক'রে ফিরে এলেন। একেবারে শুভশ্রী শীঘ্রম যাকে বলে—বিয়ের নাকি আর মাত্র সাতদিন বাকী। খুব উৎসাহের সঙ্গেই তিনি সব জায়গায় প্রচার করতে লাগলেন নাতনীর বিয়ের কথা। কিন্তু পাত্রটি'য়ে কে তা কেউ জানতে পারল না, বাড়ির লোকেও না। তবে এইটুকু জানা গেল পাত্রের বয়স একটু বেশি, কিন্তু উপায় কি ?

বয়স বেশি, কত বেশি? সবাই প্রশ্ন করে।

তারিণী বলেন পঞ্চাশ পেরিয়েছে, তবে দেখতে চল্লিশ। ভাল পাত্র। তৃতীয় পক্ষ হলেও আগের দুপক্ষের মাত্র কয়েকটি মেয়ে আছে, ছেলে নেই। অবস্থা ভাল, দুবেলা দুটো খাওয়া জুটে যাবে, না খেয়ে মরবে না মেয়ে।

তুনে প্রবীণেরা মুখটিপে হাসেন, তরুণেরা উৎকর্ষ হয়, উত্তেজিত হয়।

বিয়ের দিন চলে এলো।

বর পূর্বদিন সন্ধ্যায় আসবে, দূরের গ্রাম্যপথ, একদিন হাতে থাকা ভাল। গ্রামের এক আশ্রয়ী ঠাঁর বাড়ির এক অংশ ছেড়ে দিলেন, এবং বর ও বরমাত্রীরা এসে পৌঁছল ষণ্ম সময়ে।

তারিণী রায় একটু হাতে রেখে বলেছিলেন, কারণ বরের বয়স খুব কম করেও পয়ষষ্টি বছর, দাঁত নেই, চুল সমস্ত পাকা, লোলচর্ম, লাঠিতে ভর দিয়ে চলে, চোখ দুইটি ঘেন কাচের তৈরি, চশমাতেও ভাল দেখতে পায় না।

কিন্তু তবু বিয়ে বাড়িতে কি উৎসাহ, ছুটোছুটি আর হৈ হলো। কিন্তু সে উৎসাহ শুধু তারিণীর একার। বর দেখে সবাই দমে গেছে, প্রকাশে বলাবলি করছে মেয়েকে বিষ দিলেই ভাল হত এর চেয়ে। তারিণী রায়ের উপর যাবা অত্যন্ত চটা ছিল, তারাও তার নাতনীর কথা ভেবে দুঃখ করতে লাগল।

তারিণী রায় সহাস্তে বলেন, তা বিয়ে আর মনের মত হয় ক'জনের? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা না করলে চলবে কেন? বরের বাইরেটা দেখেই বিচার কর কেন, মেয়ে সুখে থাকবে।

যুবক মহলে চাঞ্চল্য জাগে। তাবা উত্তেজিত হয়, বলে, বুড়োকে এইখানেই মাঝে করে দিই, কোথাকার এক মড়া ধরে এনেছে শ্মশান থেকে, তারিণী বাম্ব গিলাচ—ইত্যাদি।

কিন্তু বিয়ের লগ্ন দ্রুত এগিয়ে আসে। ভূতো অস্তুরালে দল পাকায়। এ বিয়ে ভাঙতে হবে যেমন ক'রে হোক।

এমন সময় শাঁখ বেঞ্চে ওঠে, উলুধ্বনিতে বিবাহসভা মুখরিত হয়, বর বিয়ের বেশে প্রস্তুত হয়ে আসে।

বিবাহ সভায় শুধু মেয়েদের আর বুড়োদের আনাগোনা, কান্নের লোক, ছুটোছুটির লোক একটিও নেই, একটি যুবকেবও দেখা নেই, এক অস্বাভাবিক আবহাওয়া। প্রলয়ের আশঙ্কায় চারিদিকে যেমন শাঁখ বেঞ্চে ওঠে, তেমনি শাঁখ বাজছে মেয়েদের মুখে, করুণ স্বরে। মেয়েটি কাঁপছে থর থর করে। মেয়ের বাবা ঘরে দরজা বন্ধ করেছে। মেয়ের মায়ের দুচোখ বেয়ে জল ঝরছে অবিদ্যায়।

এমন সময় সত্যই প্রলয় নেমে এলো। এতক্ষণের অদৃশ্য ঘূর্ণকোয়া লাঠি হাতে হকার ছাড়তে ছাড়তে এসে হাজির সভাস্থলে। ভীত তারিণী রাঘ এক লাঞ্চে গিয়ে বরকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে বাঁচাবার জন্য।

ভূতো বলল, এ বিয়ে হতে পারে না। আপনি ছাড়ুন বুড়াকে, ওকে খুন করব আমরা।—ভূতোর সঙ্গীরা সে কথাব প্রতিধ্বনি করল।

মেয়ে বিধবা হবে ?

বিয়ে এখনও হয় নি, চালাকি শুনব না।

তারিণী রাঘ বললেন, তার চেয়ে আমাকে মারো তোমরা।—বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

তারিণীর জীবনে বোধ হয় এই প্রথম কারা, কিন্তু এর জন্ত তিনি তৈরি ছিলেন আগে থাকতেই। কান্দতে কান্দতেই তিনি বললেন, আমার সর্বনাশ করবে তোমরা ? এ মেয়েকে এখন কে বিয়ে করবে ?

ভূতো বলল, সে ব্যবস্থা আমরা করছি।

কানাই বলল, আপনি বুড়াকে দূর করুন। কিন্তু সেজন্ত অপেক্ষা না করে সমীর তারিণীকে ও বরকে এক ধাক্কাই সরিয়ে দিয়ে ভূতাকে সেখানে দাঁড়াতে ইমারা করল।

কানাই চিন্তার ক'রে বলল, বিয়ের নিমন্ত্রণে বরের 'রামশরণ দত্ত' এই ভুল নাম বলা হয়েছিল, বরের নাম ভূতো—অর্থাৎ ভূতনাথ সরকার।

ভূতো কিন্তু চমকে উঠল এ কথা শুনে, কারণ সে এর ধ্বংসমূলক দিকটিই ভেবেছিল, গঠন মূলক দিকটি ভাববার সময় পায় নি, কিন্তু কানাই যথাসময়ে তার নামটি উচ্চারণ করে তাকে আর অন্য কিছু ভাবতে দিল না। বর সেজে দাঁড়ানোর জন্ত যতখানি উত্তেজনা দরকার, কানাই বুঝতে পেরেছিল ঠিক ততখানি উত্তেজনা ভূতোর মনে ছেগেছে, তাই মস্তুর মতো কাজ হয়ে গেল। ভূতো লাঠি ফেলে এক লাঞ্চে এসে দাঁড়াল মেয়ের পাশে।

সেই মুহূর্তে সেই পরিত্যক্ত লাঠিখানা ভূতোর বাবা হস্তগত করে পুত্রের শির লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে লাগলেন, কিন্তু ছেলেরা সহজেই তাঁর হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিল। এবং দলের আর কয়েকজন তাঁকে জাপটে ধরে রাখল, তিনি নিফল আক্রোশে গর্জাতে লাগলেন।

হঠাৎ বিবাহসভায় রোমাঞ্চ জাগল। একটা নাটকীয় চরম দৃশ্যের অনিশ্চিত পরিণামের জন্ত সবাই দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। সবাই উন্মূখ, সবাই মুখ উজ্জল।

পুরোহিত যুবকদের ইচ্ছিত পেয়ে মন্ত্র পড়াতে আরম্ভ করল। সভাস্থল সত্যকার আনন্দ কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল।

পরদিন তারিণী এবং রামশরণের মধ্যে নিভৃতে নিম্নলিখিতরূপ আলাপ হচ্ছিল—

রামশরণ। নাতনীর বিয়ের জন্ত এই শ'খানেক টাকা ষোগাড় ক'রে এনেছি, নে রেখে দে।

তারিণী গদগদভাবে টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বললেন, উপযুক্ত বন্ধুর কাজ করেছিস তুই।

রামশরণ। কিন্তু ছোকরারা মেরে ফেলেছিল আর কি। তোর ঘটসব কাণ্ড, কিন্তু প্যাঁচটা ভগবানের আশীর্বাদে খেটে গেল তাই রক্ষে।

তারিণী। কিছু মনে করিসনে ভাই, নিরুপায়ের ঐ একটি মাত্র পথই ছিল।

রামশরণ। কিন্তু ছোকরারা যদি এগিয়ে না আসত ?

তারিণী। সম্বন্ধে নাতনী, চলে যেত এক রকম, কি বলিস ? কিন্তু আমি জানতাম ভূতো আসবে।

## আমাদের “জন্মস্বত্ব”

“বাঙালী কোনো দিন কোনো অগ্নায় সহ্য করেছে ? করেনি। বাংলাদেশের অংশবিশেষ বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যখন, তখন বাঙালী তা সহ্য করেছিল, কারণ দেশ তখন ছিল ইংরেজের। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেই অগ্নায় সে আর মানতে প্রস্তুত নয়। তার আরও কারণ”—

প্রথম বক্তা কথা শেষ না করতেই দ্বিতীয় বক্তা বলল—“জানি, বিহারে থেকেও বাঙালী এতদিন বাংলা ভাষায় পড়াশোনা করতে পেরেছে, কথা বলতে পেরেছে, কিন্তু আর পারছে না। এখন তাদের উপর জোর ক’রে হিন্দিভাষা চাপানো হচ্ছে, এত বড় অগ্নায় বাংলাদেশ সহ্য করবে না।”

১৯৪৭ সনে বাংলাদেশ উত্তেজিত। সর্বত্র সভা বসছে এবং এই জাতীয় বক্তৃতা হচ্ছে। বই ছাপা হচ্ছে শত শত। বাঙালীদের মধ্যে এমন একতা ১৯০৫-এর পরে আর দেখা যায় নি। বাংলা ভাষার প্রতি সবার মমতা হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে। শিক্ষিত বাঙালী বলছে এমন ইন্জাষ্টিস্ আমরা টলারেট করব না। নেভার। বাংলা ভাষায় কথা বলা আমাদের বার্থরাইট, এই বার্থরাইটে হাত দেয় কে ?

কি উত্তেজনা এবং আবেগ। শুধু সভা নয়, তার সঙ্গে শোভাযাত্রা। শুধু যে দিন ভাল খেলা থাকে অথবা নতুন সিনেমা ছবি (বাঙলা অথবা হিন্দি) আরম্ভ হয়, শুধু সেই দিনটা শোভাযাত্রা বাদ যায়।

ওদিকে হিন্দি প্রচার দিনের পর দিন যত জোরালো হয়ে উঠতে লাগল, এ দিকের উত্তেজনা বাড়তে লাগল ঠিক সেই পরিমাণে। বিখণ্ডিত বাংলাদেশ। আশ্রয়প্রার্থীর জায়গা হয় না। আমরা আমাদের হারানো সীমা ফিরে পেতে চাই। আমরা যা চাই তা দিতেই হবে, এ কি মগের মূলুক পেয়েছ বাছাধনরা ? বেদখল করলেই হল ?

দাবীর যেমন জোর, কলমের জোর তেমনি। পুস্তিকার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। আশ্চর্য গবেষণা, নিভুল হিসাব। এই সব পুস্তিকা পড়লে জানা যাবে আমাদের কত বর্গমাইল জমি বিহার দখল ক’রে আছে, তাতে কত বাঙালীর বাস, শতকরা কত জন বাঙলা বলে এবং তাদের উপর জোর ক’রে হিন্দি চাপানোয় তাদের শতকরা কতজন এই ধর্মাস্তর গ্রহণের দুঃখ ভোগ করেছে।

এ সব অকাট্য সত্য কথা। প্রতিবাদ চলে না। মাতৃভাষা ভুলিয়ে দেওয়া পাপ।

কিন্তু কোনো প্রতিবাদ শোভাযাত্রাই আধ-মাইলের বেশি দীর্ঘ হয় না, তার গতিও কয়েক মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কলকাতা শহরের সীমা ছাড়িয়ে তা সিংহার সীমানা স্পর্শ করে না। তাই বিক্ষোভের ধ্বনি শহরের হাওয়ান্ন মিলিয়ে যায়, মুদ্রিত পুস্তিকা ঘরে জমতে থাকে, বিহার নিশ্চিন্ত থাকে, নতুন শক্তি লাভ করে। এমনি ক'রে কাটে বছরের পর বছর।

এলো ১৯৫০।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষ্য করছিল সব। কিছুদিন থেকেই সিণ্ডিকেটের গোপন সভা বসছিল। হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে ফেল করিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ধ্বংস আসন্ন হয়ে উঠেছে এইবারে তার পূরণ হতে পারবে এমন সম্ভাবনার কথা সভায় আলোচিত হল। এবং তার পরেই দেখা গেল বাংলার বাইরে বাঙালীর সংখ্যা, তাদের ভাষা, তাদের ইতিহাস, তাদের ভূগোল এবং মোট কত প্রবাসী বাঙালীর বাংলা ভাষায় পড়াশুনা করার অধিকার, এই বিষয়ে এম-এ পরীক্ষা নেবার জন্য পৃথক একটি পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ খোলা হয়ে গেছে। বিষয়ের নাম হয়েছে আর-এল-বি অর্থাৎ “রিক্র্যামেশন অব লস্ট বেঙ্গল।” অন্যান্য এম-এ বিষয়ের মতো এরও প্রশ্নপত্র আটটি। যে সব পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে তাদের নাম—

“Fundamental Rights of the Bengalis outside Bengal”  
 “What Bengal lost to Pakistan shall gain in Purnea and Manbhum” “Despite Partition we are still seven crores”  
 ইত্যাদি।

এই বিষয়টি এম-এ পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শুধু যে লোকসান এডিয়েছে তাই নয়, তার উদ্ভূত টাকার পরিমাণ এত হয়েছে যে সে পৃথক একটি ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবসা চালাবার আয়োজন করছে। আর শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, পুস্তক প্রকাশকদের ভাগ্য ফিরে গেছে এই সঙ্গে, বিশেষ ক'রে মোট প্রকাশকদের। কারণ রিক্র্যামেশন অব লস্ট বেঙ্গল-এ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা লাগের কাছে। সমস্ত মারমুখী গ্রাজুয়েট দলে দলে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। এমন কি ছোট প্রকাশকেরাও “বেঙ্গল বাউণ্ডারি এন্সটেনশন মেড ইঞ্জি” “বেঙ্গলী ফর দি বেঙ্গলীজ ইন ওয়ান আওয়ার” “আওয়ার বার্থরাইট অ্যাট এ গ্যান” জাতীয় সব বাণের সাঁকো বাঁধছে পরীক্ষা বৈতরণী পারের বাজীদের জন্য।

১৯৫৫ সনের মধ্যেই বাংলাদেশের দ্বিতীয় লোক বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাংলার অংশ, বাঙালীর সংখ্যা এবং এ সম্পর্কে হাজার রকম তথ্য মুখস্থ ক'রে ফেলল। বাঙালী মাত্রেই এখন হয় এম-এ ( আর-এল-বি ), অথবা রিক্রামেশন অব লস্ট বেঙ্গল" বিষয়ের জ্ঞানে তাদের সমান। এখন তারা শোভাযাত্রা বের করে না, কিন্তু আর-এল-বি বিষয়ে দ্বিতীয় তথ্য গড় গড় ক'রে মুখস্থ বলে যেতে পারে। এখন তারা তাদের সংস্কৃতি বৈঠকে ( সংখ্যা অগণিত ) বসে মানে একবার ক'রে হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে আলোচনা করে। তার পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন ইতিহাস এই—

প্রথম পর্যায় ; ভাষার ভিত্তিতে দেশের সীমানা পুনঃস্থির নীতি কংগ্রেসেরই নীতি। অথচ ষত দিন যাচ্ছে ততই দেখছি এই নীতির বিপরীতটাই ঘটছে। বিহারের যে ভাগে বাঙালীরাই বাস করে সেটা তো বাংলাদেশেরই অংশ, সেখানকার মাতৃভাষাও বাংলা। এই মাতৃভাষার উপর জোর ক'রে হিন্দি চাপানো আমরা সকল শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পর্যায় : ( প্রতিবাদ সভা আরও বড় ) আমাদের ছাতভাইদের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাদের উপর জোর ক'রে হিন্দি চাপালে সে হোবে না। এ অন্তায় আমরা মানবে না। যেমন ক'রে হোক লোডাই ক'রে হোক বাঙালীর জন্ম সোহো বজায় রাখতে হোবে। প্রোভিনশিয়াল ঝগড়া হোবে, ভাই মাথ ভাই লোড়বে 'আপ্রাণ' লড়বে, তবুভি ছোড়বে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্যায়ের ( ১৯৬০ সনের ) সভায় হঠাৎ ব্যতিক্রম দেখা গেল। যে সভা ঘরে চলছিল সেই সভা বসল ময়দানে মনুমেটের নিচে। বিরাট সভা, বিরাট খরচ, কিন্তু এত টাকা বাঙালী কোথায় পেল ? আর এটাই হল তার শেষ পর্যায়। তারা বলল :

"কেও, কেও, কেও হাম হুয়ে জবরস্তি বরদাস্ত করুগা ? আংরেজ নে কেরবনাজি করকে মেরা দেশ হুসরা কো দে দিয়া খা। লেকিন আজ যব আজাদি কি হাওয়া বহনা শুক কী হায় তব কেও হামারা মুনুক মেরি মাতৃভূমি মেরা দখলমে নেহি আওগে ? হাম লডুংগা, জ্ঞান কবুল লডুংগা, আওর যো যো হামারা দৌলত হজম করনা চাহতা হায় উন্সে ছিন্ লুংগা। হাম বাংগালীও জ্ঞান কুব্বান করুংগা পর দেশ কভি নেহি ছোডুংগা।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শক্ররা রটাচ্ছে, বেহারের লোকেরাই বাঙালীদের এই আন্দোলনের সমস্ত খরচ জুগিয়ে চলেছে নিয়মিত।

## স্বর্গীয় সমস্যা

বিশ্বকর্মা সবিনয়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মার কাছে এসে নিবেদন করলেন, “স্বর্গে, সিমেন্টের বড়ই অভাব ঘটেছে, এখন আর নবাগতদের জন্য নব উপনিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়, সাহিত্যিকদের উপনিবেশেই ওদের জায়গা করতে হবে।”

সিমেন্টের সত্যই অভাব ঘটেছিল। দেব সেনাপতির আদেশে স্বর্গের সুবৃহৎ দেবস্থানের জন্য চীনের প্রাচীরের মতো একটি রক্ষীপ্রাচীর সম্প্রতি গড়তে হয়েছে। এর কারণ মানবাত্মাদের স্বর্গবাসের উপযুক্ততা আগে যেমন কঠোরভাবে বিচার করা হত এখন আর তা হচ্ছে না। নানা স্বার্থের জ্বালান এখন স্বর্গে আসছে এবং এ বিষয়ে অনেকক্ষেত্রে মানুষের বিচারের উপরেই নির্ভর করা হচ্ছে। তাই আশঙ্কা, স্বর্গশাসনতন্ত্রে ডেমোক্রেসির দাবী প্রবল হলে হয়তো কালক্রমে দেবস্থান আক্রান্ত হতে পারে।

বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। চতুরানন তাঁর উত্তরদিকস্থ মুখে উত্তর দিলেন, “আমিও সেটা ভেবেছি। আর শুধু ভাবা নয়, কর্তব্যপথের বাধা যাতে দূর হয় সে চেষ্টাও অনেকখানি ক’রে ফেলেছি এর মধ্যে। সাহিত্যিকদের উপনিবেশেই ওদের স্থান হয়ে যাবে।”

এই একত্রবাসই বিশ্বকর্মার সাম্প্রতিক সমস্যা। সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই ব্রহ্মার সম্প্রতি নিতে চান। ব্রহ্মারও তাই ইচ্ছা ছেনে তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, “প্রথম গুণগোলটা কেটে গেলেই ওরা পরস্পরকে সহ্য করতে পারবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।”

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন, “যারা এসেছে তাদের সঙ্গে কি কি বস্তু আছে?”

বিশ্বকর্মা বললেন, “চালের বস্তা, চিনির বস্তা, সিমেন্টের বস্তা, তেলের টিন, আরও কত কি। কিন্তু হিরণ্যগর্ভ, কর্তব্যপথের বাধা দূর করা বিষয়ে কি ভেবেছেন শুনতে বাসনা।”

ব্রহ্মা বললেন, “শুনবে যদি তা হ’লে সরে এসো পশ্চিম দিকে। আমার উত্তরদিকস্থ মুখ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কদিন ক্রমাগত কথা বলে।”

বিশ্বকর্মা ষথাদিষ্ট সরে এলে ব্রহ্মা পশ্চিমদিকের মুখে বলতে লাগলেন, “কিছুদিন ধরে একটা গুহ্রব কানে আসছিল যে সাহিত্যিকরা তাদের সঙ্গে যে কীর্তি বহন ক’রে এনেছে তার মধ্যে ফাঁকি আছে। তাদের কীর্তির শতকরা আশী ভাগ না কি বাতিল হবার যোগ্য। সম্প্রতি আমি পৃথিবীতে দূত



পাঠিয়ে নিশ্চিত জানতে পেরেছি গুজব ভিত্তিহীন নয়, সত্য। হুতরাং তাদের বাতিল অংশ বাদ গেলে সাহিত্যিকদের উপনিবেশে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা হবে এবং সেখানে নবাগতদের জায়গা হয়ে যাবে।”

দেবশিল্পীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল একথা শুনে। তাঁর যেন একটা ফাঁড়া কেটে গেল। পৃথিবীর খবরের কাগজে চোরাকারবারীদের দুষ্কার্যকে ‘কীর্তি’ বলে প্রচার হবার পর থেকে যখনই চোরাকারবারী মারা যাচ্ছে তখনই তাদের স্মৃতিদেহ তাদের কীর্তির বোঝা নিয়ে স্বর্গে চলে আসছে, তাই স্বর্গের গৃহ সমস্তা প্রবল হয়ে উঠছিল। বিশ্বকর্মা নিকরপায় হয়ে পড়ছিলেন নানা কারণে। সিমেন্টের অভাবটাই তার মধ্যে প্রধান। কিন্তু ব্রহ্মার কথায় বোঝা গেল বিশ্বকর্মা কে আপাতত আর নতুন আশ্রয় শিবির গড়তে হবে না। তিনি খুশি ভাবে বললেন, “এখন সাহিত্যিকদের তোয়াজ্ঞ টোয়াজ্ঞ ক’রে রাজি করাতে পারলেই সব মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু ওরা যে রকম অভিমানী!”

ব্রহ্মা বলিলেন “আমি ওদের ডেকে বুলিয়ে দিচ্ছি। যদি বুঝতে পাবে ওরা অনায়াসে অনেকখানি জায়গা দখল ক’রে আছে তা হ’লে আর গণ্ডগোল করবে না। তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, লোকটি যুক্তির পথে চলতে ভালবাসে, একেই সব বুলিয়ে বলি।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন। স্বর্গে বাস ক’রে তাঁর চেহারা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, হঠাৎ দেখে মনে হয় স্বর্গেরই স্বায়ী বাসিন্দা কোনো দেবতা।

রবীন্দ্রনাথ নমস্কারান্তে সবিনয়ে বললেন, “আদেশ করুন, প্রজ্ঞাপতি।”

ব্রহ্মার পশ্চিম দিকের মুখও ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় দক্ষিণমুখে কথা শুরু করলেন। কবি বুঝতে পারলেন এটা দাক্ষিণ্যের মুখ, প্রসন্নতার মুখ, অতএব ভয়ের কারণ নেই কিছু।

ব্রহ্মা প্রশ্ন করলেন, “তুমি শাজাহান কবিতা লিখেছিলে মনে আছে?”

“অবশ্য আছে।”

“ওর মধ্যে এক জায়গায় লিখেছিলে—তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ, তাই তব জীবনের রথ পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার বারম্বার— মনে আছে?”

“মনে আছে।”

“ভুল বুঝতে পেরেছ?”

“মর্ত্যবাসীর এত সৌভাগ্য আগে কল্পনা করতে পারি নি, ভেবেছিলাম

কীর্তিমান কীর্তিকে পিছনে ফেলে একা স্বর্গে আসে। কিন্তু এখানে এসেই সে ভুল ভেঙেছে। কারণ আসামাত্র শাজাহান আমাকে বললেন ‘ঐ দেখ, আমার তাজমহলও আমার সঙ্গে এসেছে।’ বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হওয়া গেল না, দেখি আমার কীর্তিও পিছনে পড়ে নেই। আমার প্রথম বই থেকে শেষ বই সবই আমার সঙ্গে এসেছে, এবং সবগুলো সংস্করণ। ওর মধ্যে আগেকার সচিত্র চয়নিকা, পকেট কণিকা, জাপানী শোভন সংস্করণ সব আছে।”

“শেখপیارের ঘর দেখেছ ?”

“দেখেছি, পিতামহ। তাঁর সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন আলাপ হচ্ছে নাটক বিষয়ে। ভেরিওরাম এডিশনটা আমাকে তিনি দেখতে দিয়েছেন। কিন্তু আর বোধ হয় দেখা চলবে না, কারণ কয়েকজন চোর তাদের লটবহর নিয়ে আমাদের পল্লী দখল করতে চাইছে।”

ব্রহ্মা বললেন, “তাদের জয়গা দিতে হবে তো ? সুতরাং তোমাদের জায়গা কিছু ছাড়তেই হবে। অনেকখানি জায়গা তোমরা অশ্রদ্ধভাবে দখল ক’রে আছ। এতে অবশ্য তোমাদের ব্যক্তিগতভাবে কোনো দোষ নেই। তোমাদের কীর্তির মধ্যে যে এত ফাঁকি আছে তা আমিও আগে জানতাম না। সেই ফাঁকি সমেত সব চাল এসেছে তোমাদের সঙ্গে।”

কবি বললেন, “আমি তো আগেই বলেছি—‘রাত্রেব আধারে হায় কত সোনা হয়ে যায় মিছে, সে সব ফেলিয়া যাব পিছে।’ স্বর্গে আসার পরে দেখছি ফেলে আসা যায় না।”

ব্রহ্মা বললেন, “জানি, আর সে জন্ত তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে। তোমার কীর্তি যে তোমার সঙ্গে এসেছে সেজন্য তুমি অবশ্যই দায়ী নও, স্বর্গের বিধান দায়ী। কিন্তু সম্প্রতি আমি একটি সত্য আবিষ্কার করেছি এই যে তুমি এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের কীর্তি অতি সামান্য। যা সঙ্গে এসেছে এখন তার শতাংশও টেকাতে পারি কিনা বলা শক্ত।”

কবি বললেন, “কি ভাবে আবিষ্কার হল ?” বলে বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন চতুরাননের প্রতি।

চতুরানন বললেন, “বড় ক্লান্ত, পূর্ব দিকে এসো।” অতঃপর তিনি পূর্বদিগের মূণ থেকে বললেন, “চাক্ষুষ প্রমাণ দেখাচ্ছি। দূত”—

দূত এসে প্রণাম জানাল।

“পৃথিবী থেকে কি এনেছ দেখাও।”

ইতিমধ্যে দেখা গেল কালিদাস, শেখপীরার, মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ,

ব্রাউনিং, শেলী, কীটস, এবং আরও অনেকে তাঁদের সাহিত্যিক উপনিবেশ থেকে হস্তদস্ত হয়ে ছুটে আসছেন ব্রস্কার দিকে। চোরদের সঙ্গে থাকতে কেউ রাজি নন।

ব্রস্কা বললেন, “শান্ত হও তোমরা। জায়গা ছাড়তে হবে নবাগতদের জন্য। তোমরা এসে পড়েছ যখন, তখন সব প্রত্যক্ষ কর।”

দূত বিরাট এক বোঝা এনে নামাল তাঁদের সম্মুখে। বোঝাটি পুস্তকের।

ব্রস্কা শেক্সপীয়ারকে বললেন, “তোমার যে কোনো একখানা বই এর মধ্য থেকে নিয়ে খুলে দেখ।”

শেক্সপীয়ার যেখানা তুলে নিলেন সেখানা ম্যাকবেথ। খুলে দেখলেন মাঝে মাঝে পেন্সিলে চিহ্ন ঝাঁকা আছে, এবং চিহ্নের পাশে লেখা আছে **IMPORTANT.**

ব্রস্কা বললেন, “যে সব জায়গায় ইম্পরট্যান্ট লেখা আছে, মাত্র সেই অংশগুলো তোমার কীর্তি। তোমার ঐ পাঁচ অঙ্কের নাটকখানায় মাত্র ঐ অংশগুলো লিখলেই চলত, বাকীটা স্রেফ ফাঁকি। অবশ্য এই আবিষ্কারের গৌরব আমার নয়, তোমাদেরই কলেজের অধ্যাপকদের।”

রবীন্দ্রনাথ ফস ক’রে তাঁর একখানা কাব্যগ্রন্থ তুলে নিয়ে দেখেন, সেখানেও ঐ একই চিহ্ন। প্রত্যেকটি কবিতার চার লাইন থেকে ছ’লাইন মাত্র ইম্পরট্যান্ট। এরপর কালিদাস, ব্রাউনিং, শেলী, কীটস, টেনিসন সবাই কোতূহলী হয়ে নিজ নিজ বই খুলে দেখেন, ঐ একই ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হয়ে বললেন, “ভাব যেখানে গাচ হয়ে উঠেছে শুধু সেই স্থানটিই পৃথকভাবে কাব্য নয়, সমস্তটা মিলে একটা অখণ্ড কাব্য।”

শেক্সপীয়ার আশ্চর্যভাবে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

To-morrow and to-morrow and to morrow

(Creeps in this petty pace from day to day...

ব্রস্কা সেদিকে লক্ষ্য না ক’রে রবীন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললেন, “সমস্তটা মিলে অখণ্ড একটি কাব্য, ওটা তোমার কল্পনামাত্র। যারা পড়ায় এবং যারা গড়ে তারাই কাব্যের ষথার্থ জ্বরী। পরীক্ষার্থীরাও ঐটুকু মাত্র পড়েই পাস করে। অতএব ঐ খণ্ড অংশগুলোই তোমাদের কীর্তি। যে ফুল চায় সে গাছটাকে বাদ দেয়।”

রবীন্দ্রনাথ একটু চিন্তা ক’রে বললেন, “কিন্তু ফুল যে ফোটে তার পক্ষে গাছটাকেও যে গড়ে তোলা দরকার। ফুলের ব্যবসায়ী ফুল ছিঁড়ে নেয় বটে,

কিন্তু যে ফুল উপভোগ করতে চায়, সে ফুলের সঙ্গে গাছও পালন করে, এক ফুল ছেঁড়ে না।”

ব্রহ্মা স্বয়ং অষ্টা, তিনি ভাবতে লাগলেন কথাটা। তাঁর বিশ্বাস গাছটা সত্যই অবাস্তব। শুধু ফুল সৃষ্টি করলে চত। বাংলাদেশের কলেজীয় প্রভাব আর কি।

এদিকে রবীন্দ্রনাথের বৃকে এক দীর্ঘ নিখাস ঘনিয়ে এলো। তিনি মনে মনে বাল্যকালে লেখা কবিতাটি আবৃত্তি করতে লাগলেন—

“ ...শত ঋতু আবর্তনে শতদল উঠিতেছে ফুটি  
স্বতীক্ল বাসনা ছুরি দিয়ে তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?  
লগু তার মধুর সৌরভ  
দেখো তার সৌন্দর্য বিকাশ  
মধু তার কর তুমি পান  
চেয়ো না তাহারে।”

ব্রহ্মা আত্মগত ভাব থেকে জেগে উঠে বললেন, “ফুল গাছের কীর্তি, এ কথা মান তো ?”

রবীন্দ্রনাথ বললেন, “প্রজ্ঞাপতি, গাছই যেখানে অষ্টা, ফুল সেখানে তার কীর্তি। কিন্তু গাছকে যিনি সৃজন করেছেন তিনি ফুলের সঙ্গে গাছকে রাখতে বাধ্য। অতএব আপনার যুক্তিতে ভুল আছে।”

ব্রহ্মা সত্যই বুঝতে পারলেন কবির কথায় যুক্তি আছে। কারণ ঐ ইম্পরট্যান্ট লাইনগুলো কাব্য যদি নিজে সৃষ্টি করত, তা হ’লে, ঐ লাইনগুলো রেখে আর সব বাদ দেওয়া যেত। কিন্তু কবি হচ্ছেন সব খানির অষ্টা, তাই বাদ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাঁর গাছ বাদ দিয়ে ফুল ফোটার নোর কল্পনাটা নষ্ট হয়ে গেল, তিনি উদাসভাবে ভাবতে লাগলেন।

লেখকদের ভিড়ের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়িয়ে ছিলেন বারনার্ড শ। এতক্ষণ কেউ তাঁকে লক্ষ্য করেন নি। তিনি এতক্ষণ চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে ছিলেন একখানি বইও স্পর্শ না ক’রে, কিন্তু শান্তভাবে নয়, বন্ধমুষ্টি অবস্থায়।

ব্রহ্মার দৃষ্টি পড়ল তাঁর দিকে। তিনিও তাঁর এই অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য ক’রে বললেন, “তুমি বই দেখছ না কেন ? তোমার এ বকম হিংস্র মূর্তিই বা কেন ?”

বারনার্ড শ বললেন, “আমার একটি প্রার্থনা আছে।”

“কি প্রার্থনা ?”

“আমি বাংলাদেশে ফিরে যাবার অহুমতি চাই। মাত্র এক সপ্তাহের জন্য।  
দেবেন অহুমতি?”

ব্রহ্মা প্রশ্ন করলেন, “সেখানে কলম চালিয়ে কিছু হবে আশা করছ?”

বারনার্ড শ বললেন, “না, কলম নয়, বন্ধমুষ্টি চালাতে চাই।”

ব্রহ্মা তাঁকে স্নেহে বললেন, “তা আর দরকার নেই, এখানেই তোমরা  
শাস্তিতে থাক, তোমাদের উপনিবেশের সৌমান্য অন্বেষণ প্রবেশ নিষেধ করে  
দিচ্ছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালী নিজেই এক অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করেছে,  
তাতে বাংলা দেশের কলেজেও মহা শাস্তি বিরাজ করবে, কোনো গণ্ডগোল নেই,  
কোলাহল নেই, পাঠ নেই, পরীক্ষা নেই, ছাত্রও নেই, অধ্যাপকও নেই। কারণ  
শিক্ষা ওরা আর চায় না, ওরা পরস্পরকে শিক্ষা দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে,  
বোমার সাহায্যে। সুতরাং ইউরোপীয় মধ্যস্থতারও আর দরকার নেই।”

বারনার্ড শ কল্পনা করতে লাগলেন সেই অবস্থাটা। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে  
উঠল এবং ধীরে ধীরে বন্ধমুষ্টি খুলে গেল।

তখন সবাই মিলে ব্রহ্মাকে অভিনন্দন জানিয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেলেন।

## বাহান্ন সালের পূজা-সংখ্যা

রাজেন্দ্র তরফদার নামক এক প্রধান ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা তাঁর বৈঠকখানায় বসে একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছিলেন। ইনি কে এবং কেন ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছিলেন সে খোঁজে দরকার নেই। কিন্তু ইনি মহা এক অপরিচিত যুবকের আবির্ভাবে বিস্মিত হলেন কেন, দেখা যাক।

যুবক বিনীতভাবে তরফদার মহাশয়কে নমস্কার ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

তরফদার প্রশ্ন করলেন, কোথেকে আসছ ?

যুবক বলল, আসছি বালিগঞ্জ থেকে, একটি বিশেষ কাজে।

বিশেষ কাজটি কি ?

আজ্ঞে সেটা ঠিক প্রকাশ ক'রে বলবার মতো নয়, কাজটি অত্যন্ত তুচ্ছ। আমাকে আপনি দয়া ক'রে একখানি সুপারিশ পত্র যদি দেন—

চাকরির ?

আজ্ঞে না, শুনেছি যজ্ঞেশ্বর চাটুয্যে আপনার বন্ধু। তাঁর কাছে আপনার একখানি পরিচয়-পত্র চাই। তাঁর কাছে সোজা গিয়ে দেখা করা নাকি বডই কঠিন।

তোমাকে না চিনেই পরিচয় পত্র দেব কেমন ক'রে ?

আমার পরিচয় আমিই দিচ্ছি। আমি কবি।

যজ্ঞেশ্বর কবিতা পছন্দ করে বলে তো জানি না।

আজ্ঞে, তিনি পছন্দ না করলেও ক্ষতি নেই। তাঁর কাছ থেকেও একখানা চিঠি নেব আপনার চিঠি দেখিয়ে।

তোমার কি মতলব বল তো ?

যুবক একটু ইতস্তত ক'রে বলল, যজ্ঞেশ্বর বাবুর জামাই এবারে “দুঃখ নিশি ভোর” কাগজের পূজা সংখ্যার সম্পাদক। তাঁর কাগজে যদি আমার একটা কবিতার স্থান হয়।

কবিতা ছাপার জগৎ এত কাণ্ড করতে হয় না কি ?

আজ্ঞে আমরা উদীয়মান কবি, এ ছাড়া আর আমাদের গতি নেই।

সুপারিশ পত্র দেখালেও যদি না ছাপে ?

এবারে শ' খানেক বিশেষ সংখ্যা কাগজ বের হচ্ছে পূজা উপলক্ষে—কোনো না কোনোটাতে লেগে যেতে পারে।

একই সুপারিশ পত্রে ?

আজ্ঞে না। খান পঞ্চাশেক জোগাড় করেছি নানা কাগজের জগ্ন—  
যেখানে লেগে যায়।

তুমি কি বেকার ? সারা দিন এই করে বেড়াচ্ছ ?

আজ্ঞে বেকার নই। আমি এক অফিসে কাজ করি। কিন্তু ঘোরাঘুরির  
জগ্ন এক মাস ছুটি নিয়েছি বিনা বেতনে।

বল কি !

আজ্ঞে আমি একা নই, শহরের নানা অফিস থেকে অস্তুতঃ শ' পাঁচেক কবি  
আর গল্প লেখক আমারই মতো ছুটি নিয়েছে। না নিয়ে উপায় কি বলুন ?

বাজেস্ত্র তরফদার বিস্মিত দৃষ্টিতে যুবকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন,  
তাঁর দয়া হল এবং কাগজ কলম সংগ্রহ ক'রে সুপারিশপত্র লিখতে বসলেন।

২

“সূর্যোদয়” কাগজের পূজা-সংখ্যার সম্পাদকের ঘব। কাগজ প্রকাশ  
হতে আর মাত্র তিন সপ্তাহ আছে, কিন্তু সম্পাদক বিচলিত। যাদের গল্প না  
হলে কাগজ বের করা বৃথা, তাঁদের অধিকাংশেরই খোজ নেই এখনও।  
কবিতা বহু সংগ্রহ হয়েছে, কিন্তু গল্প নেই। আব একটু পরেই উদীয়মান  
কথাসাহিত্যিক ও কবির ভিড লেগে যাবে। তাদের ঠেকানো দুঃসাধ্য।  
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তারা এসে ভেঙে পড়ে। অধিকাংশের মুখেই ফেনা  
উঠে যায়, তারা সর্বত্র ঘুরে ঘুরে মাথা কুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোথায়ও তাদের  
স্থান নেই। সম্পাদক তাদের অনেকের লেখা পড়ে দেখেছেন—উৎকৃষ্ট সব  
লেখা। ভাল গল্পও অনেকে লেখে, ভাল কবিতাও লেখে, কিন্তু সেগুলো তো  
আর ছাপা যায় না। ছাপলে সেইগুলোতেই কাগজ ভর্তি হয়ে যায় এবং সে  
কাগজ পাঠ্য হিসাবে অবশ্য খারাপ হয় না। কিন্তু ছেপে লাভ কি ? কাগজ  
বিক্রি হবে না। পরিচিত লেখকের লেখা চাই। তাঁদেরও দাবী আছে পূজা-  
সংখ্যার উপর। বহু নিন্দা মাথায় বয়ে, বহু ঘা খেয়ে, বহু অপযশ সহ ক'রে,  
এতদিন তাঁরা শুধু স্বাস্থ্য ভাল বলে টিকে আছেন। যাদের স্বাস্থ্য ভাল নয়,  
ঘা খেয়ে যারা বিচলিত হয়েছেন, তাঁরা ইহসংসারে আর নেই।

সুতরাং পরিচিত লেখকদের স্থান দিতেই হবে পূজা সংখ্যায়। এবং তাদের  
স্থান দিতে গেলে নবাগতদের পথ বন্ধ। নবাগতদের মধ্যে যাদের স্বাস্থ্য ভাল

তারাত একদিন স্থান পাবে, সম্পাদক এই ভরসা দিয়ে তাদের বিদায় ক'রে দিচ্ছেন। কিন্তু বিদায় করা সহজ নয়। প্রাণ অতিষ্ঠ হয়। পথে দেখা হলে দলে দলে অহুসরণ করে। বাজারে গেলে সেখানেও ক্রেতাদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ত্রিশজন কবি বা গল্প-লেখক বাজার ফেলে সম্পাদককে চেপে ধরে। রাত্রে ঘুমোলে এসে ঘুম ভাঙায়।

“সূর্যোদয়” সম্পাদকের হাতে আর সময় নেই। “দুঃখ নিশি ভোর” কাগজের সম্পাদকেরও ঐ একই অবস্থা। ক-কাগজ, খ-কাগজ, গ-কাগজ প্রত্যেকের এক অবস্থা।

এবারের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির অর্থ কি ?

বার বার চিঠি দিয়ে এবং দেখা ক'রেও কোনো পরিচিত গল্প-লেখক এবারে এতদিনও গল্প পাঠাচ্ছেন না কেন ?

সমস্ত পূজা-সংখ্যা সম্পাদক উন্মাদপ্রায়—এ বকম বিপদের অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে তাঁদের কখনও হয় নি।

এক দিকে নতুন লেখকদের আক্রমণ, অন্যদিকে প্রার্থিত লেখকদের উদাসীনতা, এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে একশ পূজা-সংখ্যা সম্পাদকের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে উঠল। প্রতি গল্পের জন্য একশ টাকা দক্ষিণা কবুল ক'বেও লেখা পাওয়া যাচ্ছে না, এ কেমন কথা ?

অবশেষে আত্মরক্ষার শেষ পথই তাঁরা অবলম্বন করলেন। ঠিক করলেন, নিজেরাই লেখকদের বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকবেন, এবং লেখা না নিয়ে উঠবেন না। এর পরিণাম হল অতি মারাত্মক। সে কথা বলতে হলে গোড়ার কথা কিছু বলা দরকার।

### ৩

এক মাস আগের কথা। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই সব বোঝা যাবে। আমরা স্মবিধার জন্য একজন লেখকের কথাই উল্লেখ করব। পৃথকভাবে সবার দৃষ্টান্ত দেবার দরকার নেই, কারণ সম্পাদকদের মতো লেখকদেরও একই ইতিহাস।

গোবর্ধন তলাপাত্র পরিচিত গল্প লেখক।

রাত্রে তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

কিন্তু রাত তিনটের সময় কড়ানাডার শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

কে ?—গোবর্ধন নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।



আমি ক-কাগজের লোক, একটি গল্প চাই আপনার কাছে,—পূজা-সংখ্যার জন্ম।

গোবর্ধন দরজা খুলে বাইরে এসে প্রশ্ন করলেন, এই অসময়ে ?

ক-কাগজের লোক বলল, গল্প এবারে একটু আগেই দরকার কি না—পঁচিশটি টাকা সংগ্রহ করেই এনেছি। নানা জায়গায় ঘুরতে হবে, সময় পাব না, তাই একটু সকাল সকাল এসে পড়েছি। টাকাটা রেখে দিন, দিন সাতেক পরে এসে গল্প নিয়ে যাব।

কুড়ি টাকার বেশি একটি গল্পের জন্ম কোথায়ও পাওয়া যায় নি, এবারে অযাচিতভাবে কিছু বেশি পাওয়াতে গোবর্ধনের মনে পুলক জাগল। বললেন, সাত দিন পরেই আসবেন।—গোবর্ধন আবার গিয়ে শুয়ে পড়লেন, কিন্তু ঘুম হল না।

আঁধ ঘণ্টা পরে পুনরায় কড়ানাড়া।

এবারে খ-কাগজের লোক। অগ্রিম ত্রিশ টাকা নিয়ে এসেছে।

গোবর্ধন আর শুতে পারলেন না।

আরও পরে গ-কাগজ থেকে লোক এসে জানাল তাদের লেখাটাও খুব জরুরি, অগ্রিম ত্রিশ টাকা।

ঘ-কাগজের লোক পঁয়ত্রিশ টাকার প্রস্তাব নিয়ে এলো।

ঙ-কাগজের লোক এসে বলল, তাদের সম্বল অতি কম, মাত্র কুড়িটি টাকা তারা দিতে পারে।

গোবর্ধন বললেন, পূজোর পরে আসবেন, পারি তো দেব।

চ-কাগজ থেকে চল্লিশ টাকার প্রস্তাব এলো।

গোবর্ধন গল্প লেখা বন্ধ ক'রে বসে বসে শিস দিতে লাগলেন।

গোবর্ধনের ইতিহাসই সব লেখকের ইতিহাস।

শিস দিতে দিতে গোবর্ধন ভাবতে লাগলেন, এতদিন আমরা কি নির্বোধই ছিলাম। বসে বসে এতদিন চোরাবাজার মুনাফা শিকারীদের বিরুদ্ধে লিখেছি, অথচ তাদের কোশলটা আয়ত্ত্ব করতে পারিনি। এবারে পেয়েছি স্বেযোগ, এবারে চোখ খুলেছে। এ স্বেযোগ ছাড়া হবে না। এবারে শেষ দেখতে হবে।

‘আর্থিক ছুনিয়া’র সম্পাদক এসে প্রস্তাব দিলেন, আপনারা সব আমার আশ্রয়ে আসুন। শতকরা দশ টাকা কমিশন দেবেন, আমি বাজার দর আরও তেজি ক'রে দিচ্ছি।

গোবর্ধন এ প্রস্তাব খুশি হয়ে সমর্থন করলেন।

পয়সাদিন থেকে গল্পের বাজার দর 'আর্থিক দুনিয়া'র নিয়মিত ছাপা হতে লাগল। "অগ্ৰকার গল্পের দর চল্লিশ।" "অগ্ৰকার গল্পের দর আরম্ভ হয় চল্লিশে, বন্ধ হয় পঁয়তাল্লিশে।" "গল্পের বাজার দর আজ স্থির আছে।" "আজ গল্পের দর সহস্র চড়িয়া পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, মনে হইতেছে আরও চড়িবে।" "আজ গল্পের দর ষাট টাকা।" "আজ গল্প বিক্রি বন্ধ আছে, মনে হয় দর আরও চড়িবে।"

এই ভাবে চলল 'আর্থিক দুনিয়া'র অভিযান। লেখকেরা এই কাগজের দিকে চেয়ে ফেঁপে রইলেন, গল্প কাউকে দিলেন না। ক্রমশ দর একশ টাকায় গিয়ে দাঁড়াল।

কোনো প্রবীণ ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে লেখকদের কাছে প্রস্তাব করেছিল, সব গল্প সে একা কিনে নেবে এবং ব্ল্যাকমার্কেট ক'রে দর আরও চড়িয়ে দেবে, কিন্তু 'আর্থিক দুনিয়া'র সম্পাদকের তাতে মত না থাকাতে উক্ত ব্যবসায়ী গল্পগুলো হাত করতে পারেনি।

## ৪

'আর্থিক দুনিয়া'র গল্পের বাজার দর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকেরাও উদ্গ্রীব হয়ে প্রতিদিন সে দিকে লক্ষ্য ক'রে যেতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তাঁরা লেখকদের কাছে গিয়েছেন কিন্তু লেখকেরা কোনো মতেই গল্প হাত ছাড়া করেনি। তারপর যখন বাজার দর একশ টাকা উঠল, তখন সম্পাদকেরা আরও একবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তবু কিছু হল না। এর বেশি গেলে তাঁদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে।

অবশেষে তাঁদের যেতেই হল লেখকদের বাড়িতে। এইবার শেষ চেষ্টা।

ক-সম্পাদক প্রথমে গেলেন গোবর্ধনের কাছে। গিয়ে দেখেন তার আগে অন্তত পঞ্চাশ জন সম্পাদক সেখানে উপস্থিত হয়েছেন, এবং আরও সবাই আসছেন একে একে।

ক-সম্পাদক গিয়ে শুনে পেলেন, গোবর্ধন ইতিমধ্যেই অন্য সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। তিনি বলছেন, এই যুদ্ধের সুযোগে গত ছ-বছর ধরে ব্যঙ্গসায়ীরা লাখ লাখ টাকা লাভ করেছে, অথচ আমরা ব্যবসায়ী হয়েও কিছুই করতে পারিনি। ভবিষ্যতেও কখনও পারব না।

খ-কাগজের সম্পাদক বলছেন, সে কথা ঠিক, কিন্তু আমরাও তো লেখার

দাম অসম্ভব রকম বাড়িয়ে দিয়েছি এ বারে, এখনও গল্প ছাড়তে আপত্তি করছেন কেন ?

আপত্তি করছি কেন ? যুদ্ধ কি আর কখনও হবে ? যুদ্ধ থেমে যাবার মুখে যে যেভাবে পারছে লুঠে নিচ্ছে । আমাদেরই এক টাকার বই বাজারে চার টাকা ক'রে বিক্রি হচ্ছে অথচ আমরা জানিনা । যে কোনো ব্যবসার দিকেই দেখুন, কেউ ছাড়ছে না কাউকে । এমন কি ডাক্তারেরাও যে-কোনো অস্থানে অপারেশন চালাচ্ছে—ম্যালেরিয়া জ্বরেও চালাচ্ছে, সর্দিতেও চালাচ্ছে । আমরাই কি বাজারের একমাত্র ওঁছা ব্যবসায়ী যে দু-পয়সা লাভ করলেই অপরাধ ?

ক-সম্পাদক মরীয়া হয়ে এসেছেন । তাঁর গায়েও যেমন শক্তি, মনেও তেমনি সাহস । তিনি আজ আর কোনো যুক্তি শুনবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ।

খ-সম্পাদককে ঠেলে দিয়ে তিনি এগিয়ে গোবর্ধনের মুখের উপর গিয়ে বললেন, শুনুন আমি শেষবার জানতে এসেছি আজ আপনার গল্প পাব কিনা ।

গোবর্ধন বললেন, আজকের বাজার দর না দেখে ছাড়ব না । একশ টাকার উপরেও কিছু আশা করছি এ-বেলা ।

“আমি আশা করছি অণু রকম”, বলে ক-সম্পাদক গোবর্ধনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লেন, এবং তাঁকে জাপটে ধরে চিৎ ক'রে ফেললেন । তা দেখে অন্যান্য সম্পাদকেরাও গোবর্ধনের উপরে গিয়ে পড়ে কেউ বা হাত কেউ বা পা ধরে টানাটানি করতে লাগলেন । মনে হল যেন গোবর্ধনকে তাঁরা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবেন ।

অক্রান্ত গোবর্ধন আর্তনাদ ক'রে উঠলেন ।

তিনি চিৎকার করতে করতে বললেন, গল্প এখনি দিচ্ছি । আমাকে ছাড়ুন ।

সবাই সমস্বরে বললেন, ছাড়ব না ।

গোবর্ধন আবার বললেন, দর কমিয়ে দিচ্ছি ।

সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করলেন, কত ?

এক হাতে ষত আঙুল । ছাড়ুন আমাকে ।

ছাড়ব না ।

দু হাতে ষত আঙুল ।

তবু ছাড়ব না ।

চার হাত-পায়ে ষত আঙুল ।

তবু ছাড়ব না।

অর্ধেক কমান।

আরও কমান।

তা হ'লে মারা পড়ব। 'শক' কাটিয়ে উঠতে পারব না।

আচ্ছা অর্ধেকই রাজি।

গোবর্ধনকে সবাই ছেড়ে দিলেন। গোবর্ধন বড় একখানা নভেল লেখা শেষ করেছিলেন মাস দুই আগে। পূজোর চাহিদা দেখে তাড়াতাড়ি সেই নভেলকে একশো ভাগে ভাগ করে একশটি ছোট গল্প তৈরি করে রেখেছিলেন। একশ জন সম্পাদককে সেই একশটি গল্পই পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বিক্রি করতে বাধ্য হলেন। ১৩৫২ সালেই একশ টাকা করে সেগুলো বেচে বাড়ি কেনার মতলব করেছিলেন তা আর হল না।

পরদিন শোনা গেল প্রত্যেকটি লেখকের কাছ থেকে প্রায় একই উপায়ে এঁরা লেখা সংগ্রহ করেছেন, এবং কেউ কেউ আরও কম রাজি হয়েছেন, এবং কয়েকজন লেখককে হাসপাতালেও যেতে হয়েছে।

'আর্থিক দুনিয়া'র সম্পাদকের কাছেও এঁরা গিয়েছিলেন, কিন্তু লেখা সংগ্রহের জন্ত নয়।

তিনি এখন হাসপাতালে।

## কমন সেন্স

দাঁতের ব্যথাটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

ভেবেছিলাম ব্যথাটা ক দিন পবে আপনা থেকেই সেরে যাবে, স্ততরাং অ্যাম্পিরিনের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। কিন্তু তিন দিন পরেও যখন কিছু কমল না, বরঞ্চ আরও অসহ্য হয়ে উঠল, তখন বাধ্য হয়েই আত্মচিকিৎসা ছেড়ে দস্ত-চিকিৎসকের দিকে আকৃষ্ট হলাম।

আগেই বলে রাখি আমার বয়স পঁচিশ বছর এবং আমি বাল্যকাল থেকেই দাঁতের যত্ন নিয়ে আসছি, স্ততরাং এ বয়সে আমি যে আমার আবাল্য লালিত দৃঢ়স্বক্ক দশনকুলের একটিকে অসুস্থ হতেই চিরকালের জ্ঞাত্যাগ করব এ কল্পনা স্বভাষতই আমার মনে আসে নি। আমি যাচ্ছিলাম চিকিৎসকের কাছে কিছু ওষুধের ব্যবস্থা আনতে।

পথে বন্ধু তারকের সঙ্গে দেখা।

“কোথায় চলেছিন সন্কাল বেলাই?”

“আর বলিস কেন, বড বিপদে পড়েছি।”

“কি রকম?”

“দাঁতের ব্যথা।”

“তোব দাঁত তো চমৎকার, ব্যথা হল কেন?”

প্রশ্নটা অযৌক্তিক। কারণ দাঁতের যে অংশ দৃশ্য সে অংশ কুশলেই আছে। অসুস্থ হয়েছে অদৃশ্য অংশ, দাঁতের শিকড়, স্থানটি দস্তীর আয়ত্তের বাইরে। তাই যন্ত্রণা সত্ত্বেও তারকের হুলটা দেখিয়ে দিলাম, বললাম—

“ক্রীমতী মালতীরও তো মৌন্দয়ের খ্যাতি আছে, অথচ দিন সাতেক আগে তার অসুখ নিয়ে তুই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলি।”

তারক সবিষ্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, “তোব অসুখটা যে মারাত্মক নয়, তা তোব এই মারাত্মক রসিকতা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।”

আমি বললাম “ঐ তোব আর একটা হুল। সংসারে সকল রসিকতারই মূল উৎস ব্যথা।”

“দাঁতের ব্যথা নয়”—তারক গস্তীর সুরে বলল।

আমি বললাম, “ষে-কোনো ব্যথা।”

“কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারবি তোর ব্যথা নিয়ে তোরই উপর রসিকতা করবে আর এক জন।”

“কে?”

“ডাক্তার।”

“কেমন ক’রে?”

“তোর রসিকতার উৎসের মূলোৎপাটন ক’রে।”

“আমি তো দাঁত তোলাব না।”

“কিন্তু ডাক্তার তুলবে।”

“জোর ক’রে?”

“জোর ক’রে নয়, তোকে সম্বোধিত ক’রে। তুই নিজেই বলবি তুলে দিন। কিন্তু রসিকতা থাক, আমার কথা হচ্ছে, তুই ডাক্তারের কাছে গিয়ে হুল করছিস।”

“কিন্তু ব্যথা সত্যিই অসহ্য হয়ে উঠেছে যে—না গিয়ে উপায় কি?”

“যদি যেতেই হয়, তা হ’লে মনটা বেঁধে নে আগে। তার চেয়ে চল আমিই যাই তোর সঙ্গে, দাঁত তোলা এখন চলতে পারে না।”

“তুই সঙ্গে যাবি এ তো ভাল কথা, আমার দাঁতের বক্ষীর কাজ করবি। যদি ডাক্তার জোর করে, তুই প্রতিরোধ করবি।”

## ২

ডাক্তার দাঁত পরীক্ষা করলেন নানা ভাবে। তারপর আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললাম “একটা প্রেসক্রিপশন—”

ডাক্তার যন্ত্রের সাহায্যে মুখ হাঁ করিয়ে ভিতরে আলো ফেললেন এবং একখানা ছোট্ট আয়না মুখেব ভিতর ধরে বললেন “নিজেই দেখুন।”

দেখলাম নিজেই, অর্থাৎ কিছুই দেখলাম না। কারণ উক্ত দাঁতের পিছন দিক কেমন তা আগে কখনো দেখিনি, তাই বুঝতে পারলাম না কিছু।

ডাক্তার বললেন, “কট এক্সপোজ্‌ড্ হয়ে গেছে, পরিণাম অতি ভয়ানক।”

“কি রকম ভয়ানক?”

“দাঁতের গোড়া সেপটিক হয়ে মারা যেতে পারেন।”

“সে ভয় তো জীবনের প্রতি মুহূর্তেই আছে। মারা তো যে-কোনো উপলক্ষে যেতে পারি।”

তারক আমার কথা শুনে অসীম ভূষ্টিভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। ডাক্তার বললেন, “বুঝলাম আপনি দার্শনিক, কিন্তু আমরা তো ডাক্তারির বাইরে আর কিছু ভাবি না।—যদি কথাটার গুরুত্ব না বুঝতে চান তা হ’লে কোনো দার্শনিক পণ্ডিতের কাছে যান।”

তারক বলল “ডাক্তারের ব্যবস্থা নিতেই তো এসেছি।”

ডাক্তার বললেন “আমাদের একমাত্র ব্যবস্থাই আছে—দাঁত তুলব।”

“এ ভিন্ন আর কোনো উপায় নেই?”

“আছে। সে হচ্ছে দাঁত না তোলা এবং আপনাকে মরতে দেওয়া।”

তারক শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল, পাছে আমি ডাক্তারের কথায় ভয়ে রাজি হয়ে যাই।

কথাটা শুনে ভয় পাইনি বললে মিথ্যা বলা হয়, তারক না থাকলে এতক্ষণ দাঁত তোলাও হয় তো আমার হয়ে যেত, কারণ ডাক্তারের খোঁচাখুঁচিতে ইতিমধ্যে ব্যথা সকল সীমা ছাড়িয়েছে, দাঁতের গোড়া দপ দপ করছে, মনে হচ্ছে এখুনি আপদ বিদায় করা ভাল। কিন্তু তারকের ভয়ে বললাম, “বেশ, দুটো দিন বাদে আসব আপনার কাছে, আজ প্রস্তুত হয়ে আসিনি, আজকের মতো একটা গুঁধের ব্যবস্থাই ক’রে দিন, দাঁত তোলাব আমি ঠিকই।”

৩

পথে বেরিয়ে তারক আমাকে বলতে লাগল, “দাঁতের গোড়া যখন শক্ত আছে, তখন দাঁত তোলা ভয়ানক অগ্নায়। ব্যথা হয়েছে, দু’চার দিন সহ্য ক’বে থাকলেই কমে যাবে। তার পর দাঁতের গোড়াও আপনা থেকেই শক্ত হয়ে যাবে, মাড়ি এসে ঢেকে দেবে, জুড়ে যাবে ক্ষতস্থান। দাঁতের ডাক্তারের কাছে সে ক্ষত সহজে আসতে নেই, ওরা দাঁত দেখলেই তুলে ফেলে।”

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করলাম, এবং মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলাম, বেদনার মেয়াদটা কোনো রকমে সহ্য করতেই হবে।

তারক উৎসাহের সঙ্গে বলল, “কমন সেন্স একটুখানি প্রয়োগ করলেই বুঝতে পারবি সব ভোগেরই একটা ভোগান্ত আছে। দাঁতের ব্যথা তোর কতদিন থাকতে পারে? বড় ছোর সাত দিন? না হয় তো দশ দিন, বিশ দিন, এক মাস, এক বছর? না হয় দশ বছর?”

“দশ বছর?”—আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

তারক বলল, “এই বুঝি কমন সেন্স ?—ম্যাক্সিমাম্ সাত দিন, তার বেশি থাকে তো আমরা দুজনেই গলাগলি ক’রে গিয়ে দাঁত তুলিয়ে আসব।”

বিকলে রবি এলো দেখা করতে। এসে সব শুনে প্রায় ক্ষেপে গেল। বলল, “তুই অত্যন্ত অগ্রায় করছিস দাঁত না তুলিয়ে। তোদের মতো লোকের একটু কমন সেন্স থাকা উচিত।”

কমন সেন্স ! তারকও বলেছিল আমার ঐ জিনিসটির অভাব আছে। দাঁতের ব্যথা হ’লে মানুষের কমন সেন্স থাকে না।

রবি বলে চলল, “দাঁতের গোড়ার ঐ একটি ফোকাসের ভিতর দিয়ে সমস্ত জীবনীশক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে, বাইরের কতকগুলো মারাত্মক জীবাণু ওখানে আশ্রয় নিয়েছে, তারা চক্ষিণ ঘণ্টা বিষ তৈরি করে তোর সর্বঙ্গে ছড়াচ্ছে, আর তুই ভীক, একটি দাঁতের মায়ায় এতগুলো শত্রু পুষছিস মুখের মধ্যে।”

রবি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে আমাকে লজ্জিত করল। দাঁতের ব্যথা বেড়েই চলছিল, তার উপর রবি অন্তরে ব্যথা দিল। আমাব এই বক্তুর মধ্যে এমন একটি দস্তোৎপাটনের সমর্থক পেয়ে আমি মনে মনে বড়ই ভূপ্তি পেলাম। বললাম, “কাল সকালেই দাঁত তুলিয়ে ফেলব, তুই ভাই, আমাকে নিয়ে যাস ডাক্তারের কাছে।”

“কাল ? কাল কেন, আজই তোলা উচিত, এই মুহর্তে তোলা উচিত।”

আমি মিনতি ক’রে বললাম, “না, আজ থাক, আজই সকালে বেরিয়েছিলাম, এখন আর উঠতে পারছি না, জরও রয়েছে বেশ।”

রবি একটু ভেবে বলল—“বেশ, আজ থাক, কাল সকালে এসে আমি তোকে নিয়ে যাব।”

রবি চলে গেল শিস দিতে দিতে।

সকল ব্যথার অবসান হবে সাঁড়াশির একটিমাত্র মোচড়ে, ভেবে বড়ই আরাম বোধ হল।

তারক এলো ঘণ্টাখানেক পরে। জিজ্ঞাসা করল “কেমন আছিস ?”

বললাম, “আর যে সহ্য করা যাচ্ছে না ভাই। দাঁত না তোললে বোধ হয় মারা যাব।”

তারক আহত হল এ কথায়। সে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, “তোদের মতো লোকের কাছে একটু কমন সেন্স আশা করেছিলাম—ভেবেছিলাম সহজ কথা সহজ ভাবেই বুঝতে পারবি, তাই উপদেশ দিয়েছিলাম।”

তারকের মনে যে আঘাত লেগেছে সেটা স্পষ্ট বুঝলাম, কিন্তু দাঁতের ব্যথা



যে মনের ব্যথার চেয়ে অনেক বড়, তা এখন ওকে কি ক'রে বোঝাই। বললাম, “ভাই, যন্ত্রণার হয় তো মাথার ঠিক নেই, তাই সম্ভব অসম্ভব যত সব কল্পনা আসছে মনে।”

“কিন্তু তাই বলে আত্মহত্যা করতে চাস?”

আমি কাতর কণ্ঠে বললাম, “চোখে সব অন্ধকার ঠেকছে, পথ দেখতে পাচ্ছি না, তুই আমাকে পথ দেখা।”

তারক শাস্ত হল আমার আবেদনে। বলল, “দাঁত সহজে তুলতে নেই। পায়ে ফোড়া হলে আমরা পা কেটে ফেলি না, মাথা ধরলে শিরশ্ছেদ করি না, চোখে অস্থখ করলে চোখ উৎপাটন করি না, সর্দি হলে নাক কাটি না, কেবল দাঁতে ব্যথা হলে দাঁত তুলি। এটা কি যুক্তি হল? আর কেন যেন দাঁত তোলার দিকে লোকের ঝোক দিন দিন বেড়েই চলেছে। চীনা মিন্দীরা পর্যন্ত সেজ্ঞা এদেশে বসে বেণ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।”

আমি বললাম, ‘বেণ, আমি আর ওর মধ্যে নেই।’

তারক এবারে খুশি হয়ে বলল, “উত্তম। আমি বাল সকালে ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে আসব, ভাল ডাক্তার।”

কথাটা শুনে শিউরে উঠলাম। কারণ বাল সকালে রবি আমাকে দাঁত তোলাতে নিয়ে যাবে কথা আছে।

বললাম, “না, আবার ডাক্তার কেন, এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে সব।”

“সে তোকে ভাবতে হবে না, আমি যখন ভার নিলাম তখন ব্যথা সারানোর দায়িত্বও আমার।”

৪

শুয়ে শুয়ে পবিত্রাণের উপায় চিন্তা করছি। তারক যেমন একগুয়ে, ডাক্তার আনবেই। ওদিকে রবি আমাকে ভালবাসে, সে আমার জন্ম কিছু করতে পারলে ছাড়ে না। সুতরাং সেও ঠিক আসবে। তার সঙ্গে যেতে রাজি না হলে সে কেপে ধাবে। আবার তারক ডাক্তার নিয়ে এসে যদি আমাকে দেখতে না পায়, সেও হবে এক দারুণ ব্যাপার।

দাঁতের ভয়াবহ যন্ত্রণার উপর এই ভয়াবহ সমস্যা। কিন্তু আপাতত ছশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল জ্যোতিষ, শশাঙ্ক আর যতীন।

জ্যোতি বলল, “তোমার অস্থখের কথা শুনলাম।”

শশাঙ্ক বলল, “দাঁতে আবার কি হল।”

যতীন বলল, “শুনছি তুমি না কি দাঁত তোলাবে ?”

বুললাম আমাৰ অস্থখৰ খবৰটা পাখা মেলেছে। কিন্তু তাতে কেন যেন একটা অজানা ভয় মনকে ব্যাকুল ক’ৰে তুলল। আমাৰ এই যত্নৰ নিষে বন্ধুদেৱ সন্ধে আলাপ কৰা আমাৰ পক্ষে কষ্টকৰ, তদুপৰি অতি দ্রুত আমাকে এক গুৰু পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হতে হুছে—সেটি ৰুড়ৈৰ মেঘেৰ মতো আমাৰ কল্পনাৰ উত্তৰ পশ্চিম কোণে প্ৰত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি তখন নিৰুপায়।

যতীন বলল, “দাঁত যদি তোল, তা হ’লে ভয়ানক অগ্নায় কৰবে।”

শশাঙ্ক বলল, “একটা দাঁত তুললে তাৰ পাশেৰ গুলোকেও আৰু ঠেকাতে পাববে না।”

জ্যোতি বলল, “এক একটা পাটিতে যোলটি দাঁতেৰ সম্পৰ্ক এত ঘনিষ্ঠ যে একটা তোলাও যা, যোলটি তোলাও তাই। আৰু, একপাটি দাঁত অবশিষ্ট থাকা মানে গোক হওয়া।”

যতীন জ্বোৱেৰ সন্ধে বলল, “দাঁত না নডলে কখনো দাঁতকে নাডা দিতে নেই।”

এই ভাবে আক্ৰমণ চলল নানা দিক থেকে।

আমি বহু কষ্টে বললাম, “দাঁত তোলাব মধ্য আমি নেই।”

কথাটা শুনে তারা নিশ্চিন্ত হুছিল, এমন সময় অপ্ৰত্যাশিত ভাবে এসে পড়ল ৰবি, এবং এমেই খুব উত্তেজিত ভাবে আমাকে বলল, “শুনলাম দাঁত নাকি তোলাবি না ?”

আমি ইঙ্গাৰায় যত্নৰ দিকে দেখিয়ে তাৰেৰ সবাইকে বলতে চেষ্টা কৰলাম যে এখন আৰু কথা বলতে ভাল লাগছে না।

ৰবিৰ প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ দিল শশাঙ্ক। বলল, “তুলতে দিছে কে ?”

ৰবিৰ চোখে যেন আগুন জ্বলল এ কথায়, সে এমন দৃষ্টিতে আমাৰ দিকে চাইল যাতে আমি ভয় হয়ে যেতে পাৰি।

আমি বললাম, “একটুখানি বস ভাই, পৰে সব বলছি।”

যতীন, শশাঙ্ক এবং জ্যোতি বিদায় নিয়ে উঠে গেল, বলল, “আমরা উঠি ভাই, তোমরা পৰামৰ্শ কৰ।”

ওদেৰ ভাষায় একটু বিদ্ৰূপেৰ স্বৰ ছিল, এবং সেটি আমাৰ ভাল লাগল না।

ওরা চলে গেলে ৰবি বলল, “ওদেৰ মতলবটা ভাল মনে হুছে না। তোৰ সৰ্বনাশ হবে যদি ওদেৰ পাল্লায় পড়িস। দেখছি তোৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ ওরা পুৰোপুৰিই নিছে। জানি আমি সবই।”

চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। সবই জানি মানে কি?—কিন্তু রবিই অনেকটা আশ্রয় করল, সে আমাকে বুঝিয়ে দিল—ওরা তারকের চর হিসেবে এসেছে, পাছে ব্যথা বেড়ে গিয়ে আমি দাঁত তুলতে চাই, তাই ওরা নাকি পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু রবিও সতর্ক আছে, সে তারকের মতলব হাসিল করতে দেবে না।

রবি প্রায় ঘণ্টাখানেক আমার কাছে বসে দাঁত তোলার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। বলল, “কাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, তুই প্রস্তুত হয়ে থাকবি, আমি এসেই নিয়ে যাব।”

কোনো রকমে বললাম, “আচ্ছা, তাই হবে।”

আমার সমস্ত মনপ্রাণ ঐ দাঁতটির সমূল বিনাশ কামনা করছিল, ভালয় ভালয় কাজটি হয়ে গেলে এখন বাঁচি।

“রবি বলল, “কিন্তু ওরা যদি এসে বাগড়া দেয়?”

“শুনব না ওদের কথা।”

“যদি জোর করে?”

“না না, জোর করবে কেন?”

“তুই জানিস না ওদের, তোর সর্বনাশ না করে কি ওরা ছাড়বে?”

“না, তুই অকারণ ভয় পাচ্ছিস।”

“ভয় কি আর ইচ্ছে করে পাচ্ছি?—দাঁত না তুললে কি পরিণাম হবে বুঝতে পাবছি কি না।”

“আরে না না, আমি ঠিক আছি।”

“তবে কথা রইল, আমি সকালে আসব এবং তোকে নিয়ে যাব।”

রবি চলে গেল। কিন্তু তার ওঠবার আগেই আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একটি ছায়াগতি জানলাব পাশ থেকে যেন সরে গেল।

কে ঐ ছায়াগতি? তারকের?—না ওর দলের কারো? কিছু বুঝতে না পেরে একটি অ্যান্টিবিরিনের বডি খেয়ে শাস্ত হবার চেষ্টা করলাম।

৫

রাতে ঘুম হয়েছিল ভালই, কারণ শোবার আগে আরও একটি বডি খেয়েছিলাম।

হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে জেগে উঠে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এখনও রাতের

অন্ধকার দূর হয় নি, কে কড়া নাড়ে এই শেষ রাত্রে ? প্রশ্ন করতে চাপা কণ্ঠে উত্তর এলো, “খামি তারক।”

“এখন ? এই অসময়ে ?”

দরজা খুলে দিলাম। দেখি ওরা তিন জন এসেছে।

তারক বলল, “আর সময় নেই, ওরা রওনা হচ্ছে, তোকে এখনি এখান থেকে আমরা নিয়ে যেতে চাই, ওরা এসে পড়লে তোর যাওয়া অসম্ভব হবে।”

বিরক্ত বোধ করলাম এই প্রস্তাবে, কারণ জ্বর আছে, দেহ অত্যন্ত দুর্বল, এ অবস্থায় এখন যাওয়া অসম্ভব, আর যাবই বা কোথায় এই অন্ধকারে, এবং কেন যাব ?”

“কিছু চিন্তা নেই, তুই মরে গেলেও তোকে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব, ডাকাতদের হাতে তোকে পড়তে দেব না, আর আজই যদি দাঁত তোলা হয়, তা হ’লে তোকে আর বাঁচাতে পারব না।”

এর পর ওরা আমার কোনো কথা বা মতামতের অপেক্ষা না ক’রে আমাকে চ্যাংদোলা ক’রে বব থেকে বের করে নিয়ে গেল। আমার প্রতি বিবেচনাবশত, এবং আমাকে হাঁটতে দেবে না বলেই ওরা এক সঙ্গে তিনজন এসেছে, বলল। এর পর আর আমার রাগ করা শোভা পায় না, নিজের অবস্থা স্মরণ ক’রে বরঞ্চ কৌতুক অনুভব করতে লাগলাম। মনে মনে সাশ্বনা পেলাম এই ভেবে যে, খাটিয়ায় শুয়ে লোকের ঘাড়ে উঠে যাওয়ার চেয়ে এটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

সূর্যোদয়ের অনেক দেরি তখনও, ঘাড়ে উঠে হিমেল বাতাসে চলতে বেশ আরাম বোধ হচ্ছিল। কিন্তু সে আরাম মিনিট তিনেকের বেশি স্থায়ী হল না। এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল পথের মাঝখানে। নির্জন পথের ক্ষীণ আলোয় কর্কশ কণ্ঠে কে হাঁকল—

“কে যায় ?”

রাজপথে এ প্রশ্ন কববার অধিকার একমাত্র পুলিশের। কিন্তু চেয়ে দেখলাম পুলিশ নয়, একদল গুণ্ডা।

তারক, যতীন ও শশাঙ্ক কেউ কোনো কথা বলল না।

গুণ্ডারা এগিয়ে এসে বলল, “তারক। জানি সব, কিন্তু এখনো বলছি কান্দ হও।”

কণ্ঠস্বর রবির।

সংঘর্ষ আসন্ন বুঝে তিনজনে আমাকে তাদের ঝাড় থেকে নামিয়ে পথের পাশে দাঁড় করিয়ে দিল।

রবি আদেশ দিল “একে নিয়ে যেতে পাবে না।”

তারক বলল, “হুকুম না কি ?”

“হ্যাঁ, হুকুম।”

শশাক বলল, “বটে।”

ইতিমধ্যে তারক, শশাক, ষতীন—তিনজনেই আশ্রিন গুটিয়ে ফেলল।

রবিও আশ্রিন গোটাল, এবং ওরা পরস্পর হিংস্র ভাষায় পরস্পরকে গাল দিয়ে নিজেদের উত্তেজিত করতে লাগল।

তারক বলল, “দাত তোলে কোন্ শালা।”

রবি বলল, “দাত তোলা ঠেকায় কোন্ শালা।”

তারক বলল “বটে।”

রবি বলল “মরদ কি বাৎ।”

রবির সঙ্গে ছিল আরও চারজন, তারা সবাই আমার পরিচিত। ওদের হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে গেল তড়িৎগতিতে।

আমি তখন দাত সম্পূর্ণ ভুলেছি। মনে হল যেন আমার কোনো অস্থই হয়নি। ছুটে চলে এলাম বাড়িতে এবং এসেই শুয়ে পড়লাম।

এতক্ষণে বুদ্ধ ব্যথা এইবার মাড়ির গুহা থেকে প্রবল শোলের মতো বেরিয়ে এসে আমাকে পাগল করে তুলল—আমি শুয়ে, বসে, পাইচারি ক’রে ঘণ্টা তিন চার কাটিয়ে কাছাকাছি এক দাত তোলা চীনা মিস্ত্রীর ঘরে ঢুকে পড়লাম।

তারপর যুবামান বন্ধুদের কিছুদিন আর খোঁজ নেই। হঠাৎ একদিন সুনতে পেলাম ওরা প্রায় সবাই হাসপাতালে গিয়েছিল, এবং তারককে কয়েকদিন হাসপাতালেই থাকতে হয়েছিল। ডাঃখের বিষয় থানা পষন্ত কাউকে যেতে হয়নি।

দিন দশেক পরে তারক এলো আমার কাছে। সে দুটি দাত হারিয়েছে রবির হাতে। তবু তার গর্ব এই যে নিজের দুটি সুস্থ দাঁতের বিনিময়েও সে আমার একটি দাঁতকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বক্ষা করেছে।

এখনও সে সেকথা স্মরণ পেলেই সবাইকে খুব গর্বের সঙ্গে বলে বেড়ায়।

কিন্তু আমি তার সম্মুখ আর মুখ খুলতে পারি না, যদি দেখে ফেলে।

## অমরত্বের পঁয়তাল্লিশ বৎসর

ব্রহ্মা তাঁর স্বর্গীয় আসনে ধ্যানমগ্ন। পাশে নারদ মধুর স্বরে বীণা বাজিয়ে চলেছেন। এমন সময় তাঁর শুভ্র শশ্রু হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল।

নারদের চোখ ও মন বীণায় আবদ্ধ ছিল, তিনি চমকিত হয়ে বুঝতে পারলেন ব্রহ্মা তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। আজ বুঝতে পারলেন, কিন্তু তাঁর দাড়ি পাকার পর প্রথম যেদিন ব্রহ্মা সে দিকে তাকান সেদিন বুঝতে পারেন নি। সেদিন তাঁর অবস্থা বডুই শোচনীয় হয়েছিল। তিনি হঠাৎ দাড়িতে আগুন ধরে গেছে মনে করে চিৎকার করে উঠেছিলেন, আর তা দেখে ব্রহ্মার গান্ধীর্ষ নষ্ট হয়েছিল। সেই থেকে নারদকে মাঝে মাঝে স্বর্গ ছেড়ে বাংলাদেশে এসে থাকতে হয়, এটি তাঁর পক্ষে এক প্রকার শাস্তি।

নারদ ব্রহ্মার দৃষ্টিপাতের অর্থ বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, পিতঃ, আমি এখনই চললাম বাংলাদেশে। সেখানে চিত্রগুপ্ত কিছুদিন আগেই গিয়েছেন, সূতরাং এ বারের বাংলা বাস আমার পক্ষে খুব কষ্টকর না হতে পারে।

এ ঘটনাটি পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বকার। (অবশ্য এটি পার্থিব পঁয়তাল্লিশ বৎসর)। তার আগে তিনি যখন বাংলাদেশে আসেন সে প্রায় দু'শ' বছর হয়ে গেল, সূতরাং এ বারে বাংলাদেশের রূপ তাঁর কাছে একেবারে নতুন, বিশেষ করে কলকাতা শহরের। এ শহরই তখন ছিল না।

চিত্রগুপ্তই তাঁকে শহরের ইতিহাসটি মোটামুটি শুনিয়ে দিলেন, এমন কি কিপলিং-এর কবিতার কয়েকটি ছত্রও আবৃত্তি করলেন নারদের কাছে—

Chance directed chance erected, laid and built

On the silt.

Palace, byre, hovel, poverty and pride

Side by side...

চিত্রগুপ্ত আরও বললেন, আজ এই দেশে আর এক ইতিহাস রচিত হতে চলেছে। বাঙালী জাতির মধ্যে তিনি এমন একটি প্রাণের সাদা দেখতে পেয়েছেন বাতে তাঁর আশা হয়েছে বাঙালী ইংরেজের অধীন হয়ে বেশি দিন আর থাকবে না।

নারদ বললেন, কি রকম সাদা দেখলে? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

চিত্রগুপ্ত বললেন, আপনাকে সব দেখাব।

নারদকে তিনি নিয়ে এলেন শহরের এক অংশে। তখন গভীর রাত্রি। ছুজনে চুপে চুপে একটি বাড়িতে গিয়ে দেখেন কিসের এক গোপন সভা বসেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই নারদ বুঝতে পারলেন এটি একটি বিশেষ ষড়যন্ত্র সভা। অনেক যুবক এসে এক সঙ্গে মিলেছে। তাদের মুখে দৃঢ়তার ছাপ, চোখে ব্যাকুলতা। তারা চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আর চুপে চুপে আলাপ করছে। পরামর্শের বিষয়টি শুনে নারদ বিস্মিত হলেন। আপাত-দৃষ্টিতে যারা ক্ষীণাত্মক তরুণ যুবক মাত্র, তারা নাকি দুর্ধর্ষ ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াবে। সেই উদ্দেশ্যেই কাকে কি করতে হবে তা ঠিক করছে। দেশময় একটা ত্রাসের সৃষ্টি করছে তারা, ইংরেজকে তারা এদেশে থাকতে দেবে না, যদি এর জন্ত প্রাণ দিতে হয় দেবে, কিন্তু ছাড়বে না।

চিত্রগুপ্ত নারদকে আর এক পাশে নিয়ে গেলেন। দেখলেন সেখানে কয়েকজন যুবক নিবিষ্টমনে বোমা তৈরি করছে।

নারদ বললেন, এই কয়েকজন ছোকবাব এত সাহস ?

চিত্রগুপ্ত বললেন, শুধু এরা ক'জন নয়, সমস্ত বাংলাদেশ আছে এদের পিছনে। তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ, সবাই। তবে তরুণ ও যুবকদের মধ্যেই উৎসাহ অতি প্রবল। তারাই প্রধান কর্মী, তাদের মনে স্বপ্ন।

স্বপ্ন ? কিসের স্বপ্ন ?

দেশের দুঃখ ঘোচাবে, দেশকে স্বাধীন করবে এই স্বপ্ন।

নারদ চিত্রগুপ্তের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বাঙালীর প্রতি চিত্রগুপ্তের এই অহেতুক প্রীতি কেন ? মনটা ওর বডই দুর্বল মনে হচ্ছে যেন। কিন্তু সন্দেহকে আমল না দিয়ে বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার।—তিনি শুধু এই কথাটি সংক্ষেপে উচ্চারণ করলেন। তিনি নিশ্চের অসুমানের ভুল বুঝতে পারলেন ধীরে ধীরে।

ক্রমে দিন যায়, ক্রমে তাঁরা দেখতে পান, বাইরে তাদের যে একটা শাস্ত্রভাব ছিল তা দ্রুত দূর হয়ে যাচ্ছে। তারা ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠছে।

এক দিন সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন দিকে দিকে বহুতমসব আরম্ভ হয়ে গেছে। যত বিদেশী কাপড় সংগ্রহ করে ছেলেরা তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, বিদেশী কাপড় আর তারা পরবে না। সবাই দেশী কাপড়ের মহাখ্যা গান ধরেছে—“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।”

তারপর দেখলেন, কবি এসেছে আগুনের বাণী নিয়ে, সাংবাদিকের কলম

চলছে নির্ভীক ভাবে, কর্মীরা অক্লান্তভাবে স্বদেশী প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে, সম্মানবাদীরা গোপন অস্ত্রে লাগ দিচ্ছে, ইংরেজ মারা পড়ছে এখানে সেখানে। বালকেরা হাসিমুখে ফাঁসিতে ঝুলছে দেশ-মায়ের কলাণে।

নারদ মুগ্ধ হন, কিন্তু চিত্রগুপ্তের উপর তাঁর সন্দেহ বাড়তে থাকে। তবু মনের ভাব গোপন ক'রে বলেন, কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে পারবে এই সব ছেলেরা ?

চিত্রগুপ্ত তাঁকে শুধু বললেন, দেখে যান সব। এর মধ্যকার আসল কথাটা হচ্ছে, এরা জেগেছে। অপমানের আঘাতে জেগেছে। এরা দেহের শক্তিতে হয় তো দুর্বল, কিন্তু মনের শক্তিতে এরা অজেয়। আরও বড় কথা হচ্ছে, এরা একটা মহৎ আদর্শের জন্তু প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছে। এই যে লক্ষ্য ধরে চলেছে এরা, এই চলাটাই আজ বড় কথা। এর মধ্যে অনেক ছেলেমি আছে, অনেক ভুলই এরা করছে, কিন্তু তা হোক, ভুলের ভিতর দিয়ে না গেলে সত্য শিক্ষা হয় না।

নারদ বললেন, অর্থাৎ আগুনে পুড়ে পুড়ে ওরা খাঁটি সোনা হচ্ছে।

চিত্রগুপ্ত বললেন, ঠিক তাই। এরা অনেকেই মারা পড়বে, আর কি দুঃখ যে এরা সহ্য করবে, কিন্তু তবু খুব আনন্দ হচ্ছে এদের দেখে।

নারদ বললেন, মৃত্যুর হিসাব নিয়ে ব্যস্ত তুমি, মৃত্যুর কথায় খুশি হওয়াই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক।

চিত্রগুপ্ত বললেন, ঠিক তার উল্টো। মানে, মৃত্যু নিয়ে কারবার বলেই এই জীবনের দৃশ্য আমাদের মুগ্ধ করেছে।

নারদের সহানুভূতি জাগে চিত্রগুপ্তের প্রতি। এতক্ষণে বুঝতে পারেন তাঁর অল্প কোনও মতলব নেই, জীবনের দৃশ্যে সত্যই তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। নারদ নিজেও মুগ্ধ হওয়ার জন্তু প্রস্তুত হতে লাগলেন।

এমন সময় একদল ছেলে হৈ হৈ করতে করতে এক বোঝা বিলিতি কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিল ঠিক তাঁদের পাশেই। নারদ চমকে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন।

চিত্রগুপ্ত বললেন, অদৃশ্য হয়ে না থাকলে আপনার কি বিপদই না হত এ সময়।

কেন ?

আপনার সূক্ষ্ম দাড়িকে বিলিতি সূতো মনে ক'রে হয় তো তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। ওরা যে রকম মরীয়া হয়ে উঠেছে তাতে ওদের এখন আর কাণ্ডজান নেই।



নারদ এ কথা উত্তর দিলেন না, তিনি কেমন বেন উদাসীন হয়ে পড়তে লাগলেন।

চিত্রগুপ্ত বললেন, বাংলা দেশের এই নবজীবনের দৃষ্ট আমি কখনও ভুলতে পারব না। জীবন যেখানে সত্যিই জেগেছে সেখানে তো মৃত্যু নেই, বাঙালী জাতিও মরবে না, কেননা এদের জীবন জেগেছে। এরা গুলির মুখে প্রাণ দিয়ে নতুন প্রাণ পাবে, ফাঁসিতে ঝুলে অমর প্রাণ ছড়িয়ে যাবে সকল দেশে।

নারদের মনের উপর চিত্রগুপ্তের ভাষার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল, দু'জনেই আত্মবিশ্বস্ত হয়ে চেয়ে রইলেন জনতার দিকে। দেখতে লাগলেন স্বদেশী মস্ত্র দীক্ষিত বিচারালয়ের ব্যবহারাজীব রাজদ্রোহীকে মুক্ত করতে ছুটে চলেছে, বাগ্মীরা হাজার হাজার উৎসাহী শ্রোতার কানে স্বদেশপ্রেমের সুধাবর্ষণ করছে, ব্যবসায়ীরা দোকানে দোকানে স্বদেশী পণ্যের পসরা সাজাচ্ছে। দিকে দিকে কি চাঞ্চলা, কি উত্তেজনা!

চিত্রগুপ্ত হঠাৎ লক্ষ্য করলেন নারদ কখন সেখান থেকে সরে গিয়ে বীণাটি পাশে নিয়ে বসেছেন। তাঁর অঙ্গুলি চকল হয়ে উঠল। সহসা তাঁর হাতে ঝঙ্কত হয়ে উঠল এক অপূর্ব সঙ্গীত।

ঝঙ্কার ধাপে ধাপে চড়তে লাগল। বিশ্বসঙ্গীতের মর্ম যেন ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হতে লাগল তর্জনীর আঘাতে আঘাতে। যেন কোন্ অনাদিকালের সৃষ্টির ব্যাকুলতা বেঙ্গে উঠল সেই সুরে। সে সুর হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে চলল, সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল।

চিত্রগুপ্ত মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন, তারপর কখন চমকিত হয়ে উপলক্ষি করলেন সুর নেমে এসেছে পৃথিবীর সীমানায়। লয় আরও দ্রুত হয়েছে। তাতে ধ্বনিত হচ্ছে নবজীবনের গান। যে জীবনধারা তুণে তুণে, পল্লবে পল্লবে, ফুলে ফুলে, অযুত নিযুত কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, এই সুর সেই জীবনের সুরের সঙ্গে ঐকতান ধ্বনিত ক'রে তুলছে।

বহুক্ষণ পরে চিত্রগুপ্তের খেয়াল হল, তিনি কর্তব্য ভুলে একটা রোমান্টিক ভাবাবেশে বিগলিত হয়েছেন। বডই অগ্রায়। সবাই যেন ষড়যন্ত্র করেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সবাই তাঁকে শুধু জীবনের সঙ্গেই মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এই ভাবালুতা ভাল নয়। এর জন্তু কৈফিয়ৎ দিতে হবে স্বর্গে, এ বিষয় সন্দেহ নেই। নারদের পক্ষে যা অসম্ভব নয়, তাঁর পক্ষে তা অবশ্যই অসম্ভব। না, এ রকম চলবে না। নারদ স্বর্গের স্বাদহীন দেশে জীবনের এমন জয়যাত্রা কখনো দেখেন নি, নারদ জীবনের গান নিয়ে থাকুন, তিনি কেন থাকবেন?

অর্থাৎ উন্টে চিত্রগুপ্ত এবারে নারদকে সন্দেহ করতে লাগলেন। নারদ বৃদ্ধ কিনা তাই মনটা বড়ই দুর্বল। কি করে তাঁকে বাঁচনো যায় এই দুর্বলতা থেকে? তিনি নারদকে ডেকে বললেন, ছাড়ুন এসব। আমি যেমন কর্তব্য ভুলে একটা মুভমেন্টের প্রতি খুঁকে পড়েছিলাম, আপনিও এখন তাই করছেন। আমরা দু'জনেই অপরাধী হচ্ছি এতে। বাস্তব কর্তব্য থেকে পালিয়ে মুক্তি খুঁজছি একটা তরল ভাবের মধ্যে। একেবারে রোমাটিক হয়ে পড়ছি যে! উঠুন, চলুন, পালিয়ে যাই এই মোহের সীমানা থেকে। এই পার্থিব গজদস্ত মিনারে বসে এভাবে স্বর্গকে ভুলে থাকলে তো চলবে না। আমরা এস্কেপিস্ট হব না, উঠুন।—কিন্তু কে কার কথা শোনে? নারদ বধির হয়ে পড়েছেন—বধির বেটোফেনের মতো শুধু বাজিয়ে চলেছেন।

চিত্রগুপ্ত তাঁকে আর কিছু না বলে অগত্যা সেখান থেকে সরে গেলেন। সরে গিয়ে বাংলাদেশ ঘুরে নিজের অবহেলিত কর্তব্য শেষ করলেন, এবং ক'দিন পরে মন থেকে সব ভাবাবেশ ঝেড়ে ফেলে ফিরে এলেন নারদের কাছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! নারদ ঠিক একই ভাবে বীণা বাজিয়ে চলেছেন, কোনও দিকে কোনো চেতনা নেই, তাঁর যন্ত্রে শুধু ধ্বনিত হচ্ছে আনন্দম্। বিশ্বচরাচবে আর কিছু নেই—শুধু আনন্দম্।

না না, এ মোহে তিনি আর পড়বেন না। তিনি এ দৃশ্যে আর বিগলিত হবেন না। জগতে মৃত্যুই সত্য—আর কিছু সত্য নয়।

তিনি নারদকে তদগত অবস্থায় ফেলে স্বর্গে ফিরে গেলেন, এবং পিতা ব্রহ্মাকে সব নিবেদন করলেন। নারদের ভাবাস্তরের কথা শুনে ব্রহ্মা হিজ্জাসা করলেন, তোমার কি মনে হয়?

চিত্রগুপ্ত বললেন, মনে হয় বাঙালী জাতি তার জাতীয় জীবনে যে বিরাট নাটকের অভিনয় করতে চলেছে নারদ তার আবহ সঙ্গীত রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন।

ব্রহ্মা গভীর কণ্ঠে বললেন, নারদকে আর বাংলাদেশে পাঠাব না।

এর মধ্যে পয়তাল্লিশ বৎসর কেটে গেছে বাংলাদেশে। স্বর্গের সেটি একটি নিখাসমাত্র। চিত্রগুপ্ত আবার ফিরে এসেছেন কলকাতা শহরে। নারদকে খুঁজে বের করতে তাঁর দেয়ি হয় নি, কারণ তিনি এখনও ঠিক একই জায়গায় পড়ে আছেন। পড়েই আছেন প্রকৃতপক্ষে। তাঁর বীণার তার ছিঁড়ে গেছে, তিনি সেই ছিন্ন-তার বীণার উপর মুর্ছিত হয়ে শুয়ে আছেন।

কি হল নারদের ? কি দুর্ঘটনা ঘটল হঠাৎ ? নারদের বীণার তার তো সহজে ছিন্ন হবার নয় । চিত্রগুপ্ত চার দিকে চেয়ে দেখলেন । ইতিপূর্বে তিনি বাঙালীর মধ্যে যে বিরাট জাগরণের আভাস, যে কর্মচাঞ্চল্য, যে দুর্জয় শক্তি, যে একতাবদ্ধ কর্মপ্রেরণা, যে ভাবোন্মাদনা দেখে গিয়েছিলেন তা যেন এত দিনে একটা বিপুল শক্তিশাল ক'রে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো আকাশে মাথা তুলে মহৎ উল্লাসে ভেঙে পড়ছে । যে বিপুল শক্তির প্রথম স্পন্দন তিনি দেখে গিয়েছিলেন তা আজ যেন পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে । যে চাঞ্চল্য ইতিপূর্বে তিনি তরুণদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা আজ যুবক বৃদ্ধ সবার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, এমন কি বয়স্করাই যেন বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছে । গতি ছন্দপূর্ণ হয়েছে, তাতে দ্বিধা নেই, জড়তা নেই । চিত্রগুপ্ত খুশি হয়ে উঠলেন । তাঁর মনে হল এমনি হওয়াই তো স্বাভাবিক । বাষ্পচালিত শকটশ্রেণীকে যখন ইঞ্জিন প্রথম টানতে যায়, তখন কত ফোঁস ফোঁস গর্জন, কত হাঁসফাঁস, কত ঘর্ঘর, বান্ বান্, এনোমেলা শব্দ, চাকায় টান পড়ে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঘুরতে চায় না ; প্রথমে চলার আভাস ফোটে, স্পন্দন জাগে, গতি জাগে না, তার পর চাকা যখন একবার ঘুরে যায় তখন সেই চাকা ক্রমে গতিলাভ করতে থাকে, ইঞ্জিনেব গর্জন থেমে যায়, চাকার শব্দে সুর লাগে, সকল দ্বিধা দূর হয়ে যায়, শকট চলতে থাকে সহজ ছন্দে ।

চিত্রগুপ্ত পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে স্বস্তির আনন্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন । নারদের মূর্ছিত অবস্থা দেখে প্রথমেই তাঁর যে উৎসাহ হয়েছিল সে ভয় দূর হল, এবং তাঁর স্পষ্টই বোধ হল স্বর্গের মধুর সঙ্গীতে অভ্যস্ত নারদ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে পারেন নি, শক্তির সঙ্গে মাধু্য সমাস্তুরাল চলতে পারে নি, তারে বিয়ম টান পড়েছে, তাই তার ছিঁড়ে গেছে, তাই দুঃখে বেদনায় নারদ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন । অতএব আশঙ্কার বিশেষ কোনো কারণ নেই । এখন ঠেকে জাগিয়ে সাস্থ্য দিলেই গুর মনটা ভাল হয়ে যাবে, আর কিছুই করতে হবে না ।

চিত্রগুপ্ত নারদের কাছে এগিয়ে গেলেন, এবং নারদও ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ মেলে উঠে বসলেন । প্রথম জেগে হঠাৎ সব ধাঁধার মতো লাগল তাঁর । ক্রমে পূর্ণ চেতনা ফিরে এলো, চোখ দুটি উজ্জ্বল হল এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে চিত্রগুপ্তকে পেয়ে আনন্দে তাঁকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন । অবস্থাটা চিত্রগুপ্তের পক্ষে খুব সুখের হল না, কারণ নারদের মুখে অশ্রুর অরণ্য, তার মধ্যে চিত্রগুপ্তের মাথাটি হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য । আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে তিনি বেশ কিছুক্ষণ হাঁচতে লাগলেন ।

নারদ হো হো ক'রে হেসে উঠলেন—চিত্রগুপ্তের দুর্দশা দেখেই হয়তো ।

চিত্রগুপ্ত বললেন, আপনি বয়োছোঁচ, বেয়াদপি মাফ করবেন, কিন্তু বীণার ব্যর্থতা আপনার নিজের যে ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তা সত্ত্বেও আপনি হাসছেন কি করে ?

নারদ বললেন, একটা দুঃস্বপ্ন দেখার পর হঠাৎ যদি জেগে দেখি ওটা নিতান্তই স্বপ্ন, তা হ'লে কি আনন্দ হয় না ? প্রথমে যখন তার ছিঁড়ে বীণা শুরু হয়ে গেল, তখন মনে হয়েছিল ওটা আমার হৃদয়ের তার, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, তার ছেঁড়ায় আমার কোনো অপরাধ নেই, হৃদয়ের সত্ত্বেও ও-তারের কোনো যোগ নেই।

চিত্রগুপ্ত বললেন, আমি অসুমান করি জীবনের স্বপ্নের সত্ত্বে স্বপ্ন মেলাতে আপনার কষ্ট হয়েছে।

নারদ হেসে বললেন, জীবনের স্বপ্ন কাকে বলছ ?

চিত্রগুপ্ত বিস্মিত হয়ে জনতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, বললেন ঐ যে একদল লোক চলেছে প্রৌঢ় বয়সের, গায়ে মোটা কাপড় জামা, ঠিক যে মোটা কাপড়ের গান এক দিন ওরা গেয়েছিল, সেই গানের কথা আজ রূপ ধরেছে ওদের দেহে। দেশে আজ নিশ্চয় ওদের সম্মানীয় আদান। এখানে তরুণদের মধ্যে সেবারে যে উৎসাহ দেখেছিলাম, সেই উৎসাহ দেখছি ওদের মধ্যে। ওরাই হয়তো আগেকার সেই তরুণের দল। আজ ওদের স্বপ্ন সফল হয়েছে, ওরা দেশকে গড়ে তোলার জন্ত হয় তো আরও বড় রকমের আত্মত্যাগ করতে চলেছে। বাঙালীকে পৃথিবীর মধ্যো শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে চলেছে। দেশের দুঃখ-দৈন্য ঘুচিয়ে জনসাধারণকে টেনে তুলতে চলেছে উপরের ধাপে—

নারদ বাধা দিয়ে বললেন, এর আগে তুমি আমাকে এদের সত্ত্বে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে, আজ আমি তোমাকে এদের সত্ত্বে পরিচয় করিয়ে দিই। ওরা দেশকে বড় করতে যাচ্ছে না, ঐ লোকগুলো পারমিট সংগ্রহ করতে যাচ্ছে, কেউ বা ইস্পাতের, কেউ বা সিমেন্টের—

কেন ?

ওর সাহায্যে ব্যবসা করে বড় হবে। দেশের জন্ত ওদের বিশেষ ভাবনা নেই। দেশের জন্ত এককালে ওরা কেউ বা জেল খেটেছে, কেউ বা শোভা-রাজ্য যোগ দিয়েছে, তার দাম আজ ওরা কড়ায় গড়ায় বুঝে নিতে চলেছে।

চিত্রগুপ্তর মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। তবে কি এই দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন ? এই দেখে নিজে প্রায় বাঙালী হয়ে পড়েছিলেন ?

নিজের নিবুদ্ধিতা স্বয়ং করে তাঁর আরও বেশি লজ্জা হতে লাগল। কিন্তু নারদের কথাই যে অত্রান্ত তার প্রমাণ কি ? না-ও তো হতে পারে। তিনি

যেন একটু উত্তেজিত ভাবেই বললেন, না না, আপনি ভুল করছেন—ঐ দেখুন দলে দলে মেয়েরাও বেরিয়ে এসেছে পথে। আগে তো এ রকম কখনও দেখিনি, খুব মহৎ কোনো লক্ষ্য না হলে এ রকম হতেই পারে না—

নারদ বললেন, ওরা সিনেমা দেখতে চলেছে।

চিত্রগুপ্ত বসে পড়লেন একথা শুনে।

নারদ বললেন, বীণার তার কেন ছিঁড়েছে এবারে আশা করি বুঝতে পেরেছ।

চিত্রগুপ্তের কানে সে কথা গেল না। কারণ তাঁর মনে হল এবারে তিনি আর ভুল দেখছেন না। ভুল দেখলে যে নিজের নিবৃত্তিতা দ্বিতীয় বার প্রমাণিত হয়ে যাবে। তিনি সত্য দৃষ্টান্তে দেখতে লাগলেন—এবারে দলে দলে তরুণেরা বেরিয়ে এসেছে পথে, তাদের মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। তাদের এই উদ্‌গাম এবং উৎসাহ পূর্বকাল তরুণদের উদ্‌গাম ও উৎসাহকে স্মরণ করিয়ে দিল। চিত্রগুপ্তের চোখ মুগ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে।

নারদ ততক্ষণে তাঁর বীণাটি তুলে নিয়েছেন। তিনি ঐ বীণার সাহায্যেই চিত্রগুপ্তের স্বপ্ন ভেঙে দিনে পাঁজরে এক গুঁতো মেরে। বললেন, কি দেখছ ?

দেখছি এরা অস্তুত কোনো বড় লক্ষ্য বদে চলেছে। তাই নয় কি। এদের এই সম্মিলিত শক্তি এটি জাতির সম্মুখে কি কোনো আশার বাণী শোনাবে না ?

নারদ মুহূ হেসে বললেন, না, চিত্রগুপ্ত, না। ওরা শোনাবে বোম্বার আওয়াজ—

জাতির সম্মুখে কোনো আদর্শ ?

জাতির সম্মুখে মেয়ে মেয়ে টাকে নাচ দেখাবে—ভারী মজার সব নাচ। এম জন্ম এরা অক্রান্ত পরিশ্রম ক'বে অর্থাহারী লোকদের কাছ থেকে বহু টাকা চাদা আদায় কবেছে। ওদের যে আজ বিদ্যাদেবী সরস্বতী বিনর্জনের দিন।

চিত্রগুপ্ত উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, যাক, বাঁচা গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তিত হলেন—কাবণ এর পর একটা জাতির সর্বজনীন মৃত্যুব হিন্দাব লিখতে এই দুমূল্যের বাজারে আবার নতুন ক'রে খাতা বাঁধাতে হবে যে !

ইতিমধ্যে নারদ বীণার ছেঁড়া তারটি দ্রুত মেরামত ক'রে নিয়ে চিত্রগুপ্তের কানের কাছে শশান-সঙ্গীত বাজাতে লাগলেন। চিত্রগুপ্ত পুনরায় ভগ্নমোহ অবস্থায় লাকিয়ে উঠে চিন্তার ক'রে বলতে লাগলেন—মরণমেঘ জয়তে।

## সর্বানন্দ পরিবারের কথা

সম্ভব অসম্ভব নানা রকম সংবাদ আমদানি করে পাঁচকড়ি আড্ডা জমাতে খুব ওস্তাদ, তার কথা আমরা সব সময়েই উপভোগ করি।

এই খবরটাও পাঁচকড়ির কাছ থেকেই শুনলাম। বাংলা দেশের উত্তর-পূবে হিমালয়ের কোনো একটি খাড়া পাহাড়ের মাথায় নাকি এমন একটি বাঙালী পরিবার বাস করছেন, যাদের মধ্যে গত পাঁচ পুরুষ ধরে ষত লোক জন্মেছেন তাঁরা সবাই বেঁচে আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য ভাল, তাঁরা সবাই কোটিপতি, অথচ বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। আরও আশ্চর্য এই যে, পরিবারের প্রত্যেকটি স্ত্রী এবং পুরুষ দেখতে প্রায় এক বয়সী এবং তাঁরা সবাই অটুট-ষৌবন।

এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা যিনি তাঁর নাম সর্বানন্দ, বয়স চুয়ান্ন বছর। তাঁর পিতা ঈশ্বরানন্দ এবং পিতামহ বরাদানন্দ, তাঁরাও এই পরিবারভুক্ত। সর্বানন্দের পুত্র এবং পৌত্র অগণিত, পুত্রী এবং পৌত্রীও অনেক।

বিরাট পরিবার, এঁদের কারণে কখনও নাকি অসুখ করে না, এঁদের মৃত্যু নেই, এঁদের কোনো দিকেই কোনো অভাব নেই, দুঃখ নেই। এঁদের অর্থের, স্বাস্থ্যের এবং মানসিক শান্তির প্রাচুর্য অতীতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, এবং অদৃষ্টপূর্ব। তাঁরা কৌতূহলী দর্শকের হাত থেকে বাঁচার জন্য এক খাড়া পাহাড়ের মাথায় আশ্রয় নিয়েছেন, সাধারণ লোকের পক্ষে সর্বদা সেখানে যাওয়া সুসাধ্য নয়।

পাঁচকড়ির অন্যান্য কথার মতো এ কথাটাও হেসে উড়িয়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু পারলুম না।

পাঁচকড়ি উত্তেজিতভাবে বলল, তোমরা অপদার্থ, অভাগা এবং নাস্তিক। যে ঘটনা পৃথিবীর লোকে জানে, রয়টার যা প্রচার করেছে, তা জান না বলে তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু লজ্জা পাওয়া দূরের কথা, বিশ্বাসই করছ না! তোমাদের মরা উচিত।

বীরু আমাদের মুখপাত্র, সে বলল, বহু জিনিসই আমাদের উচিত অথচ তার একটাও না করে দিন তো এক রকম সুখেই কেটে যাচ্ছে, অতএব তোমার ঐ পাঁচপুরুষী পরিবারটার অস্তিত্ব যদি অস্বীকারই করি তা হলেও সুখেই থাকব। ওটা ছেড়ে আর কি বলবার আছে বল।

পাঁচকড়ি ক্ষেপে গিয়ে যা-তা বলে আমাদের গাল দিতে আরম্ভ করল।

শেষে একখানা কাগজ বের করে বীরুর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ।

পড়ে দেখলাম, সত্ত্ব প্রকাশিত বিশেষ সংস্করণ খবরের কাগজ, এবং পাঁচকড়ি যে খবরের বাহক হয়ে এসেছে সেই খবর তাতে ছাপা আছে। শুভিত্ত হলাম, কেননা এই খবরটার জন্মই বিকেলে বিশেষ সংস্করণটি বেরিয়েছে।

উচ্চ পাহাড়ের উপর অভাবনীয় আবিষ্কার! ঘটনাক্রমে এক ব্রিটিশ বিমান সেখানে নামতে বাধ্য হয়, ফলে এই অদ্ভুত বাঙালী পরিবারের কথা পৃথিবীর লোকে জানতে পেরেছে এবং এমনও শোনা যাচ্ছে এই যুদ্ধের নানা অসুবিধা উপেক্ষা করেও অ্যামেরিকা এবং ব্রিটেনের সাংবাদিক এবং বৈজ্ঞানিক দল বিমানযোগে সেখানে আসতে উত্তম হয়েছেন।

পাঁচকড়ির কাছে ধুঁটতার জন্ম ক্ষমা চাইলাম।

পাঁচকড়ি বলল, নাও নাও, আর ইয়ার্কি করতে হবে না, এখন আসল যা করার তাই কর। চল, আর কালবিলম্ব না করে আজই সেখানে রওনা হয়ে যাই। এ কথায় সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। সবাই মানে বীরু, তারক, ছানু, পানু আর আমি।

রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছতে কি কি অসুবিধা তা বিশেষভাবে আলোচনা করে এবং তার জন্ম সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আমরা পাঁচটি পুরুষ অজ্ঞাত-পরিচয় পাঁচপুরুষের ইতিহাস সংগ্রহ করতে রওনা হয়ে গেলাম।

কি করে সেই পাহাড়ের নিচে গিয়ে উপস্থিত হলাম তা এ কাহিনীর পক্ষে অবাস্তব। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বাঘ ভালুকের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শুধু পাহাড়টিতে চড়তেই আমাদের সাত দিন লেগেছিল।

গিয়ে দেখলাম ঘটনাটা সত্য। পাহাড়ের মাথা সর্বানন্দ পরিবারের রূপায় একটি স্বর্গীয় উদ্ভানে পরিণত। সেখানকার সবাই প্রায় এক বয়সী, সবাই সমান স্বাস্থ্যবান, কেবল কয়েকজন মেয়েকে দেখা গেল, তাদের মুখে ঘাড়ে এবং হাতে লম্বা লম্বা চুল। বাঙালী পরিবার সন্দেহ রইল না, তাঁরা বাংলাতেই কথা বললেন।

আমাদের দেখে তাঁরা যে খুব খুশি হলেন তা নয়, তবে তাড়া করেও এলেন না। সবারই মুখে কেমন যেন একটা উদাসীনতার ভাব।

একজন যুবক প্রশ্ন করলেন, এই দুর্গম পাহাড়ে তোমরা কেন এসেছ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি?

আমাদের মুখপাত্র বীরু বলল, খবরের কাগজে আপনাদের খবর ছাপা

হয়েছে, তাই পড়ে কৌতূহলবশত এসে পড়েছি। দেখতে এলাম সব সত্য কি না।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি সত্য কি না ?

বীর বলল, পাঁচ পুরুষ ধরে আপনারা বেঁচে আছেন, আপনাদের জরা-মরণ নেই, রোগশোক অভাব-অভিযোগ নেই—এ রকম যে হতে পারে, তাই আমরা জানি না।

তোমরা বোধ হয় নাস্তিক কিংবা মূর্খ, তাই জান না ; এ রকম বেঁচে থাকা আর এ রকম স্থখে থাকা সবার পক্ষেই সম্ভব।

কি ক'রে সম্ভব তা জানতে পারলে আমরাও চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। দয়া ক'রে যদি এ বিষয়ে কিছু বলেন! আপনারা এমন সৃষ্টিছাড়া জীবন কি ক'বে পেলেন, তাই জানবার জন্যই এত কষ্ট ক'রে পাহাড়ে উঠেছি।

ভদ্রলোক বললেন, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না, আমার বয়স মাত্র তিন বছর, কিছু বুঝিয়ে বলতে পারব না, চল আমার ঠাকুরদার কাছে তোমাদের নিয়ে যাই।

এক যুবক একটু দূরে একটা কলাগাছ থেকে পাকা কলা পেড়ে পেড়ে খাচ্ছিলেন, আমরা ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গেলাম। ঠাকুরদা কলা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি ?

তিন বছরের পৌত্রটি—যিনি লম্বায় পাঁচ ফুট—বললেন, এঁরা এসেছেন আমাদের সব খবর জানতে। শুনে ঠাকুরদা সর্বানন্দ একটু হাসলেন। এই ঠাকুরদাও যুবক।

বীর বলল, দয়া ক'রে যদি—

ঠাকুরদা বললেন, বাবার অমৃত্যু ভিন্ন আমি কিছুই বলতে পারব না, চল তাঁর কাছে নিয়ে যাই। ঠাকুরদার বাবা বসে বসে তামাক টানছিলেন, তিনি নলটি পুত্রের হাতে দিয়ে সব শুনলেন এবং বললেন, বাবার অমৃত্যু নেওয়া দরকার। সৌভাগ্যক্রমে বাবার বাবা সেইখানেই আসছিলেন, তিনিও যুবক, তাঁর কাছে অমৃত্যু চাওয়া হল। তিনি সব শুনে তাঁর পৌত্র সর্বানন্দকে সব বলতে অমৃত্যু দিলেন।

সর্বানন্দ মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বললেন, তোমরা এখানে এসে বিরক্ত করবে ভয়েই এত উচুতে বাসা বেঁধেছি, তোমাদের হাত থেকে দেখছি কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই।

বীর তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে ফস্ ক'রে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল, এবং



এমন অভিনয় করল যাতে তাঁর হৃদয় দ্রব হয়। কিন্তু হৃদয় বলে তাঁর কিছুই নেই, যেটুকু ছিল তাও যেন আরও কঠিন হয়ে উঠল। তিনি বললেন ইংরেজরাও চেষ্টা করেছিল কথা বের ক'রে নিতে, কিন্তু পারেনি।

আমরা বললাম, ইংরেজদের কাছে না বলে ভালই করেছেন। আমরা আপনাদেরই স্বজাতি, বাঙালী, আমাদের কাছে বনুন।

মনে হল আবেদনে কাজ হয়েছে। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সর্বানন্দ বলতে লাগলেন, আজ পঞ্চাশ বছর রয়েছি এইখানে, পরম সুখে, জীবনের উপর আর আকর্ষণ নেই, কেননা আমরা আর মরব না বলে বোধ হচ্ছে।

ভাগ্য যেন অশুকুল হল। বললাম, এ বকম হল কেন?

সর্বানন্দ বললেন, আরম্ভ যখন করেছি, সবই বলি। ১৮৭০ সনে আমার জন্ম, বাংলা দেশেরই এক গ্রামে। বড় গরিব ছিলাম, স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না, কিন্তু মনে উৎসাহ ছিল খুব বেশি। দারিদ্র্য মছ কবা আমার পক্ষে অসম্ভব হল।

ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম ছেড়ে শহরে, কিন্তু শহরেও কিছু সুবিধা হল না; লেখাপড়া ভাল জানতাম না, দেখলাম অল্প বিদ্যায় কিছুই করা যায় না। তারপর নানারকম ঘা খেয়ে মনে বৈরাগ্যের উদয় হল, এবং কয়েক দিনের মধ্যেই এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে জুটে গেলাম। তার পর বহু দুঃখের ভিতর দিয়ে এসে পড়লাম হিমালয়ে। সন্ন্যাসীর জীবন আদৌ ভাল লাগছিল না, কেননা সন্ন্যাসীর মন আমার ছিল না। কি ক'রে কিছু পরমা উপার্জন করা যায় সেই কথাটিই মাথার মধ্যে ঘুরছিল অনেক দিন, সেই পথই বেছে নিলাম।

এখানে এসে পাহাড়ীদের সাহায্যে চা বাগান তৈরির মতলব এলো মাথায়। দেখলাম বিদেশীরা এই কাজে বেশ সাফল্য লাভ করেছে, কিন্তু ইচ্ছা হলে কি হয়, স্বাস্থ্যও নেই শিক্ষাও নেই; কেবল কৌশল আর চাতুরির সাহায্যে চা বাগান তৈরি করা যায় না। সেজন্য অনেক টাকাও দরকার, টাকাই বা আমার কোথায়?

তবু সাহস ক'রে কাজ আরম্ভ করলাম, পাহাড়ীদের বৃষ্টিয়ে দিলাম তারাও বড়লোক হবে। সাহেবদের বাগান থেকে দুচারজন কুলিকে ভাগিয়ে আনা গেল, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল দুচার বছরের মধ্যে লাভজনক কিছুই হতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যেই ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়তে হল, পাহাড়ীরা আমার উপর বিশ্বাস হারাল। ক্রমে দেখলাম তারা আমাকে মানতে চায় না। তাই আমাকে এতদিন খাওয়াচ্ছি, সে দিকেও তাদের মনোযোগ আর

রইল না। তারা ক্রমেই আমার কথা অমান্য করতে লাগল, এবং আমার খাওয়া বন্ধ ক'রে দিল।

আমার স্বাস্থ্য তখন একেবারে ভেঙে পড়েছে, বয়স তখন ত্রিশের কাছাকাছি, কিন্তু দেখতে একেবারে বুড়ো হয়ে পড়েছি। এ রকম অবস্থায় পাহাড়ীদের উপর প্রভুত্ব করা চলে না। তখন নিরুপায় হয়ে তাদের কাছে নিজেদের ছোট করলাম, বললাম তোমরাই প্রভু, আমি তোমাদের গোলাম। এই কৌশলে আমার খাওয়াটা কোনো রকমে চলতে লাগল, কিন্তু স্বাস্থ্যের আর উন্নতি হল না। ক্রমে মৃত্যুর দ্বারে এসে পৌঁছলাম, কাসির সঙ্গে তখন রক্ত পড়তে আরম্ভ করেছে। কি আর করি, হতাশ ভাবে শুয়ে শুয়ে শেষের দিনের অপেক্ষা করতে লাগলাম; কিন্তু শুয়ে শুয়ে সময় আর কাটে না, এক একটা দিনকে এক একটা বছর মনে হয়—সমস্ত রাত ঘুম হয় না।

পাহাড়ীরা পাহাড় থেকে নেমে নিচে যায় সপ্তাহে একবার, সেখানে একবার ক'রে হাট বসে। সেইখান থেকে আটা ছাতু হুট্টা ইত্যাদি কিনে আনে। একদিন দৈবক্রমে তাদের আনা কোনো একটা মোড়কের এক টুকরো কাগজ আমার হাতে এসে পড়ল। তাতে একটা বিজ্ঞাপন ছিল, সেইটে পড়ে সময় কাটাতে লাগলাম। বড়ই ভাল লাগল। একটা কবচের বিজ্ঞাপন, বশীকরণ কবচের। লেখা আছে, ধারণ করলে যে কোনো লোক বণ হয়। পাহাড়ীদের হাতেপায়ে ধরে একখানা পোস্ট কার্ড সংগ্রহ কবলাম। একটা ভাঙা পেন্সিল ছিল আমার, তারই সাহায্যে কবচের অর্ডার পাঠিয়ে দিলাম জলন্ধরে। সামান্য দাম, ডি-পি এলো এবং আমিও কবচ ধারণ কবলাম।

হঠাৎ বীরুর মুখ থেকে বেরোল : ফল হল তাতে ?

সর্বানন্দ বললেন, ফল ! ধারণের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ দেখি আমাদের পাহাড়ে যত পাহাড়ী ছিল তারা সবাই বুকে হেঁটে আসছে আমার দিকে—সবারই মুখে এক কথা : প্রভু, আমরা আপনার দাস, আদেশ করুন কি করতে হবে। ক্রমে দেখি অন্যান্য পাহাড় থেকেও দলে দলে লোক আসছে, মায় চা বাগানের সাহেব মেমরা পর্যন্ত। আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের ঘাবতীয় লোক আমার ক্রীতদাস হয়ে গেল। আমি যা বলি তারা তাই শোনে। কিন্তু আমার জ্ঞান তারা আর কি করবে, মারাত্মক ব্যাধিতে আমি শয্যাশায়ী। জীবনের প্রতি মমতা ছিল আমার খুবই, কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি কোনো মায়াই যেন আর নেই, যে কটা দিন বাঁচি সেই কটা দিন আরামে কাটাতে পারলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সবাই মিলে আমার জ্ঞান চিকিৎসক নিয়ে এলো,

কিন্তু চিকিৎসক তখন আর কি করবে, কেননা এ ব্যাধির কোনো চিকিৎসাই সে যুগে ছিল না। আমি বললাম, আমার জ্ঞান আর কিছুই করতে হবে না, কেবল খানকত বাংলা বই আর কাগজ কিনে আন কলকাতা থেকে, তাই পড়ব শুয়ে শুয়ে।

বই এলো কলকাতা থেকে, কিন্তু সবই পুরনো সংবাদপত্র আর পঞ্জিকা। ভালই হল, কেননা আমার বিদ্যাতে ওর চেয়ে শক্ত কিছু বোঝার উপায় ছিল না। যারা এনেছে তারাও কিছু না বুঝেই কিনে এনেছে, বোধহয় কোনো জোচ্চোরের পানায় পড়েছিল।

যাই হোক, আমার কিন্তু ভাগ্য ফিবল ওতেই। পঞ্জির বিজ্ঞাপন পড়তে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল ধননা কবচের বিজ্ঞাপন। তৎক্ষণাৎ আনিয়ে ধারণ করলাম।

• জিজ্ঞাসা করলাম, ফল পেলেন ?

ফল। সাতদিনে লক্ষপতি—পনেরো দিনে কোটিপতি হলাম। শুয়ে আছি, এমন সময় শোনা গেল চারদিকে টুং ঠাং টুং টাং ঝন ঝন শব্দ—চেয়ে দেখি চারদিক থেকে টাকা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। পাহাড় ঠেলে টাকার স্রোত বয়ে আসছে উপরে—কৈ মাছের মতো লাফাতে লাফাতে আসছে। মাথার উপর দিয়ে মেঘ উড়ে যাচ্ছে—এক এক পশলা টাকা ফেলে দিয়ে গেল পাহাড়ের উপর। বিছানার নিচে ছাবপোকাকার মতো টাকা নড়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। আর সে বাছে টাকা নয়, টাঁদির টাকা, ভিক্টোরিয়া রাণীর ছাপ মাঝা, ঝকঝকে চকচকে সব টাকা। পাহাড়ীনা প্রথমে আনন্দে টাকার মতোই লাফাতে লাগল, কিন্তু দু তিন দিনের মধ্যে তাদেরও টাকায় বিতৃষ্ণা এলো। সে টাকা ঝাঁটা দিবে ঝাঁটসে বিদায় করা গেল না, পাহাড়ের চারদিকে গাছের গুঁড়ি একটার পর একটা সাজিয়ে তাদের রোধ করা গেল না, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে টাকার পাল এসে লুটিয় পড়তে লাগল আমার পায়ের কাছে, পোষা বিড়াল ছানার মতো পায়ে এসে তাদের গা ঘষতে লাগল, টাকার পাহাড় জমে গেল পাহাড়ের গায়ে।

আমার সে কি আনন্দ আর উত্তেজনা। সেই উত্তেজনায় শরীর আবার ভেঙে পড়ল। কত চিকিৎসা করানো গেল, বড বড ডাক্তার যে যেখানে ছিল সব শেষ হয়ে গেল।

তখন আবার পঞ্জির শরণাপন্ন হয়ে উন্নাদের মতো পাতা ওন্টাতে লাগলাম। পেলাম একটা মনের মতো বিজ্ঞাপন। মনে হল এইতে যদি ফল

পাই তো পাব, নইলে আর কোনো আশা নেই। বিজ্ঞাপনে দেখা আছে তিন ঘণ্টায় যৌবন লাভ।

এক সাহেবকে ধরে টেলিগ্রাম লিখিয়ে নিলাম এবং তাকেই পাঠালাম টেলিগ্রাম করতে। ওষুধ এলো। সে কি সাংঘাতিক ওষুধ! খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহটা ফুটবলের মতো এক ধাক্কা খেয়ে পনেরো হাত শূন্যে উঠে গেল।

বীরু প্রশ্ন করল, আবার ফুটবলের মতোই নিচে পড়লেন?

সর্বানন্দ গম্ভীরভাবে বললেন, না, হাক্কা, ব্যাধিমুক্ত, সর্ব উদ্বেগশূন্য, যৌবনের উন্মাদনায় উচ্ছল এক পরম বিশ্বয়কর টেনিস বলের মতো এসে নিচে পড়ে লাফাতে লাগলাম। যৌবনলাভ করতে তিন ঘণ্টা লাগল না, লাগল মাত্র তিন মিনিট। হিমালয়ের ধূলিকণা-বিরল আবহাওয়ার জন্মই বোধহয় দ্রুত কাজ হল।

আমরা সবিস্ময়ে শুনতে লাগলাম এবং মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলাম।

সর্বানন্দ বলতে লাগলেন, এত টাকা, এমন স্বাস্থ্য, আর সবার উপর এমন প্রভুত্ব নিয়ে মন বড় অশাস্ত হয়ে উঠল, তখনই ইচ্ছে হল বিয়ে করি। ইচ্ছা হওয়া মাত্র বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কন্যার পিতাকে বশীকরণ কবচের সাহায্যে স্মরণ করলাম। অবশ্য সে জন্ম মহাবশীকরণ কবচ আনাতে হয়েছিল, কেননা কন্যার পিতার দূরত্ব ছিল তিন শ মাইল, আর আমার কবচের ক্রিয়া হচ্ছিল মাত্র পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে। ইতিমধ্যে আমার পিতা এবং পিতামহকে আনিয়ে তাঁদেরও তিন ঘণ্টায় যৌবন বটিকা একটি করে খাইয়ে দিলাম। তাঁরা তৎক্ষণাৎ যৌবন লাভ করে পাহাড়ে সর্বত্র লাফালাফি করে বেড়াতে লাগলেন। অতঃপর তাঁরা দুজনেই এখানকার দুই পাহাড়ী কন্যাকে বিয়ে করে বসেছেন, কারণ আমার মা এবং ঠাকুমা দুজনে পূর্বেই মারা গিয়েছিলেন।

বীরু বলল, অদ্ভুত আপনার কাহিনী।

সর্বানন্দ বললেন, এখনও শেষ হয়নি। এবপর সকল কবচের সেবা কবচ—সকল মাদুলীর শিরোমণি—সর্বসিক্তি মাদুলী আনিয়ে ধারণ করলাম। এর গুণ পরীক্ষার জন্ম ধারণ করেই ইচ্ছা করলাম এই পাহাড়ে চিরবসন্ত বিরাজ করুক। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ধত কাক এবং অন্যান্য পাখী ছিল তারা সবাই সমস্বরে কুহু কুহু করে ডেকে উঠল—শাল গাছে, কলাগাছে, ধুতুরা গাছে। আমের মুকুল ধরল। সামনে তাকিয়ে দেখ। দেখ, নাম না জানা ফুলও ফুটেছে কত।

দেখলাম সত্যিই তাই, এই অসম্ভব জিনিসটা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি।

সর্বানন্দ বললেন, সর্বসিদ্ধি মাদুলীতে আমার এমন বিশ্বাস জন্মেছে যে এর একটা ধারণা করলে যা ইচ্ছে করা যায়। ধরনা কেন, যেয়েদের মাথায় চুল উঠে যাচ্ছিল, মনে করেছিলাম এই মাদুলী ওদের দেব। কিন্তু ওরা ভুল ক'রে কেশোদগম তেল এনে কাল মাথায় মাখতে গিয়ে বিপদে পড়েছে, যেখানে তেল লেগেছে সেই সব জায়গায় চার পাঁচ হাত ক'রে চুল গজিয়ে গেছে। আমি মজাটা দেখছি, দুদিন অস্থবিধা ভোগ করুক, তারপর সর্বসিদ্ধি মাদুলী দেব একটা ক'রে।

বীকু জিজ্ঞাসা করল, আপনার পোতের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছে, তখন তঁার বয়স তিন বছর। এটা কি ক'রে সম্ভব হল?

সর্বানন্দ বললেন, বোঝা উচিত ছিল। 'তিন ঘণ্টায় যৌবন' বটিকা খাইয়েছি সব শিশুদেব—একপাল শিশুর উপদ্রবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এখন মহা শান্তিতে আছি। শিশুরা যৌবন লাভ ক'বে অকালপক হয়েছে বটে, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

আমি লক্ষ্য করলাম সর্বানন্দ কবচের এত প্রশংসা করছেন, কিন্তু তঁার নিজের হাতে বা গলায় কোনো কবচই নেই। এর কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলাম, কবচের এমন গুণ যে একদিন মাত্র ধারণা করলেই তার ফল বরাবর স্থায়ী হয়, কবচ শেষে ফেলে দিলেও তার কাজ চলতে থাকে। এ যেন দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, আগুন জ্বলতে শুরু করলে কাঠিটি আর রাখার দরকার হয় না।

এই চিরবসন্তময় গগনস্পর্শী বাঙালী উপনিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নতুন জ্ঞান, নতুন অভিজ্ঞতা এবং নতুন দৃষ্টি লাভ ক'রে মুগ্ধ হলাম, পাঁচকড়িকেও অজস্র ধন্যবাদ দিলাম। আমাদের বিদায় নেবার সময় উপস্থিত হল। সর্বানন্দ আমাদের রাজকীয় ভোজে পরিতৃপ্ত করালেন। তারপর তঁার পরিবারের সবাই আমাদের চেহারা, স্বাস্থ্য এবং দুঃখ সহ্য করবার উৎসাহ দেখে সবিস্ময় দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমরা যে অতি নির্বোধ সে রকম মস্তব্যও প্রকাশ করলেন কেউ কেউ।

বীকু পকেট থেকে অটোগ্রাফের খাতা বের ক'রে সর্বানন্দের সম্মুখে ধরে বলল, আপনার একটি অটোগ্রাফ দিন, ছাত্র ক্যামেরা নিয়ে বলল একটি ফোটোগ্রাফও নিচ্ছি। সর্বানন্দ ফোটোগ্রাফে আপত্তি করলেন না, কিন্তু অটোগ্রাফে করলেন। বললেন, লেখাপড়ার মধ্যে আর আমাকে টেনো না,

ওসব প্রায় ভুলেই গিয়েছি। বীরু হতাশ হয়ে বলল, তা হ'লে আশীর্বাদ দিন।

সর্বানন্দ বললেন, তা অবশ্য দেব। আশীর্বাদ করি, তোমরা দেশে ফিরে গিয়ে তোমাদের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান উচ্ছেদে এবং চিকিৎসকদের মৃত্যুপাতে সাফল্যলাভ কর। আধুনিক বিজ্ঞানকেও ধ্বংস কর, আর মাদুলীর মহিমা প্রচার করতে থাক। ওষুধ যদি কিছু খেতেই হয়, একমাত্র দৈবপ্রাপ্ত বা স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত ওষুধ থাকবে।

বীরু প্রশ্ন করল, এতে কি আমরা অমর হব ?

সর্বানন্দ বললেন, ও ছাড়া অমর হবার আর কোনো পথ নেই। আমাদের দেখেও যদি এ শিক্ষা না পেয়ে থাক তা হ'লে আর কি বলি! যাও আর বিরক্ত ক'রো না, আমার অনেক সময় তোমরা নষ্ট করেছ—বলে তিনি উঠে পড়লেন, আমরাও তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে তৎক্ষণাৎ পাহাড় থেকে নামতে আরম্ভ করলাম।

এর পর কতদিন কেটে গেল, জলধরে টাকা পাঠিয়ে পাঠিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি, কিন্তু কোনো ফল পাইনি। মনে হচ্ছে নিচু জমিতে কোনো ফলই হয় না। আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে, গলায় এবং কোমরে মোট প্রায় পঞ্চাশটি ক'রে মাদুলী আছে, আজই সব ফেলে দেব ভাবছি।

## প্রথম দৃশ্য

বিচারক সভা বসেছে—আমাদের তিনজনের বিচার হবে। খুব বেশি ঘেরি হবে না মনে হয়, কারণ আজ আমাদের কৃতকর্মের সামান্য একটুখানি অংশ বিচার ক'বেই আমাদের সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত করা হবে এই রকম কথা পেয়েছি।

ব্যাপারটা খুব গুরুতর হয় তো মনে হবে না, এবং খুব যে লঘু তাও নয়, কেননা এর উপরে অস্তুত আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আমরা তিনজন কর্মপ্রার্থী—সিনেমা মহলে। তিন জনেই লেখক এবং শুধু তাই নয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন লেখক। সেটা অবশ্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কারণ সাধারণ লেখক হলে গল্প লিখেই জীবন কাটত, সিনেমা নাট্য অথবা সিনারিও লেখার হুরাশা ঘটত না। এই হুরাশা প্রায় গ্যাম্বলিং-এর পর্যায়ে পড়ে। লেগে গেল তো সাতদিনে বাড়ি এবং গাড়ি।

আমি তিনজনের কথা বলছি বটে কিন্তু আমরা পরস্পর অপরিচিত। আমরা সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে এগিয়ে দৈববশত একসঙ্গে জুটেছি এবং একসঙ্গে অপরাধী শ্রেণীভুক্ত হয়েছি।

ঘটনাটা খুলেই বলি। একটি অপরাধমূলক গল্প সিনেমাকার হাতে পেয়েছেন, সেটিকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করতে হবে এই রকম আয়োজন চলছিল, এমন সময় বহু আবেদনকারী (নিজ নিজ গল্প চালাবার আবেদন) থেকে আমাদের তিন জনকে বেছে নেওয়া হল। সিনেমাকার যে আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন সে কথা বলা বাহুল্য।

তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে গল্পটি মোটামোট আমাদের কাছে বিন সাতেক আগে বলেছেন।

তিনি চান, আমরা তিনজন পৃথক ভাবে, এর আবেদনের দৃশ্যটি কি রকম হওয়া উচিত তার একটা সিনেমাসমূহ খসড়া তৈরি করে আনি। ধারটি তাঁর মস্তে ভাল হবে তাকেই তিনি সমস্ত গল্পটির সিনারিও লেখার ভার দেবেন। তিনি আরও বলে দিয়েছেন যে তিনি গল্পের নায়ককে ছুরি হাতে প্রথম দৃশ্য দেখাতে চান।

আমরা সেই অনুসারে সাতদিন পরে সিনেমাকারের কাছে এসেছি। এসে দেখি তিনি একা নয়, আরও চার পাঁচ জন কর্তৃপক্ষীয় অথবা বিচারপট ব্যক্তি

তাঁর পাশে উপবিষ্ট। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল ওঁদের একজন পরিচালক, একজন সরকারী পরিচালক, একজন ক্যামেরাম্যান, একজন তন্ত্র সহকারী, আর একজন শব্দঘড়ী। আরও জানা গেল—ওঁদের মধ্যকার দু'তিনজনের রীতিমতো বন্ধের অভিজ্ঞতা আছে। আগে কখনও এতগুলো গুণী লোককে একসঙ্গে দেখিনি। দেখে শ্রদ্ধা, বিস্ময় এবং কিছু ভয়ও হল। নিজের ক্ষুদ্রতা বড় হয়ে দেখা দিল—পরীক্ষাটা দেখা দিল বিভীষিকারূপে। জীবনে এত বড় পরীক্ষাই দিইনি কখনো। বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটাতিনেক পরীক্ষা তো জলীয় ব্যাপার। জীবনের একটা বড় পরীক্ষা বিবাহ, সেটিতেও ভয় পেয়েছি। তা ভিন্ন সিনেমাই আমার ধ্যান এবং সিনেমাতেই জীবনটা কাটাব ভেবে বিয়ে ব্যাপারটা আরও ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল। কিন্তু সে সব কথা থাক। আপাতত বিষয় পরীক্ষা সামনে, এতদূর এগিয়ে এ পরীক্ষা আর এডাবার উপায় নেই।

সিনেমাকার বললেন, তোমার স্ক্রিপটটা পড়।

আমি বললাম, না, থাক। কিছুই বিশেষ লিখিনি।

তা হোক, যা লিখেছ তা থেকেই ধারণা হবে।

আমি খাতাখানা খুলে আমার লেখাটা সমকোচে শোনাতে লাগলাম। সেটি এই : “অস্পষ্ট আলোয় প্রথম দেখা যাবে একখানা ছোরার ছায়া—ক্রমশঃ ছোরাধারীর হাতের ছায়া, তারপর ছোরাশুদ্ধ হাত এবং হাতের মালিক। দ্বিধাভিত্ত অথচ দৃঢ় পায়ে, মুখে দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ নিয়ে নায়ক এক পাশ থেকে আর একপাশে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তার চলা দেখে মনে হবে যেন সে অবিলম্বে ভয়ঙ্কর কিছু করতে যাচ্ছে। তার অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর আলোয় দৃশ্য, হৈ-হৈ, নৃত্যগীত এবং উৎসব।”

বলা বাহুল্য দৃশ্যটি আমি একটি বিদেশী ছবি থেকে চুরি করেছিলাম, কিন্তু এমন নিপুণভাবে—যে ধরবার উপায় ছিল না।

পরিচালক খুব সংক্ষেপে বললেন, চারণ' ফুট হয়ে গেল—অথচ একটি গান নেই, কথা নেই, দর্শক নেবে না।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রার্থী তাঁর লেখাটি শোনালেন : “প্রথমে অন্ধকার। অন্ধকারে অদৃশ্য কণ্ঠে গান : ‘ভেবেছিস তুই ভবের হাতে ফাঁকি দিয়ে যাবি বেঁচে’—গান চলতে চলতে ক্রমশঃ আলো ফুটবে। দেখা যাবে নায়ক ছোরা হাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে। ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে, ঐ গানের সাহায্যে তাকে সতর্ক করা হচ্ছে না, তার অদৃশ্য শত্রুকে সতর্ক করা হচ্ছে। সে কথা সে স্বগত বলবে, যাতে দর্শক বুঝতে



পারে। তারপর গানের তালে তালে পা ফেলে সে আবার অঙ্ককারে মিলিয়ে যাবে।”

পরিচালক সহকারীর দিকে চাইলেন, সহকারী পরিচালকের দিকে চাইলেন। হঠাৎ পরিচালক বলে উঠলেন—আচ্ছা তৃতীয় স্ক্রিপটখানা শোনা যাক।

তৃতীয় প্রার্থী পড়তে লাগলেন : “দৃশ্য আবৃত্ত হতেই দেখা যাবে নায়ক ছোরা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ বড়ই বিষন্ন। কি যেন সে বলতে চায় অথচ বলতে পারে না। জ্র কুঁচকে যাচ্ছে—মুখের পেশী কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঠোট নড়ছে—অবশেষে কথা ফুটল—

বহুদিন মনে ছিল আশা  
ধরণীর এক কোণে                      বহিব আপন মনে  
ধন নয় মান নয়, শুধু ভালবাসা  
করেছিলুম আশা।

আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নায়কের জড়তা কেটে গেল, সে ছোরা ঘোরাতে ঘোরাতে ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে পায়চারী করতে লাগল এবং থেকে থেকে চিৎকার করে বলতে লাগল—“To be or not to be—That’s the question।” এমন সময় হঠাৎ অদৃশ্য সঙ্গীত—‘মাধবী বিধা কেন?’

গান চলেছে— নায়ক আবার চিৎকার ক’রে বলছে—

‘Arise black vengeance, from  
the hollow hell।  
Yield up O love, thy crown and  
hearted throne  
To tyrannous hate’.....

‘মাধব বিধা কেন’ গান শেষ হয়েছে। হঠাৎ বজ্র বিদ্যুৎ এবং ঝড় উঠে এলো, নায়ক আবৃত্তি করছে ‘দ্বিই লাফ? দেব লাফ?’ বলতে বলতে ফেড-আউট।”

শুনতে শুনতে ক্যামেরা-ম্যানের হাত নিশপিশ করছিল, পরিচালকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, অন্যান্য সহকারীরা বিষ্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। পাঠ শেষ হতে না হতে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, ওয়াগারফুল!

পরিচালক বললেন, দু’নম্বর স্ক্রিপটাও মন্দ নয়, কিন্তু এক্সট্রা এমনি একটি

দৃশ্যৰ অপেক্ষা কৰিছিলাম এতিয়ালৈ। আমাৰ দিকে চেয়ে বুলিলেন, বৰ্তমান কালটো এমন কম্পেন্স হৈছে যে তোমাৰ ঐ সৰল দৃশ্য একেবাৰে অচল। পানী সৰ কৰে বৰ—এখন চলে না। এখন দৃশ্য যত জটিল কৰ, মনে হ'বে যেন যথেষ্ট জটিল হ'ছে না। তাই এই তিনি নম্বৰ স্কিপটেৰ লেখককেই আমাৰা নিচ্ছি। ওপেনিং সীনে যা উনি ঘটাইছে তা চমৎকাৰ—আমাৰা ওৱ সৰে দূৰে একটা শ্মশান দৃশ্য বা ঐ বকম আৰ কিছু বোগ কৰে দেব, দেখবেন সাক্সেসটো।

আমাৰ আৰ বলাবাব কিছু ছিল না। শুধু সংক্ষেপে বুলিলাম, একখানা ক্ৰী পাস দেবেন সে সময়।

## বাস্তবহারা

একটি শহর এই কাহিনীর বঙ্গবন্ধু, কিন্তু কোন্ শহর তার পরিচয় নেই, চেনাও  
ধাবে না গল্প পড়ে। তত্পরি এর নায়ক-নায়িকা কোন্ সমাজের তাও  
লেখককে বার বার বলে দিতে হয়েছে, চেনা ধাবে না ভয়ে। সে জন্ম পাঠকের  
মনে হতে পারে কাহিনীটি আমি সিনেমার জন্ম রচনা করেছি, কিন্তু আমার  
নিজের তা উদ্দেশ্য নয়। তবে আমার সন্দেহ নেই যে অনেক সিনেমাকার এটি  
পড়ে প্রলুব্ধ হতে পারেন। এ গল্পের এইটুকুই মাত্র ছুমিকা। আসল  
গল্পটি এই :

মস্ত বড় বাড়ি। সে এক বিরাট ব্যাপার। ধারণা করা শক্ত। আগাগোড়া  
মার্বেলের কাজ। কিন্তু এ বাড়ির সব চেয়ে আকর্ষণীয় এর সিঁড়ি। অতি  
প্রশস্ত, চারখানা ফোর-সীটার পাশাপাশি চলতে পারে অবশ্য যদি সে বকম  
ব্যবস্থা করা যায়। সিঁড়ি মূল্যবান কার্পেটে মোড়া। দোতলায় উঠতে সিঁড়ির  
মাঝখানে বিশ্রামের জায়গা। সেখান থেকে ডান ধারে বেকে আটটি মাত্র ধাপ  
পার হলেই দোতলা। নিচে, সিঁড়ি যেখানে শুরু হল, সেখানটা হচ্ছে  
অভ্যাগতদের অপেক্ষা করবার জায়গা। বহু আসন চক্রকারে সাজানো, মাঝখানে  
বড় গোল টেবিল। দূরে দূরে আরও সব বিচিত্র আসবাবপত্র। এক কোণে  
প্রকাণ্ড এক পিয়ানো—গ্র্যাণ্ড অপরাইট।

এত বড় বাড়ি, এত পরিপাটি, কিন্তু মানুষ মাত্র একটি—ত্রিশ বছরের একটি  
মাত্র যুবক, নাম রাজেন্দ্রকুমার। গায়ে সর্বদা ড্রেসিং গাউন।

রাজেন্দ্র স্বভাবতই বেকার। কাজ পায়নি বলে নয়, কাজ তার দরকার  
নেই। কি যে সে চায় তা সে জানে না, অথচ কিছু যে চায় এ বিষয়ে সন্দেহ  
নেই। কখনো একখানা বই খুলে বসে (দশটি আলমারি বইতে বোঝাই),  
কখনো আয়নার সামনে (মানুষ-সমান কত যে আয়না যেখানে-সেখানে) চুল  
ত্রাশ করে, কখনো ছবি আঁকতে বসে, কিন্তু কোনোটাতেই তার মন বসে না।  
চেক-বই পকেটে নিয়ে ঘোরে, যখন-তখন চেক লেখে, মই করে, কিন্তু তখনই  
সেটা ছিঁড়ে ফেলে। কাকে দেবে চেক? বই সামনে নিয়ে গান গায়, আয়নার  
সামনে দাড়ি কামাতে-কামাতে নাচে পিয়ানো বাজাতে-বাজাতে সিগারেট ধায়।  
কখনো ডাকে ভজাকে। ভজা পরিচারক। বুড়ো মানুষ, ফতুয়া গায়ে, খাটো  
ধূতি পরা, কাঁধে গামছা, সর্বদা একটা গার্জিয়ান গার্জিয়ান ভাব।

আর একটি দৃশ্য : রাজেন্দ্র-ভবন থেকে কিছু দূরে একটি দোকানে নতুন সাইনবোর্ড টাঙানো হচ্ছে—তাতে ইংরেজীতে লেখা “ওয়াইনস অ্যাণ্ড ফুড।” পথচারী কেউ কেউ সেদিকে চেয়ে দেখছে, কিন্তু এ জন্তু কারো কোনো ভাবনা নেই মনে হচ্ছে। কিন্তু দোকানের ভিতরে এক কক্ষে দোকানের ইচ্ছদি মালিক জুড়া সম্পূর্ণ ভাবনাশূন্য নয়। এ পাড়ায় মদ খাবার লোক আছে কি না সে জানে না, মাত্র সহজাত সংস্কার ও সাম্প্রতিক কিছু অভিজ্ঞতা তার ভরসা। বাপ-মা-হারা এলিজা জুড়ার সহকারিণী। জুড়ার বড ভাইয়ের মেয়ে। সে বলছে, “এখানে দোকান খোলা এক বিরাট গ্যাম্‌লিং হঙ্গ, হয় তো দু’দিনেই বন্ধ ক’রে পালাতে হবে।”

জুড়া বলছে, “এ বুড়ার মন কিন্তু তা বলে না। আমার গণৎকারি যদি ঠিক হয় তা হলে দেখবি দোকান ভাল ভাবেই চলবে।”

মুখে বলছে বটে কিন্তু তবু জুড়ার মনে কিছু সন্দেহ আছে, সে খুব নিশ্চিত নয়। তবে পরীক্ষা করতে বাধ্য কি, এটাই তার মনের ভাব। এখন এলিজা যদি একটু উৎসাহ দেয় তবেই বৃদ্ধ জুড়ার মনে ভরসা জাগে। এলিজা উৎসাহ দেবে কি না সে কথা এখন থাক। এখন আমরা আবার ফিরে যাই রাজেন্দ্র-ভবনে।

দুদিন পাব হয়ে গেছে এর মধ্যে। যথারীতি ড্রেসিং গাউন সজ্জিত রাজেন্দ্র দোতলার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেয়ে এলো মাঝপথে, সেখান থেকে সিঁড়ির দ্বিতীয় পর্যায়। মনে যখন একটু স্মৃতি উদয় হয় তখন সে আর এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সিঁড়ির ধাপে পা দেয় না, ঝকঝকে পালিশ রেলিং-এর উপর ঘোড়ার মতো চেপে সড়াং করে নিচে নেমে আসে। আজ অকারণ একটা আনন্দে নেমে আসছিল সেইভাবে—কিন্তু নিচে পৌঁছেই এমন এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হল যে লজ্জায়, সঙ্কোচে, বিস্ময়ে এবং সম্ভবত কিছু পরিমাণ ভয়ে, একেবারে কেঁচোর মত হয়ে গেল। একটি ভদ্র যুবক সিঁড়ির রেলিং-এ ঝিপ ক’রে একটি ছোট বালকের মতো নিচে নেমে আসছে এ দৃশ্য আর যাকেই হোক একজন অপরিচিত যুবতীকে দেখাতে হবে তা সে কল্পনাই করতে পারে নি। তার মুখখানা হঠাৎ লজ্জায় বোকার মতো দেখাতে লাগল। কিন্তু এ কোন্ রাজকন্যার আবির্ভাব ঘটল তার সম্মুখে? সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ীর পর্নপুটে শিশিরভেজা লাগ্য নিষে এ কোন্ বসবার গোলাপ ফুটে উঠল তার আঙিনায়?

রাজকন্ডার মুখে মৃদু হাসি। মধুর ভঙ্গীতে মাথা হেলিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, “আমি বাস্তহারা, আমার নাম হানা, হাসনু হানা।”

রাজেন্দ্র ঢোক গিলে বলল, “আপনি বা-বা-স্ত—”

হানা হেসে বলল, “বিশ্বাস হয় না বুঝি? অবশ্য আপনার দোষ নেই, সবাই বাস্তহারার মাত্র একটি চেহারাই জানে, অর্থাৎ বাইরের দিক দিয়ে যে সর্বহারা। কিন্তু সে কথা থাক, কেননা হঠাৎ এখন সব বুঝিয়ে বলা শক্ত, হয়তো আপনি এখন কাজে বেরিয়ে যাচ্ছেন।”

রাজেন্দ্র এতক্ষণে কিছু প্রকৃতিস্থ হয়েছে, সে সে-কথার ঘোর প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, “না আপনি বসুন। বাস্তহারা কথাটার যে দু'মুখো অর্থ থাকতে পারে তা আমি আগে ভাবিনি।”

রাজেন্দ্রের এই অভিজ্ঞতার পথে হানা সহজেই তার অন্তরে প্রবেশ ক'রে গেল। তার মনের অন্ধকার কক্ষে কক্ষে হানা যেন আলো জ্বালাতে লাগল তার মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত কথার বলকে। রাজেন্দ্র যত বিম্বিত হতে লাগল, তত তার চেহারা ক্রমে বোকার মতো দেখাতে লাগল। আলাপ শেষে রাজেন্দ্র বুঝতে পারল মনের ভিতরেও একটা বাস্ত আছে এবং সেই বাস্ত থেকে চ্যুত হলেও বাস্তহারা হওয়া যায়। এই সংজ্ঞা অনুসারেই হানা বাস্তহারা, এবং মনের দিক দিয়ে কোথাও কোনো আশ্রয় না থাকতে সেও বাস্তহারা। রাজেন্দ্র খুব খুশি হয়ে পকেট থেকে চেক-বই নিয়ে লিখতে শুরু করল—বলল, “আপাতত কত পেনে আপনি খুশি হবেন?”

হানা বলল, “টাকা চাই কে বলেছে? টাকা চাই না, মানুষ চাই। টাকা দেওয়ার লোক যথেষ্ট আছে। আমি এসেছি মানুষ খুঁজতে। সংসারে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাস্তহারা নামক এক বিরাট সম্প্রদায় আছে, তাদের তো টাকা দিয়ে কিছু করা যায় না। ধরুন আপনার তো যথেষ্ট টাকা আছে, কিন্তু তবু আপনি বাস্তহারা। তাই বলছিলাম আসুন আমরা এমন একটা প্ল্যান করি যাতে সত্যিই এদের জুগু কিছু করা যায়। লক্ষ্মীটি, আমার কথাটা ভাবতে থাকুন, আমি আবার কাল আসব। কেমন?”

হানা বিদায় নিয়ে গেছে কখন রাজেন্দ্রের খেয়াল নেই। সমস্ত আবহাওয়া যেন একটা মধুর মানকতায় ভরে উঠেছে। রাজেন্দ্র স্বপ্ন দেখছে: তার মন দেহ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, সে তার দিকেই চেয়ে আছে। মনের মাথায় বোঝা, পিঠে বোঝা, ঘরছাড়া আশ্রয়প্রার্থীর মতো সে প্রান্তর-পথ পার হয়ে চলেছে। আশ্রয় চাই, কিন্তু কে দেবে?

ভজা দূর থেকে এতক্ষণ সব লক্ষ্য করছিল, এবারে ধীরে-ধীরে কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, “বাস্তহারী কে খোকাবাবু? কথাটা কানে এলো।”

রাজেন্দ্র চমকিত হল ভজার গলা শুনে। বলল, “আমি রে, আমি।”

“তিন-পুরুষের বাস্ত্ব থাকতে বাস্ত্বহারী? ও মেয়ে তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে বলে দিচ্ছি। সাবধান থেকে। আর কখনো ওকে এখানে ঢুকতে দেব না।”

রাজেন্দ্র বলল, “না রে, না—ভয় নেই। আমি বাস্ত্বহারী, হানা বাস্ত্বহারী, তুই বাস্ত্বহারী—হুনিয়ায় যে যেখানে আছে সবাই বাস্ত্বহারী! আজ কি আনন্দ, কি যে ঘটে গেল রে ভজা, তুই নিতাস্তই ভজা, তাই বুঝতে পারছিস না, বুঝতে চেষ্টাও করিস না।”—বলতে বলতে রাজেন্দ্র ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল এবং রেলিং-এর উপর দিয়ে সড়াং করে নিচে নেমে এসে পাগলের মতো পিয়ানো বাজাতে লাগল।

পরদিন আবার ওদের দেখা হল। এখন ওরা কথা বলার চেয়ে গান গাওয়াই বেশি পছন্দ করে। যখন-তখন গায়। ফুলগাছের ডাল ধরে ধরে গান গায়। সিঁড়ি ও আসবাবপত্রের আড়ালে-আড়ালে লুকোচুরি খেলার ভঙ্গিতে গান গায়। তার পর যখন হানা বিদায় নেয় তখন সিঁড়ির রেলিং বেয়ে ষথারীতি নিচে নামতে থাকে।

দিন সাতেকের মধ্যে রাজেন্দ্রের জীবনে এবং মনোজগতে কি যে বিপর্ষয় ঘটে গেল! হানা টাকা চায় না (যদিও এখন মাঝে-মাঝে নেয়), চেক লিখতে গেলেই খামিয়ে দেয় (সর্বদা ক্যাশ নেয়)—হানা মানুষ চায়। রাজেন্দ্রই কি সেই মানুষ? আগে ছিল না, এখন অবশ্যই হয়েছে। তার বাস্ত্বহারী সস্তাটি আবিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মানুষ হয়েছে।

রাজেন্দ্র ষথাসম্ভব শক্তি সংগ্রহ করতে লাগল, আত্মসমর্পণের প্রস্তাব সে আজই করবে। একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, কিন্তু উপায় কি? তা ভিন্ন সময়ের কৃত্রিম বিস্তার একটা সংস্কার মাত্র, অস্তরের রাজ্যে এক মুহূর্তে এক বছর পার হওয়া যায়, সে কথা কি মিথ্যা? কোনো অপরিচিত ছেলে ও মেয়ের দেখা হল। ছেলে বলল, ‘তোমাকে আমার ভাল লাগছে’, মেয়ে বলল, ‘আমরও লাগছে’—ছেলে তৎক্ষণাৎ বলল, ‘তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই’, মেয়ে বলল, ‘চল।’ এতে অগ্নায় কিছু নেই। তবু এক জনের পছন্দ হলে অল্প জন যদি রাজি না হয়, সংসারে মারাত্মক বিষ, দড়ি-কলসী অথবা চলন্ত গাড়ির চাকা ষথেষ্ট আছে। অতএব আজই সন্ধ্যায়।

সন্ধ্যায় ষথারীতি ড্রেসিং গাউনে সজ্জিত রাজেশ্বর হানার অপেক্ষায় বেলিং বেয়ে নিচে নেমে এলো। প্রতিদিন সে ঘড়ি ধরে ছটার আসে। রাজেশ্বরও ঠিক ছটার সময় নিচে নেমেছে, কিন্তু হানা কোথায় ?

ভজা একখানা চিঠি এনে দিল তার হাতে। সে খাম ছিঁড়ে যা পড়ল তাতে তৎক্ষণাৎ তার হৃদয় বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হল না, কারণ কাহিনী এখানে শেষ হতে পারে না। চিঠিতে লেখা ছিল, "ক্ষমা চাই ; কারণ, অসম্ভব। আমি চিরবিদায় নিচ্ছি। শ্রিয়তম, আবার ক্ষমা চাই।"

রাজেশ্বরকে উন্মাদ করার পক্ষে ঠিক এতখানি নিষ্ঠুরতার কোনো দরকার ছিল না। তবে মাত্রা কম হলেও প্রতিক্রিয়াটা একই হত সে কথা বলা বাহুল্য। মাত্রাধিক্যটা আমাদের চোখেই বেশি লাগছে।

রাজেশ্বর চিঠি পড়ে ক্ষণকাল স্থম্বিতবৎ দাঁড়িয়ে রইল, তার হাত-পা কাঁপতে লাগল, তার পর টলতে-টলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেল। হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে গেছে। এমনি অবস্থায় পথে পথে পাগলের মতো ঘুরল কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ তার চোখে পড়ল মদের দোকানের সাইনবোর্ড। সে এক মধ্য যেন একটা ইন্ধিত পেয়ে গেল, যেন তার জন্মই এ দোকান এখানে অপেক্ষা করছে।

রাজেশ্বরকে যখন কয়েক জন লোক ধরাধরি করে এনে বাড়িতে পৌঁছে দিল তখন রাত বারোটা। ভজা ভয় পেয়ে গেল। রাজেশ্বর জ্ঞানহারা মাতাল! এইবার ভজার জ্ঞান হারাবার পাল।

পরদিন সন্ধ্যায় তার জ্ঞান হল বহু চেষ্টার পর। সে বুঝতে পারল তার নিজের ঘরেই শুয়ে আছে সে। সব যেন স্বপ্ন, সব মরীচিকা। মদের তো আশ্চর্য শক্তি। সব ভুলিয়ে দেয়! তবে এসো সূরা দেবী, তুমিই আমাকে আশ্রয় দাও।

মদের দোকানের এট ইন্ধিত পাঠক গোড়াতেই পেয়েছেন, রাজেশ্বর পেল একটু দেরিতে। এক মরীচিকা-মরু পার হয়ে সে আর এক মরীচিকা-মরুতে প্রবেশ করল। এখন সে সর্বদা মদ খায়, নাচে, গায়, পিয়ানো বাজায়—যেমন সে আগে করত, কিন্তু তবু কত তফাৎ! এখন সে মৃত্যুপথযাত্রী। ডজন-ডজন বোতল আসে তার বাড়িতে। বন্ধুরা যারা খাব-খাব করছিল, এখন নিয়মিত এসে খায়, যারা গোপনে খেত, কেউ জানত না, তারা সবাই এসে জ্বোটে রাজেশ্বরের কাছে। তবু তারা কত তফাৎ! তারা কেউ ব্যর্থ প্রেমিক নয়। রাজেশ্বর কখনো দোকানে ঢোকে, বন্ধুরাও যায় তার সঙ্গে, কিন্তু

বন্ধুরা অকম্পিত পায়ে ষথাসময়ে সরে পড়ে, রাজেন্দ্রকে চ্যাংদোলায় ধরে ফিরতে হয়। বন্ধুদের অকৃত্রিম দলিল স্বাক্ষরিত হয় স্বরাদেবীর সঙ্গে। দোকানের চেহারা ফিরে যায় ক'দিনের মধ্যে।

সেদিন সন্ধ্যায় দোকানেই বসেছে রাজেন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে। বন্ধুরা একে একে উঠে গেছে, এখন সে একা। তার এখনও অনেক বাকী। সম্পূর্ণ পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে মদ খাবে। মাঝে মাঝে জড়িত স্বরে 'হানা—হানা' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। হঠাৎ তার কানে এলো তার পাশের কেবিনে তারই দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি। কে যেন সেখানেও 'হানা—হানা' ক'রে কাঁদছে। শেষে চার দিকের সকল কেবিন থেকে ঐ একই কান্না শোনা যেতে লাগল। নিঃশব্দ কক্ষ থেকে সবাই বেরিয়ে এলো টলতে টলতে। সমবেদনায় বিগলিত হয়ে সবাই পরস্পর গলাগলি ক'রে বসে পড়ল মেঝের উপর, এবং হানাকে ওরা প্রত্যেকেই কেন চায়, কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা না ক'রে (করবার ক্ষমতা ছিল না) সবাই সমস্বরে কাঁদতে লাগল। তার পর সবাই একই দুঃখে দুঃখী, এটা অস্তর থেকে বুঝতে পেরে সবাই একসঙ্গে মদ খেতে লাগল।

প্রতিদিনের পৌনঃপুনিক এই ইতিহাস রাজেন্দ্রের একই, এর আর বর্ণনা ক'রে লাভ নেই, কিন্তু এর পর আর একটি দৃশ্য এখানে উন্মোচন করা আবশ্যিক।

মদের দোকানের মালিক জুড়ার কক্ষ। রাত একটা। জুড়া ও এলিজার মধ্যে আলাপ চলছে।

জুড়া। “কেমন, বলেছিলাম না আমার মদ খাটবে? তুই আমাকে বোকা ভেবেছিলি, বলেছিলি এখানে দোকান চলবে না। তবে এতে তোরা বাহাদুরিও কম নয়। যে দশ জনকে এনেছিল, তারা ও তাদের বন্ধু-বান্ধব মিলিয়ে দিন প্রায় দু'হাজার টাকা বিক্রি হচ্ছে। তোরা বাংলা শেখা সার্থক, অভিনয় সার্থক।”

এলিজা। “কিন্তু কি ক'রে বুঝেছিলে যে এই সব বাঙালী যুবক প্রেমে ব্যর্থ হলেই মদ খাবে?”

জুড়া। “আমি অনেক বাংলা সিনেমা দেখেছি কি না, ভাল ভাল সব শিক্ষিত ছেলের যদি একবার প্রেমে ব্যর্থ করানো যায় তা হলে মদ তারা খাবেই।”

এলিজা। “তা এক রকম সত্যিই। তুমি আরও খুশি হবে দেখে—আমি তোমার দোকানের মূলধনও অনেকখানি সংগ্রহ ক'রে ফেলেছি এর মধ্যে।”



এলিজা দশ হাজার টাকার নোট জুড়ার হাতে তুলে দিল। জুড়া আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল, “তোমার হানা নামটিও বেশ সার্থক হয়েছে বলতে হবে।”

এলিজা বলল, “কেন? বহু জায়গায় হানা দিয়েছি বলে?”

জুড়া হাসতে হাসতে বলল, “তা এক রকম বটে। এইবার তুমি সিনেমায় নামতে পারিস, আর আমার আপত্তি নেই। তোমার বোম্বাই যাত্রা আজই ভোরের পেনে—টিকিট কেনা হয়ে গেছে।”

এর পর আরও একটু দৃশ্য বাকী আছে। এ দৃশ্যটি রাজেন্দ্রভবনে। রাজেন্দ্রের মৃতদেহের পাশে ডক্টর ভার্টিব্রেট এক্স-রে সরঞ্জাম নিয়ে বসে আছেন। তিনি ফিজিও-সাইকোলজি এবং সাইকো-ফিজিওলজি বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন বহু কাল। বর্তমানে তিনি বাঙালী যুবকদের অকালমৃত্যুর কথা শুনেই সেখানে এসে তাঁর পরীক্ষা চালান। সঙ্গে বহনযোগ্য এক্স-রে সেট থাকে। এক্স-রে ফোটো তোলা হয়ে গেছে, এবারে তিনি অদৃশ্য আলোর ছবি ক্রীনে প্রতিফলিত করে উপস্থিত ডাক্তারদের সামনে রাজেন্দ্রের মেরুদণ্ডের ছবি দেখাচ্ছেন। বলছেন, “এই দেখুন এর মেরুদণ্ড নেই, সম্পূর্ণ গলে গেছে। অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য। কারণ জন্ম থেকেই এর মেরুদণ্ড শক্ত ছিল না, হাড়ের উপাদানগুলো জেলির মতো নরম ছিল, তার উপরে সামান্য শক্ত একটি আবরণ ছিল মাত্র। কিছুদিন ধরে এক জাতীয় বাঙালী ছেলেকে লক্ষ্য করছি, তাদের মেরুদণ্ড জন্মাবধি ঠিক এমনি নরম। বাংলা সিনেমার নায়ক হবার বোঁক তাদের অভ্যস্ত বেশি। সিনেমার নায়করূপে যদি সে প্রেমে ব্যর্থ হয় এবং মদ খায় (সবাই বলে উঠলেন “যদি” নেই, খাবেই) তা হলে আর তাকে বাঁচানো যাবে না, কেননা বেশি মাত্রার অ্যালকহলে এই জাতীয় মেরুদণ্ড ধীরে ধীরে গলে যেতে থাকে, ঠিক যেমন উগ্র অ্যাসিডে শক্ত ধাতু গলতে থাকে। অবশ্য এ ছেলেটি সিনেমায় যায় নি, তবে বাবার সম্ভাবনা ছিল যোল আনা, দেখবেন অন্তত এর জীবনকাহিনীটি সিনেমার হাত থেকে বাঁচানো শুরু হবে।”

কথাটি মিথ্যা বলেননি তিনি। কারণ ডক্টর ভার্টিব্রেট ডাক্তারদের সঙ্গে বেরিয়ে আসতেই দেখেন সিঁড়ির গোড়ায় ডজন খানেক সিনেমা ডাইরেক্টর রাজেন্দ্রের জীবন-কাহিনীর কপিরাইট কিনবেন বলে এসে জড়া হয়েছেন।

## যাৰ্কিন সিনেমা-সার

নিচের গল্পটি পড়িয়াই পাঠকের মনে হইবে কোনো ইংরেজি বই হইতে চুরি । কিন্তু কোন্ বই হইতে, তাহা বলিতে পারিবেন না । কারণ, কোনো পাঠকই ইংরেজি সকল বই পড়েন নাই । আবার যাহারা ইংরেজি বই মোটেই পড়েন না, কেবল সিনেমা দেখেন তাঁহারা মনে কৰিবেন, গল্পটি কোনো সিনেমা-ছবি হইতে চুরি , কিন্তু কোন্ সিনেমা-ছবি তাহা বলিতে পারিবেন না ।

আমি নিজে কিছুই বলিতে চাহি না, অথচ পাঠকদিগকে ঠকাইবার প্রবৃত্তিও নাই । চুরি কৰিয়াছি বটে, কিন্তু কোনো একখানা বই বা ছবি হইতে নহে । বই হইতে বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে, আমি সিনেমা-ছবি হইতেই গল্পটি সংগ্রহ কৰিয়াছি । কিন্তু কোন্ কোন্ ছবি হইতে তাহা আমার স্মরণ নাই ।

পাঠকেরা অনেকেই অকৃশাস্পে এইচ সী. এফ. কৰিয়াছেন, এবং আশা কৰি কেহ কেহ তাহা অণুবধি মনেও রাখিয়াছেন । আমার এই গল্পটিও যাবতীয় সিনেমা-গল্পের এইচ. সী. এফ. । ইহাতে প্রায় সবই আছে । সকল সিনেমা-ছবিতেই যে একটি কমন ফ্যাক্টর থাকে তাহা ইহাতে আছে, কেবল গল্পটি নাই । কিন্তু গল্প দেখিতে তো আমরা সিনেমায যাই না । দেখিতে যাই ঘাত এবং প্রতিঘাত । সিনেমায যদি বিবাহ আগে হয় তাহা হইলে সে বিবাহ সুখের হয় না । আবার যদি বিবাহ পরে হয় তাহা হইলে ছবিখানি মিলনাস্ত হইয়া পড়ে, সমঝদার খুশি হয় না । বিবাহ মোটেই হয় না অথচ চিরদিনের জন্ত বিচ্ছেদ হইয়া গেল, এই ধরণের গল্পে দৰ্শকের চোখে জল আসে । দেড় ঘণ্টার ছবির মধ্যে আধ ঘণ্টা যদি নায়ক-নায়িকার চুম্বনেই কাটে তাহা হইলে তো কথাই নাই । কেননা চুম্বন কোনো অবস্থাতেই মিলনের ইঙ্গিত নহে, উহা একটি রহস্যময় ঘটনা । উহা যে কিসের ইঙ্গিত তাহা বুঝা যায় না । নায়কের আকর্ষণে নায়িকা কাছে আসে, উভয়ে উভয়ের জন্ত উন্মাদ হয়, নায়িকা ষথায়ীতি ঘাড় উঁচু কৰিয়া মুখ বাড়াইয়া দেয়, কিন্তু নায়ক যে মুহূর্তে নায়িকাকে চুম্বন করে সেই মুহূর্তে নায়িকার যাবতীয় স্বত্বিমূলক চুখ বুকের ভিতর উখলিয়া উঠে ; তখন হয় সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে, না হয় বলে, “How dare you ?” নায়ক তখন নিৰ্বোধের মত ফ্যাল ফ্যাল কৰিয়া তাহার দিকে তাকায়, সাধ্যসাধনা করে, কিন্তু নায়িকা ততক্ষণে পাখর

হইয়া গিয়াছে, কোনো সাড়া দেয় না। নায়ক হতাশ হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু চলিয়া যাইবামাত্র নায়িকার স্বপ্নভঙ্গ হয়। নায়ককে পাইবার জন্য তখন সে অস্থির হইয়া ওঠে, এবং তাহার পশ্চাৎদান করে। কিন্তু চুখনের পূর্বেই যদি দৈবক্রমে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ হইয়া যায় তাহা হইলে নায়ককে আমরা গভর্ণমেন্টের নিকট অপরাধী হিসাবে কিংবা শত্রুহস্তে বন্দী অবস্থায় দেখি। গভর্ণমেন্ট যখন ভুল বৃত্তিতে পারে তখনই গল্প শেষ হইয়া যায়। শেষ দৃশ্যের চুখন গভর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করে।

দুই লোকের শত্রুতাও গল্পকে বিশেষ পুষ্ট করে। নায়ক শত্রুর হস্তে পড়িয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কতকগুলি লোক ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া নায়ককে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু এগুলি শুধু বৈচিত্র্য হিসাবেই দেখি, গল্পের মূলে পৌঁছিতে হইলে এসব অগ্রাহ্য করিতে হইবে। নায়ক-নায়িকা উভয়ে যতক্ষণ উভয়কে পাইবার জন্য ব্যাকুল, অর্থাৎ আকর্ষণ যতক্ষণ প্রবল ততক্ষণ প্রকৃতির কোন অলজ্জা নিয়মে উভয়ের মধ্যে বিকর্ষণ চলিতে থাকে তাহা বুঝা যায় না। এবং বুঝা যায় না বলিয়াই সিনেমার আকর্ষণ ক্রমশ বাড়িতেছে। আকর্ষণের একটি বিশেষ কারণ এই যে সিনেমায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে যে ঘটনা-পারস্পর্য থাকে তাহাকে এরূপ অবশ্যজ্ঞাবী বা inevitable করিয়া তোলা হয় যে মানুষের জীবনে সিনেমাশুলভ ঘটনাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বোধ হয়। টাইপিষ্ট বা পরিচারিকা এই সিনেমার অনিবার্য রীতিতে পড়িয়া লক্ষপতির গৃহিণী হইতেছে, পথের ভিখারী রাজা হইতেছে, অপরিচিত নায়ক-নায়িকা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবামাত্র গভীর প্রেমে পড়িয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে, অথবা হতাশ হইয়া তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিতেছে। ইহাই তো সত্যকার জীবন।

জীবনে যে ঘটনা আজ আরম্ভ হইল তাহার পরিণতি কত দিনে দেখা যাইবে তাহা কেহ জানে না। আবার যে পরিণতি দেখা যাইতেছে তাহার আরম্ভ কবে হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া রাখা দায়। সত্যকার জীবনে জীবনকে জানিবার এই অসুবিধা সিনেমা দূর করিয়াছে। সন্ধ্যা ছয়টায় যাহা আরম্ভ হইল রাত্রি আটটায় তাহার পরিণতি অবশ্যই দেখা যাইবে; এতটা নির্ভরতা আমরা প্রিয়তমের নিকট হইতেও আশা করি না।

প্রথম জীবনে সিনেমার সুখে সুখী হইয়াছি এবং সিনেমার দুঃখে বহু অশ্রুপাত করিয়াছি। এখনও অভ্যাসবশত সিনেমায় যাই বটে, কিন্তু তাহা সুখ বা দুঃখ অনুভব করিবার জন্য নহে, সন্ধ্যাটা কাটাইবার জন্য। জীবন-সন্ধ্যা যেমন

যাহুঁষের মনে একটা নৈরাশ্র আনিয়া দেয়, দিন-শেষের সন্ধ্যাও তেমনি মনের উপর নিরাশার ছায়াপাত করে। ইহাই ত ছায়াচিত্র দেখিবার উপযুক্ত সময়। সমস্ত দিনের হিসাব মিলিয়া গেলে সময়ের উপর আর কোনো মায়া থাকে না। বৃদ্ধেরা পশ্চাৎ দিকে চাহিলেই সমস্ত জীবনটা একসঙ্গে দেখিতে পায়। কিন্তু জীবনে যদি কিছু অদৃশ্র অংশ না থাকে তাহা হইলে আশা করিবার, বিশ্বাস করিবার কিছুই থাকে না, অর্থাৎ জীবনের রহস্যটাই চলিয়া যায়; থাকে শুধু হরিণাম। সিনেমা দিন-শেষের হরিণাম।

অর্থাৎ ইহাতে সুখও নাই দুঃখও নাই, যদি কিছু থাকে তবে তাহা বিরক্তি। কিন্তু বিরক্তি হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি। মনের রহস্য যাহাদের আর ভাল লাগে না, তাহারা সাইকো-অ্যানালিসিস করে, বিশ্ব-পৃথিবীকে যাহারা ভালবাসিতে পারিতেছে না তাহারাই ইহাকে ধাঁধা আখ্যা দিয়া ধাঁধার উত্তর দিবার কাজে লাগিয়াছে। ইহারাই বৈজ্ঞানিক। আমিও এখন সিনেমার টেকনিক বিশ্লেষণ করিতেছি। এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়াই নিয়মিত গল্পটি প্রস্তুত করিয়াছি। গল্পটি Made in India, কিন্তু ইহার অংশগুলি হলিউড হইতে সংগৃহীত। আমি assemble করিয়াছি। একই গল্প বিভিন্ন পোষাকে আজ সাত বৎসর ধরিয়া দেখিতেছি। আমার গল্পে এই সাত বৎসরের দেখা গল্পসমূহের সার প্রস্তুত করিয়াছি মাত্র। বলা বাহুল্য, গল্প সম্পর্কে ইহা নিতান্তই আমার।

### গল্প

বেলিংহাম গ্রামের লোকদের মধ্যে অস্বাভাবিক চঞ্চলতা দেখা যাইতেছে। গ্রামের যে কয়েকটি যুবক যুদ্ধে গিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশেরই মৃত্যু হইয়াছে, মাত্র একজন কি দুইজন এখনও জীবিত আছে।

বেলিংহাম ইংলণ্ডের উত্তরে নর্দাম্বারল্যাণ্ড জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রস্তুত একটি গির্জা আজিও এই গ্রামে বিরাজ করিতেছে। এই গির্জাঘরে গ্রামের বৃদ্ধেরা জুটিয়া যাহাতে জীবিতেরা জীবিত থাকে, মৃতেরা সদগতিলাভ করে এবং শত্রুপক্ষ হারিয়া যায় সেই মর্মে প্রত্যহ প্রার্থনা করে।

এই গ্রাম হইতে হ্যারি নামক তেইশ বৎসরের একটি দরিদ্র যুবক ১৯১৪ সালে যুদ্ধে গিয়াছে, আজ তাহার বয়স প্রায় সাতাশ বৎসর হইয়াছে,

আজিও সে কেবে নাই, এখনও তাহাকে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইতেছে।

বেলিংহামের নামকরা কয়লার ব্যবসায়ী উইলিয়াম কেম্প তাঁহার দুই পুত্রকে মহাযুদ্ধে হারাইয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা লুসিকে লইয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন। এই লুসির সঙ্গে হারির কিঞ্চিৎ বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু লুসির পিতা দরিদ্র হারিকে আমল দেন নাই, এবং কন্যাকে তাহার সহিত মিশিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু নদীর বেগ কেহ বাধ দিয়া ঠেকাইতে পারে না। বাধা পাইলে নদী সেখানে প্রথমত ঘোর আবর্ত সৃষ্টি করে, পরে হয় সে বাধা ভাঙিয়া ফেলে, না হয় অল্প পথ কাটিয়া চলে। লুসিও পিতার দিক হইতে বাধা পাইয়া থামিয়া থাকে নাই। সে তাহার তরুণী হৃদয়ের সমস্ত আবেগ লইয়া নূতন পথে প্রতিবেশী রবিন্সনের দিকে ছুটিয়াছিল। কিন্তু রবিন্সনও যুদ্ধে চলিয়া গেল। মহাযুদ্ধের আহ্বান, মহাকালের আহ্বান, মানুষের ক্ষমতা তাহার কাছে হার মানিতে বাধ্য।

এই সময় দেশের মধ্যে একটা নূতন ভাবের স্রোত বহিতেছিল। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যকার ব্যবধানবোধ সকলের মন হইতেই ঘুচিতে আরম্ভ করিয়াছে। জগৎ অনিত্য, কিছুই স্থির নহে, সমস্ত মায়া, এই সত্যটি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মনকেই আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। যখন তখন আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিতেছে, দলে দলে নূতন লোক যুদ্ধে যাইবার জন্ত নাম লিখাইতেছে, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া জীবনটাকে ফান্সের মত আকাশে উড়াইয়া দিতেছে। জীবন লইয়া খেলা; লক্ষ লক্ষ প্রাণ হাওয়ায় ছড়াইয়া দেওয়ার খেলা।

রবিন্সনের মৃত্যুসংবাদ আসিল। মৃত্যুসংবাদে নূতনত্ব নাই। একটি সম্ভানের মৃত্যুর জন্ত একটি পিতা বা একটি মাতার পৃথক ভাবে কাঁদিবার দরকার হয় নাই। যুরোপের সকল সম্ভানের জন্ত সকল পিতামাতা সমগ্রভাবে কাঁদিতেছে।

রবিন্সন মরিল। লুসিও তৎক্ষণাৎ হারির স্মৃতিটি নূতন করিয়া মনের মধ্যে ঝালাইয়া লইল। হারির পরিত্যক্ত ফোটোখানা লকেটের ভিতর আশ্রয় পাইয়া আবার তাহার বুকে ঢুলিল। যুদ্ধের কঠিন ধাক্কায় ধনীদরিদ্র-বোধ সকলের মন হইতেই ঘুচিয়া গিয়াছিল। স্মরণ্য যুদ্ধশেষে যদি হারি প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে তবে লুসির সঙ্গে তাহার মিলন ঘটিতে অন্তত লুসির পিতার দিক হইতে আর কোনো বাধা থাকিবে না। হারি নিরাপদে ফিরিয়া আসুক, তাঁহার মন দিবারাত্র এই প্রার্থনাই করিতেছিল। না আসিলে

কি উপায় হইবে? বহু বর্গমাইলের মধ্যে লুসিকে বিবাহ করিতে পারে এরূপ যুবক কেহ জীবিত ছিল না।

ইতিমধ্যে আমরা মহাযুদ্ধের শেষ অধ্যায় দেখিতেছি। ফ্রান্স হইতে জার্মানগণ হটিয়া যাইতেছে। হারি প্রকৃত বীরের মত যুদ্ধ করিতেছে। চারিদিকে সৈন্যগণ কেহ মরিতেছে, কেহ আহত হইতেছে, কেহ আত্নাদ করিতেছে, কিন্তু হারি অক্ষতদেহে দৃঢ়চিত্তে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মেশীন গান ছুঁড়িতেছে। চারিদিকে অঙ্ককার, বজ্রের গায় কামানের গোলা শূন্যে ফাটিয়া মাঝে মাঝে সেই অঙ্ককারের বুক আলোকিত করিতেছে। সেই আলোর দীপ্তিতে আমরা হারির অমাহুষিক বীরত্ব উপভোগ করিতেছি। জার্মানগণ বিরামহীন মেশীন গানের সম্মুখে টিকিতে পারিল না, এবং এই পরাজয়ের ফলে তাহারা St. Quentin ফরাসীদিগকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল।

আমরা গল্পের প্রারম্ভে দেখিয়াছিলাম, লুসি হারির ফোটে আবার লক্ষেতে স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে কত কি পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা দেখিবার অবসর পাই নাই। যুরোপ এমন একটি অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যখন প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে এক একটি যুগান্তর ঘটিয়া যাইতেছে। লুসিকে আমরা বেলজিয়ামের একটি গ্রামে নার্স অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি। একা উদ্বেগপূর্ণ মনে চতুর্দিকের একটা অস্থিরতার মধ্যে প্রতিনিয়ত বাস করার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া নার্সের কাজ করা ঢের সহজ। লুসি, মনের সহিত এবং পিতামাতার সহিত অনেক দ্বন্দ্ব করিয়া রিক্রুটিং অফিসারের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত সেবাস্বর্গই গ্রহণ করিল। রবিন্সন নাই। দেশে আর কেহই নাই। লুসি কাহার আশায় থাকিবে? হারি এখনও জীবিত। হারি দরিদ্র কিন্তু সে শুধু লুসির পিতার কাছে। তবে হারির যুদ্ধখ্যাতি লুসির পিতার কাছেও পৌঁছিয়াছিল, এবং তিনিও শেষে হারির প্রশংসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই প্রশংসাই লুসির মনে সহসা নূতন করিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। বিশেষত যুদ্ধক্ষেত্রে ধনীদরিদ্র ভেদ নাই, সকলেরই এক পোশাক, এক কর্তব্য।

লুসি সত্যিই সিঁটার হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার চেহারার মধ্যে একটা স্বর্গীয় দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। একান্ত নিষ্ঠার সহিত সে আহত সৈনিক-গণকে সেবা করিতেছে; সে যেন বহুকালের অভ্যস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলে বাধা, কে বলিবে সে মাত্র পনেরো দিন হইল নূতন জীবন গ্রহণ করিয়াছে। বহিরাবরণ শুভ্র হইলেও লুসির অন্তরে উদ্দীপনার রাক্তমা। এই উদ্দীপনা না থাকিলে কেহ কোনো প্রেরণা লাভ করে না। নার্সের কাজ সহজ নহে। নির্বিকার

চিত্তে আহতের আর্তনাদ সহ্য করিতে হয়। চারিদিকে বিকৃত এবং বিকলাঙ্গ মাহুষের মধ্যে সর্বদা বাস করিতে হয়, মনকে কঠিন করিয়া না রাখিলে চলে না।

লুসি অবসর পাইলেই হারির ফোটোর লকেটখানা খুলিয়া দেখে, আপনার মনে কি ভাবে, ছবিটাকে চুম্বন করে, একবার লকেট বন্ধ করে কিন্তু আবার খোলে, আবার চোখের জলে লকেট ভিজিয়া যায়, আবার তখনই চোখ মুছিয়া রোগীকে ঔষধ খাওয়াইতে যায়।

হারিদের দলের একটি যুদ্ধ শেষ হইয়া তাহারা একটি শহরে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। ফরাসী হোটেল। মদ আর স্ত্রীলোকের মধ্যে সৈন্তগণ বেপরোয়া স্ফুর্তি চালাইতেছে। নাচিতেছে, গাহিতেছে, মারামারি করিতেছে। হারি যে মেয়েটির সঙ্গে বসিয়া মদ খাইতেছে, সে মেয়েটি অল্প ইংবেজি জানে। তাহার মুখে একটা লাবণ্য এবং একটা বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার নাম লী। অদূরে বাজনা বাজিতেছে। কি একটা সুর বাজিতেই লী হারির হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। সুরের সঙ্গে তাহার নাচবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। লী হারিকে লইয়া নাচিতে লাগিল।

হারি লীর মুখের দিকে চাহিয়া নাচিতেছে এমন সময় হঠাৎ তাহার নাচ থামিয়া গেল। সে লীর চোখের দিকে এক দৃষ্টিে চাহিয়া রহিল। লী সে দৃষ্টির প্রভাব সহ্য করিতে পারিল না। দুইজনে একটা মাদকতায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দুইজনেই দুইজনের মধ্যে যেন একটা জন্মান্তরের সংস্ক আবিষ্কার করিল। যেন উভয়ে বহু জন্ম ধরিয়া উভয়কে চেনে। এই উপলক্ষের মুহূর্তে বাহিরের জগৎ তাহাদের কাছে লুপ্ত হইয়া গেল। দুইজনে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বন্ধ হইয়া চুম্বনের মধ্যে সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ ডুবাইয়া দিল। সমস্ত চঞ্চল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দুইটি স্তব্ধ প্রাণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—সে কি মহিমময় দৃশ্য!

কিন্তু স্ত্রীলোকের মন রহস্যময়। এই মুহূর্তে তাহার কি এক স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এত দিন নাচ গান ও আত্মবিক্রয়ের সহস্র মুহূর্তগুলি অবলীলাক্রমে পার হইয়া যাইবার সময় তো এই স্মৃতি তাহার মনে জাগে নাই! এখন কেন জাগিল? তাহার উত্তর লী দিতে পারে না, কিন্তু তাহার চোখে জল আসিল। হারি টেবিল হইতে মদের গ্লাসটি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, লী, আমাকে ক্ষমা কর, আমি কি অজ্ঞাতসারে তোমাকে আঘাত দিয়াছি? কোনো অতীত দুঃখ কি তোমার মনে জাগিয়াছে? বল, লী, বল—আমি যে আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।

কিন্তু লী কোনো কথাই বলিল না। টপ টপ করিয়া তাহার অশ্রু মন্দের ঘাসে পড়িতে লাগিল। তারপর হঠাৎ ঘাসটি টেবিলের উপর রাখিয়া লী বাহির হইয়া গেল। হারি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল সেখানে অপেক্ষা করিয়া পরক্ষণেই লীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া হারি লীকে ধরিয়া ফেলিল, এবং আবেগভরে বলিল, লী, আমাকে কঠিন শাস্তি দাও, কিন্তু একরূপ ভাবে কথা না বলিয়া চলিয়া যাইও না।

লী তথাপি নিরুত্তর। হারির সহের নীমা ভাঙিল। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এমন সময় দূরে সৈন্যদের স্থানত্যাগের বাজ বাজিয়া উঠিল। হারির বুক সেই বাজের তালে তালে ফুলিতে লাগিল। আর মাত্র এক মিনিট সময়। হারি ঘড়ি দেখিল। ঘর হইতে সৈন্যগণ বাহির হইতেছে। তাহাদের হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকেরাও বাহিরে আসিয়াছে, সকলেই বিদায় চুম্বনে মত্ত হইয়াছে, কিন্তু হারির জীবন মকভূমি। লী এখনও তাহার নীববত্না ভঙ্গ করে নাই। পাশেই একটা ছোট গাছ ছিল, অগত্যা হারি তাহার পাতাগুলি টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, কিন্তু তথাপি লীর মৌনব্রত ভঙ্গ হইল না। হারি গাছের শেষ পাতাটি ছিঁড়িয়া চিৎকার করিয়া বলিল, নিষ্ঠুর!—তার পরই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

লীর যেন হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গ হইল। চারিদিকে উন্মত্তের মতো চাহিল, দেখিল হারি নাই। সেখান হইতে সৈন্যদের লাইন ধরিয়া ছুটিতে লাগিল, প্রত্যেক সৈনিকের মুখের দিকে ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু কোথায় হারি

মার্চ সঙ্গীত বাজিতেছে। লীর যেন মনে হইতেছে তাহারই অন্তর ভেদ করিয়া বিদায়-বাজ বাজিতেছে। স্ত্রীলোক হইয়া সে কত সহ্য করিবে। লী আর দৌড়াইতে পারিল না, পথের ধারে বসিয়া পড়িল। তাহার বুকের মধ্যে তখন মহাসমুদ্রের ঢেউ ভাঙিতেছে। কতক্ষণ লী সেখানে বসিয়া ছিল তাহা তাহার খেয়াল নাই। যখন উঠিল তখন চারিধারে কেহ নাই, লী একা সেই জন-বিরল মাঠে রাত্রির অন্ধকারের মতোই অন্ধকার দৃষ্টি লইয়া পথ চলিতে লাগিল।

লী এক পা এক পা করিয়া হোটেলের ফিরিয়া আসিল। বেদনাভারে মাথা নিচু হইয়া গিয়াছে, চোখ হইতে অশ্রুর স্রোত বহিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে টেবিলটিতে তাহার কিছুক্ষণ পূর্বে বসিয়াছিল সেইখানে আসিয়া লী কিছুকাল শুক হইয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে মন্দের ঘাসটি তুলিয়া



লইয়া বৃকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর সেটাকে চুষন করিল, তারপর সেটাকে লইয়া ধীরে ধীরে ঘরে গেল। লী হোটেলেরই থাকে, হোটেলের ক্রেতাকে সে গান গাহিয়া খুশি করে, মাহিনা পায় একশত ফাঁ।

ইহারই মধ্যে আমরা এক মাস পার হইয়া আনিলাম। পার হইতে মুহূর্তকাল লাগিল। কিন্তু এই মুহূর্তকালের মধ্যে কি আমরা অণু কিছুতে দৃষ্টিপাত করি নাই? করিয়াছি। আমরা ইত্যবসরে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা দেখিয়াছি। অবিশ্রান্ত কামানের গর্জন, ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, জল, পান, কাঁটা তার, মেশীন গানের গুলি, এষারোপেন হইতে বোমা নিক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া সৈন্যদের যুদ্ধ কৌশল দেখিবাদ স্বেযোগ পাইয়াছি। সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথে বিদ্রুতবে বলকেব মতো ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; দলে দলে লোকের প্রাণ বিসর্জন দেখিয়াছি, মৃত্যুঘন্ত্রণার মর্মভেদী হাহাকার শুনিয়াছি, তারপর হঠাৎ যুদ্ধেব সমস্ত কোলাহল এবং দৃশ্য চোপেব সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া দিনের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দেখা গেল, প্রকাণ্ড একটা বাড়িকে সাময়িক ভাবে হাসপাতালে পরিণত করা হইয়াছে। রোগীর শয্যাগুলি পর পর চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। যুদ্ধের আহত সৈনিকগণ, কাহারো হাতে কাহারো পায়ে কাহারো মাথায় কাহারো বৃকে বাণ্ডেজ বঁধা। পর পর শুইয়া আছে। নার্সগণ অতি তৎপরতার সহিত রোগীদের শুশুণায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি রোগী আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাহার প্রবল জ্বর ও বিকার, খুব সম্ভব ক্ষতস্থান সেপটিক হইয়াছে। পাশে নার্স তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছে, ইহারই মধ্যে নার্স একবার তাহার উত্তপ্ত কপালে নিদ্রের মুখখানি রাখিল, কিন্তু অমহু উদ্ভাপে বেশিক্ষণ রাখিতে পারিল না। বলা বাহুল্য বোগীটি হারি এবং নার্সটি লুসি। লুসির চোখে ক্ষণে ক্ষণে জ্বল দেখা যাইতে লাগিল। শত শত আত রোগীর মাঝুনা লুসি, সেই লুসির আজ মাঝুনা নাই। লুসি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল। মনে মনেই বলিল, হারি, হারি, তোমারই জন্ত আমি আজ পিতামাতাকে, দেশকে, ত্যাগ করিয়া অপরিচিত দেশে অপরিচিত লোকজনের মধ্যে বাস করিতে আনিয়াছি—তুমি ফিরিয়া চাও। তোমারই জন্ত আজ আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী—

হঠাৎ লুসির মনে স্বর্গীয় আলো জ্বলিয়া উঠিল। সে সন্ন্যাসিনী এই কথাটি স্মরণ করিতেই তাহার বিবেক তাহাকে কশাঘাত করিল। সন্ন্যাসিনী?—তাহা

হইলে এই মোহ কেন? মায়া কেন? না—ইহাকে প্রশয় দেওয়া চলিবে না। সন্ন্যাসিনী, লুসি সন্ন্যাসিনী। ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। লুসি সন্ন্যাসিনীই হইবে, মায়া, মোহ, আসক্তি মন হইতে দূর করিয়া দিবে। লুসির মনে জোর আসিল, তাহার নয়নকোণে স্বর্গীয় হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল। লুসির চোখে হারিতে আর অন্য রোগীতে কোনো ভেদ রহিল না। সে প্রাণপণে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিল।

আহত সৈনিকদের মধ্যে কেহ মরিল, কেহ আরোগ্য লাভ করিল; হারিও যথাসময়ে আরোগ্য লাভ করিল। প্রথম জ্ঞান হইতেই সে সেবা-রতা লুসিকে দেখিল কিন্তু চিনিতে পারিল না। তাহার পাঁচ বৎসরের স্মৃতি যেন অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। আর, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের হাসপাতালে তাহারই বাল্যসখী লুসি আসিতে পারে ইহা তাহার কল্পনার অতীত। হারি বিশ্বলনেত্রে লুসির দিকে চাহিয়া থাকে। লুসি তাহার দৃষ্টিপথ হইতে নিজেকে সরাইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। কিন্তু কতক্ষণ? কর্তব্য তাহাকে করিতেই হয়—তাহাকে সকলের নিকটেই বাইতে হয়।

হারি লুসিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, তুমি কে? লুসি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, বেশি কথা বলিও না, ঔষধটি খাও। কিন্তু হঠাৎ হারি তাহাকে চিনিতে পারিল। বলিল, তুমি লুসি—তোমাকে চিনিয়াছি। লুসি বলিল, আমি সন্ন্যাসিনী।

হারি নাছোড়; সে তথাপি বলিল, না-না, তুমি লুসি, আমার লুসি।

এখন আর নই, এখন আমি সন্ন্যাসিনী।

হারি আনন্দে প্রাণ বিছানায় উঠিয়া বসিল। তারপর লুসির হাত ধরিয়া বলিল, লুসি, যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে তুমি আমার।

লুসি হাত ছাড়াইয়া লইল। আবার দ্বন্দ্ব! মনের সঙ্গে হৃদয়ের, বিবেকের সঙ্গে প্রবৃত্তির। লুসি নিরপেক্ষ দর্শক। যে জয়লাভ করে, লুসি তাহাকেই আত্মসমর্পণ করিবে। লুসি হারিকে জোর করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। তিন দিন দ্বন্দ্ব চলিল, চতুর্থ দিনে দেখা গেল বিবেকই জয়লাভ করিয়াছে। লুসি স্থির করিল, ভগবানের আদেশে' তাহাকে সন্ন্যাসিনী থাকিতে হইবে, অন্য পথ নাই।

এই চারদিনের মধ্যে হারিও সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে। সন্ধ্যাবেলা হাসপাতালের বাহিরে লুসি ও হারির সাক্ষাৎ হইয়াছে। হারি বলিতেছে, লুসি, লুসি, তুমি আমাকে মৃত্যুর হাত হইতে ফিরাইয়া

আনিয়াছ, আবার কি আমাকে মৃত্যুর পথে ফেলিয়া যাইবে? চল আমরা দেশে ফিরিয়া যাই; আমরা নূতন সংসার পাতিয়া নবজীবনের উদ্বোধন করি।

লুসি নিরুত্তর। তাহার মুখ এতক্ষণ নিচের দিকে ছিল, এখন তাহা আশ্বে আশ্বে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। হারি শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

হারি মাটিতে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাটি খুঁড়িতে লাগিল। তাহার উত্তেজনা চরমে উঠিয়াছে। উত্তেজনায় ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিতেছে না। তবু দুই হাতের মুঠায় খানিকটা করিয়া মাটি প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বল, লুসি, একটা কথা বল।

লুসির মুখ সম্পূর্ণ আকাশের দিকে ফিরিল। অন্ধকার আকাশ হইতে একটা জ্যোতি লুসির মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে স্বর্গের দেবী বলিয়া ভ্রম হইতেছে। কিন্তু হারি এত সহজে পৃথিবীর ধর্ম ছাড়িতে পারে না। সে তাহার ব্যাণ্ডেজ বাধা পা লইয়া দুঃখে এবং ক্ষোভে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর হাতের মুঠা হইতে মাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উত্তেজিত ভাবে হাসপাতালের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

লুসি একই ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সমস্ত দেহ মন ঝিম ঝিম করিতেছে—নড়িবার শক্তিও যেন নাই। হঠাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বপৃথিবী তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

পরদিনই লুসি অসুস্থতার জ্ঞান ছুটির আবেদন করিয়াছে। তাহার দেহ মন ভাঙিয়া পড়িয়াছে—কোনো কাজই সে আর করিতে পারে না, কেবল ভগবানের আদেশে বাচিয়া আছে মাত্র। এই হাসপাতালে থাকিলে যে তাহার আর উদ্ধার নাই ইহাও সে বুঝিয়াছে—মৃত্যু তাহাকে স্থান ত্যাগ করিতেই হইবে। যথাসময়ে ছুটি মঞ্জুর হইল। তাহার স্থানে নূতন নার্স আসিল। লুসি তাহাকে কার্যভার অর্পণ করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার এখনও সকল কাজ শেষ হয় নাই। তাহার ইচ্ছা হইল যাইবার সময় একবার সে হারিকে দেখিবে এবং তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে। মনকে দৃঢ় করিয়া, ভগবানকে বার বার স্মরণ করিয়া সন্ধ্যায় সে হারির নিকট যাইবার জ্ঞান প্রস্তুত হইল। প্রথমে ভাবিয়াছিল, তাহাকে না দেখিয়া যাইবে, কিন্তু বিবেক কিছুতেই তাহা করিতে দিল না।

লুসি বুঝিতে পারিয়াছিল সে যাহা করিতে যাইতেছে তাহা সহজ নহে।

হারির পরিচয় সে জানে। যে তাহাকে সাধ্যসাধনা করিয়া পায় নাই তাহারই নিকট সে বিদায় লইতে যাইতেছে! ইহা হারির পক্ষেও যেমন অসহ, লুসির পক্ষেও তেমনি! কিন্তু তবু লুসি হারির কথা ভুলিয়া নিজের কর্তব্যবোধটাকেই বড় করিয়া দেখিতে চায়। নিজের ক্ষমতার প্রতি তাহার যে একটা অসীম বিশ্বাস ছিল তাহা তো সেদিন ভাঙিয়া গিয়াছে। হারিকে অগ্রাহ করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সে তো স্থির থাকিতে পারে নাই, মাথা ঘুরিয়াছিল, পা কাঁপিয়াছিল, মূর্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তবু লুসি নিজেকে বার বার কঠিন পরীক্ষা করিতে চায়। ইহা তাহার একটি দান্তিকতা।

ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে লুসি হারির নিকট বওনা হইল। কিন্তু সেখানে পৌঁছিবামাত্র তাহার এ কি হইল? মনের জগতে যে একটা প্রচণ্ড প্রলয় ঘটিয়া গেল! ইহার জন্ম তো লুসি আদৌ প্রস্তুত ছিল না। লুসি দেখিল, নূতন নার্স হারিকে চূষন করিতেছে, আর বলিতেছে, প্রিয়তম, তোমারই জন্ম এককাল আমি সন্ন্যাসিনীর মত পথে পথে ঘুরিয়াছি।

হারি লুসিকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, লুসি, এখনও বল—কিন্তু লুসি কিছুই বলিল না, তাহার বিবেক তাহাকে বলিতে দিল না। বলিতে দিল না বটে কিন্তু তাহার হাতের উপর বিবেকের কোনো প্রভাব ছিল না—লুসি বিছাৎবেগে টেবিল হইতে মালিসের ঔষধের শিশিটি লইয়া ঢক ঢক করিয়া খানিকটা বিষ গিলিয়া ফেলিল। হারি বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া লুসি লুসি করিয়া চিৎকার করিতে করিতে তাহার হাত হইতে বিষের শিশিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের মুখে খানিকটা ঢালিয়া দিল।

সমস্ত হাসপাতালময় কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তৎপূর্বেই নূতন নার্স, হারি হারি, বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার হাত হইতে শিশিটি ছিনাইয়া লইয়া বাকী বিষটুকু মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল।

মুহূর্তের মধ্যে কি একটা প্রলয় ঘটিয়া গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ শোচনীয় মৃত্যু কেহ দেখে না, সে জন্ম সকলেই ইহা দেখিয়া ভীত হইল। কিন্তু যথারীতি চেষ্টা সত্ত্বেও উহাদের কেহ বাঁচিল না।

ক্ষণকাল পরেই দেখা গেল, তিনটি প্রেতাত্মা শূন্যপথে চলিতেছে। প্রথম চলিতেছে লুসি। তাহার দুইখানা হাত এবং দৃষ্টি স্বর্গের দিকে, মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছে—ঈশ্বর—ঈশ্বর। লুসির পশ্চাতে চলিতেছে হারি।

তাহার ছইখানা হাত ও দৃষ্টি লুসির দিকে—মুখ হইতে ক্রমাগত লুসি লুসি ধ্বনি বাহির হইতেছে। হারির পশ্চাতে চলিতেছে নূতন নার্স। সে অবিবাহিত হারি হারি করিতেছে। বহুদূরে আব একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখা যাইতেছে, সেটা রবিনসনের।

বলা বাহুল্য রবিনসনের মুখ হইতে কোনো শব্দই বাহির হইতেছে না, এবং বাহুল্য হইলেও বলা প্রয়োজন যে নূতন নার্স আর কেহই নহে, হোটেলের সেই নী।

## সেকাল ও একাল

বারো বছর বয়স হয়ে গেল রহু, কিন্তু পড়াশোনা এখনও মন বসল না। আর বসবেই বা কি ক'রে, বই খুলতে না খুলতেই দূরে ফটকের বাইরে একে একে দেখা যায় বন্ধুদের মাথা, রহু তখনই হঠাৎ বই ফেলে পালিয়ে যায় তাদের সঙ্গে। বুড়ো দাছ তার সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠেন না।

তাই একদিন তিনি ঠিক করলেন রহুকে ভাল ক'রে বোঝাবেন, বলবেন, যে দিনকাল পড়েছে তাতে মর্গ হয়ে থাকলে আর চলবে না। না খেয়ে মরতে হবে যে। তাই পড়াশোনা করা অত্যন্ত দরকার।

কিন্তু এ রকম সামান্য ছ'কথার উপদেশ দিলে কিছুই হবে না, তা তিনি জানতেন। তাই তিনি ভাবলেন, ওকে আজ সেকালের সঙ্গে একালের তফাৎটা কোথায় তা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে।

অবশ্য একদিনে বোঝানো শেষ হবে না, রোজ একটু একটু ক'রে বোঝাবেন।

আগের দিনের লোকের অবস্থা কত ভাল ছিল, লোকে কম পরিশ্রম ক'রে আরামে থাকত, সেই দিনের সঙ্গে আজকের দিনের তুলনাটা যখন ওর মনে গঁথে যাবে, ও তখন হয়তো নিজে থেকেই বুঝতে পারবে পড়াশোনাটা কত দরকার।

সকালেই সেদিন দাছ রহুকে ডাকলেন, বললেন, আয় তো ভাই, একটা কথা শোন।

রহু তখন সামনে বই খুলে বাইরের দিকে কান পেতে আছে কখন বন্ধুদের পায়ে শব্দ শোনা যাবে। দাছর ডাক শুনে বই ছেড়ে আসতে তার ভালই লাগল।

দাছ কি ভাবে যে কথাটা আরম্ভ করবেন ভেবে পেলেন না। বড় শক্ত কাজ। বহু কৌশলে একটু একটু ক'রে বলতে হবে। তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন কি স্নেহের দিনই না ছিল আমাদের—

রহু কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল তার দাছর মুখের দিকে।

দাছ বলতে লাগলেন, কি দিন ছিল রে এদেশে! চাল ছিল এক টাকা

মণ—এক টাকায় কি না চল্লিশ সের! আর সে কি চাল! বাগ্নাঘবে ভাত রাখা হচ্ছে, সমস্ত বাড়ি হুগড়ে ভরে উঠেছে!

—মাসে মাত্র তিন টাকার চাল, তাইতেই আমাদের বাড়িস্বত্ব লোকের চলে যেত, আমরা তো পেট ভরে খেতামই, কত যে অতিথি আর আত্মীয়-কুটুম খেত তার সংখ্যা নেই।

—আর শুধুই কি চাল? সব জিনিসেরই ছিল মাটির দর। একটা পরিবারের জন্য মাসে পাঁচটি টাকায় বেশি খরচ করতে পারতাম না।

বলতে বলতে দাদুর আবেগ বেড়ে গেল, যেন তিনি তাঁর চোখের সামনে তাঁর ছেলেবেলার সমস্ত ছবিখানি দেখতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, পদ্মানদীর ধারে ছিল বাড়ি, ভাবতে পারিস্ যে আটটি ইলিশ মাছও কিনেছি এক পয়সায়? সে কি ছড়াছড়ি মাছের! আমরা তো বর্ষাকালে মাছের শুধু ডিম পেতাম মাছ ফেলে দিয়ে। আর তরকারী? বাজারে গিয়ে আধ পয়সার বেগুন পটল লঙ্কা কিনলে বয়ে নেবার জন্য লোক ডাকতে হত। পয়সায় পাঁচটি লাউ, দুটো কুমড়া, তিন সের বেগুন, পাঁচ সের লঙ্কা! খরচ করব কিসে? দুধ এক পয়সায় দুইসের, বসগোল্লার সের তিন আনা। কাগ্না পায় ভাই সে-দিনের কথা মনে হলে।—বলতে বলতে দাদুর গলাটা ধরে এলো, তাঁর চোখ দুটি ছলছল ক'রে উঠল। বহুও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

দাদু খুব খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার দুঃখটা তা হ'লে তুই বুঝতে পেরেছিস্ রে ভাই?

তোমার কথা ভাবছি না দাদু!— বলে বহু আরও একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

দাদু বেদনার সুরে বললেন, তবে?

বহু বলল, ভাবছি আমাদের সেকালের কথা।

—সে কি রে? তোদের আবার সেকাল?

—হাঁ দাদু, যুদ্ধের আগে। সে কি কালটাই ছিল আমাদের! চাল ছিল চার টাকা মণ, মাছ ছিল ছ'আনা সের, মাংস দশ আনা, দুধ চার আনা! তরিতরকারী কত সস্তা ছিল, দাদু! আর কাপড়? দু'টাকা এক জোড়া ধুতি, আড়াই টাকা শাড়ী। ওঃ, সে কি সুখের কালটাই না ছিল!

বলতে বলতে বহুর গলাটা ধরে এলো, তার চোখে জল দেখা দিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, আর আজ মাছ পাঁচ টাকা সের, মাংস তিন টাকা, চাল পঁচিশ টাকা মণ!

দুই হাতে চোখ ঢেকে রত্ন কাঁদতে লাগল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে চোখ দুটি তার ফটকের দিকে ফেরানো। ইতিমধ্যে সেদিকে দু-একজন বন্ধুর মাথা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একে একে।

বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত দাছ রত্নর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, যা খেলতে যা, তোকে বোধ হয় ওরা ডাকছে।

রত্ন চোখ মুছে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল ফটকের পথে।



## নতুন দাওয়াই

সেলুন গাড়ি ।

ক্ষণবিলাসের রাজকীয় আয়োজন ।

দিনে আরাম ক'রে বসে এবং রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাক, হৈ হলা নেই, দমবন্ধ করা ভিড় নেই, অভিজাত সুলভ চাপা সুরে সংক্ষিপ্ত কথা ভিন্ন অন্য কোন শব্দ নেই ।

দিনে কোমল আসনে বসে যাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা । চপ ক'রে বসে থাক বাইরের বিপরীতগামী ছুটন্ত দৃশ্যের প্রতি । চোখ খোলা রইবে, কিন্তু মন পড়বে ঘুমিয়ে । মনে স্বপ্ন জেগে উঠবে একের পর এক, দৃষ্টি রইবে উদাস । রাত্রে প্রশস্ত কোমল বিছানায় ঘুমিয়ে পড়বে স্বপ্নহীন গভীর ঘুম ।...

সেলুন গাড়ি ছুটে চলেছে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ।

সেই গাড়ির মধ্যে অগ্নাঙ্ক যাত্রীর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে এক অভিজাত দম্পতি, পাশাপাশি বসে । স্বামীটি খুবই স্বাস্থ্যবান, বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে । প্রকৃতি বড়ই গভীর, স্ত্রীটি আশ্চর্য সুন্দরী ।

অভিজাত ইংরেজ মহিলা ও তাঁর স্বামী । মল কাহিনীটিও ইংরেজী ।

স্বামী স্ত্রীর বিপরীত দিকের আসনে বসে এক যুবক । দেখলে মনে হয় যেন কোনো লর্ড বংশের বিলাসী পুত্র । চেহায়ায় যেমন অভিজাত্য, পোষাকে তেমনি জাঁক--বয়স ত্রিশের বেশি হবে না ।

কিন্তু মহিলাটির মৌন্দয তাকেও যেন স্নান ক'রে দিয়েছে ।

গাড়ি ছুটে চলেছে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে । কারো মুখে কথা নেই ।

মহিলার স্বামী যুবককে একটুখানি লক্ষ্য করলেন, তারপর তাঁর হাতের কাগজখানা তাকে দিয়ে বললেন "পড়ুন না এইখানা, উত্তেজক সব খবর আছে এতে ।"

যুবকটি একটু চমকিত হয়ে ধন্যবাদ সহ কাগজখানা নিয়ে পড়তে লাগল ।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল । পাঠান্তে যুবক কাগজখানা ফিরিয়ে দিতেই স্বামীভদ্রলোক পুনরায় তাকে একখানা জনপ্রিয় মাসিকপত্র দিয়ে বললেন, "ওটা শেষ হয়েছে তো এইবার এইখানা পড়ুন ।"

যুবক মাসিকপত্রখানা মনোযোগের সঙ্গে উন্টে পাণ্টে দেখল ঘণ্টাখানেক ধরে । ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন বই দেখা তার শেষ হয়েছে । তখন তিনি

একটি মূল্যবান চুরুট দিগেন তাকে, দিয়ে বললেন, “অতি দুর্লভ হাভানা, আপনার ভাল লাগবে।”

ধন্যবাদ দিয়ে যুবকটি সিগার গ্রহণ করল এবং ধূমপানের কামবায় উঠে গেল।

প্রায় একঘণ্টা পরে ফিরে এল যুবক। কিন্তু আসামাত্র ভদ্রলোক একখানা ছোট্ট উপন্যাস তার হাতে দিয়ে বললেন, “এবারে এইখানা পড়ুন, অদ্ভুত ভাল বই। নতুন বেরিয়েছে, লেখক জনপ্রিয়, পড়তে শুরু করলে শেষ না ক’রে পারবেন না।”

যুবক পড়তে আরম্ভ করল সেই উপন্যাস। সত্যিই খুব ভাল, একঘণ্টার মধ্যে বই শেষ হয়ে গেল।

শেষ হতেই ভদ্রলোক বললেন “আরও একটি হাভানা নিননা, ভাল জিনিস সব সময়েই ভাল লাগে।”

যুবকটি বলল, “না, ধন্যবাদ, আর আমার সময় নেই, এইবার নামতে হবে আমাকে—এই পরবর্তী স্টেশনেই। আপনাকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই।”

“না না ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই, don't mention it.”

যুবক এতক্ষণে মনখুলে কথা বলার স্ফুর্গ পেল। এতক্ষণ সে ভদ্রলোকের ব্যবহারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তার কেবলই সন্দেহ হচ্ছিল ভদ্রলোক তাকে নিশ্চয়ই চেনেন, নইলে এত খাতির করবেন কেন। তাই সে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, “আপনি কি আমাকে চেনেন?—কিছু মনে করবেন না আমার এই কৌতূহলের জন্ত—হয়তো আগে আমাকে দেখে থাকবেন কোথায়ও?”

ভদ্রলোক বললেন “না, আপনাকে কখনো দেখিনি, চিনিও না।”

“আমার নাম জানেন?”

“না।”

“তাহলে দয়া ক’রে বলবেন আমার প্রতি আপনার এই স্নেহ এবং সৌজন্য কেন, আমাকে না জেনে আমাকে এত খাতির করলেন কেন, আমি তো এমন কোথায়ও দেখিনি। আপনাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না, আমার মনে হয় আপনি একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ, মহদয় এবং স্নেহপ্রবণ। আভিভাত্য আপনার মনের ধর্ম, আপনার কথা আমি আজীবন মনে রাখব, আপনাকে আমি আদর্শ মানুষ বলে উল্লেখ করব সবার কাছে, যদি দয়া ক’রে আপনার পরিচয়টা আমাকে দেন।”

ভদ্রলোক এই প্রশংসা বর্ষণে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন—

“যুবক, আমার এ ব্যবহারের কারণ আমি খুলে বলছি। ইতিপূর্বে যে সব ‘লোফার’কে আমার স্ত্রীর মুখের দিকে ইঁক’রে চেয়ে থাকতে দেখেছি তাদের সহ করেছি বড়জোর একঘণ্টা, তারপর উঠে তাদের ঘাড় মটকেছি। ফলে অনেক হান্ধামা হয়েছে, খরচও হয়েছে অনেক। তাই আমি ভোল এবং ভক্তি বদলেছি। এখন আমি সেই সব ‘লোফার’কে ঘুষ দেবার জন্তু ভাল ভাল বই আর সিগার সঙ্গে রাখি। তুমি যদি আরও ণ’ খানেক মাইল আমাদের সঙ্গে যেতে, আমি তোমাকে ব্র্যাণ্ডি দিতাম, নতুন ক্রসওয়ার্ড ধাঁধা দিতাম, আরও দুখানা নতুন কাগজ দিতাম, আমার স্ত্রীও নিশ্চিতভাবে বসে থাকতে পারত।”

“কিন্তু—কিন্তু—আমি—”

“ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে ঘাড় ধরে গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়ার চেয়ে এ অনেক শস্তা, হান্ধামা কম। আশা করি নিবিড় বাডি পৌছে যাবে, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি বড়ই খুশি হয়েছি, আচ্ছা গাড়ি এবারে থেমেছে, বিদায়।”

## আগন্তুকের ডায়ারি

শ্রাব ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৪৯, রবিবার। স্বর্গের একখানা দৈনিকের রিপোর্টার আমি। দুদিনের জ্ঞান কলকাতা এসেছি। এখানে এসে প্রথমেই চোখে পড়ল মিকি মাইল দীর্ঘ বিভিন্ন বয়সের এক মাল্টিবেব সারি। এ বিষয়ে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, শুধু স্বর্গের এক সংবাদপত্রে পড়েছিলাম কলকাতা শহরে চিনি দুপ্রাপ্য, সে জ্ঞান ক্রেতার তাদের নির্দিষ্ট চিনির বরাদ্দ এইভাবে দাঁড়িয়ে কিনতে বাধ্য হচ্ছে। চিনি সম্পর্কে আমার নিজের বিতৃষ্ণা, আমি স্বর্গ থেকে এসেছি— সেখানে সবই মধুর, সবই চিনির স্বাদ। তাই আমি এখানে চিনি সম্পর্কে সাক্ষাৎ কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হতে পারিনি। কিন্তু এত বড় দীর্ঘ সারির পাশ দিয়ে যাব অথচ পাশ কাটিয়ে যাব, কথাটা ভাবতে নিজেকে কাঁচ খারাপ লাগল, তাই একটু এগিয়ে গেলাম। উক্ত সারির একটা জায়গায় একটা পনেরো-ষোল বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখি বাইরের এক প্রোট ভদ্রলোক তার সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক করছেন। সমস্ত নীরব সারিটার মধ্যে ঐ একটুমাত্র স্থানেই কিছু কথা চলছে দেখে ঐখানেই এগিয়ে গেলাম, কিন্তু ওদের তর্কের কথাগুলো শুনে কেমন যেন সন্দেহ হল যে ওটা তাহলে চিনির লাইন নয়। কথা যেটুকু শুনেছিলাম তা এই :

প্রোট ব্যক্তি : তোকে এত ক'রে বললাম চিনি নেই, চিনির লাইনে দাঁড়াগে যা, আর তুই এসে দাঁড়িয়েছিস সিনেমার লাইনে ? হতভাগা ছেলে— বেবো ওখান থেকে।

বালক : চিনির লাইনে অতক্ষণ আমি দাঁড়াতে পারব না।

প্রোট ব্যক্তি : আমার নবাব পুত্রুর, এখানে তিন ঘণ্টা দাঁড়াতে পারেন— কাজের বেলা পা ব্যথা করে।

বিষয়টা নিতান্তই ব্যক্তিগত মনে হওয়াতে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আমার অনায়াস মনে হল, আমি দ্রুতবেগে সেখান থেকে সরে গিয়ে দূর থেকে তর্কের ফলাফল লক্ষ্য করতে লাগলাম। ওদের কোনো কথা আমার কানে গেল না, কিন্তু পরিণামটা চোখে দেখা গেল। দেখলাম, ছেলে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই রইল, প্রোট ভদ্রলোক উত্তেজিতভাবে সেখান থেকে চলে গেলেন।

লাইনের অপর প্রান্তের দিকে চেয়ে দেখলাম সিনেমাই বটে। সিনেমার আকর্ষণ তা হলে চিনির আকর্ষণের চেয়ে বেশি। ছেলেটির সঙ্গে এ বিষয়ে

কিছু আলাপ করার বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। আবার এগিয়ে গেলাম তার কাছে।

ছেলেটি দেখতে রোগা এবং কালো। মুহূর্ত আগে সে গাল খেয়েছে, কিন্তু চোখে-মুখে কিছুমাত্র উত্তেজনার ভাব নেই। দৃষ্টি ইতিমধ্যেই প্রশান্ত হয়েছে।

আমি ছেলেটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “যে সিনেমা ছবিটি দেখতে যাচ্ছ সেটি নিশ্চয় খুব ভাল?”

ছেলেটি এ প্রশ্নে অবাক হয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বলল, “জানি না, আগে দেখিনি।” উদ্ধত সংক্ষিপ্ত ভাব।

আমিও সর্বিস্ময়ে বললাম “ভাল কি না, না ছেনেই যাচ্ছ?”

আমার কথায় হঠাৎ যেন ছেলেটির চোখ দুটি উন্মাদের মতো লাল হয়ে উঠল, কস ক’বে সে ডানহাতের আগুন গুটিয়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, “কি বললেন? ভাল মন্দ না ছেনে যাই কেন?”

আমি গুর উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করে দু-পা পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছেলেটি বেশ চড়া গলায় বলতে লাগল “যাই, কারণ আমরা তরুণ, আমরা দিনক্ষণ মানি না, আমরা উদ্ভাস, আমরা দুর্বীর, দুঃসাহসী, দুর্মদ, দুর্ধর্ষ, আমরা হাউইয়ের মতো আগুন ছুঁতে চুঁতে আকাশে উড়ে যাই, আমরা কুমকেতু, আমরা”-

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, “থাক।” এবং দ্রুত পা চালিয়ে সেখান থেকে সরে একজন বয়স্ক লোকের কাছে গেলাম। বস্তুত সিনেমা সম্পর্কে আমার কৌতূহল একেই অদম্য হয়ে উঠেছিল। যার কাছে গেলাম তাঁকে বেশ সম্ভ্রান্ত এবং পরিণত বৃদ্ধি বলে মনে হল। স্মরণ্য অনেকটা নির্ভয়ে তাঁকেও সেই পুরনো প্রশ্নটিই জিজ্ঞাসা করলাম, “ছবিটা নিশ্চয় ভাল?”

ভদ্রলোক এতক্ষণ উদ্ভাস দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে ছিলেন, আমার প্রশ্নে চমকে উঠে আমার দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, আমিও যথারীতি দু-পা পিছিয়ে যাবার উপক্রম করতেই ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে ভয় কেটে গেল, কারণ কণ্ঠস্বরে উন্মাদের লক্ষণ ছিল না। আমাকে সহাস্ত্র স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন “শহরে নতুন বৃদ্ধি?”

আমি বিনীতভাবে বললাম, “সম্পূর্ণ নতুন।”

“তাই বলুন! শহরের বাসিন্দা হলে এ কথা জিজ্ঞাসা করতেন না। কারণ সিনেমা ভাল কি মন্দ এ প্রশ্ন আমাদের কাছে অবাস্তব।”

আমি বললাম “কিছু আগে একটা বালকও অনেকটা সেই রকমই বলছিল।”

ভদ্রলোক সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, “আগে আমাদের এই কিউ-এর দৈর্ঘ্যটা দেখুন ”

‘কিউ’ অর্থাৎ সেই দীর্ঘ মানব সারির দৈর্ঘ্যটা আর একবার ভাল ক’রে দেখলাম। এতক্ষণ সেটি আকারে আরও বেড়ে গেছে, পিছন দিকটা ঘুরে একটা গলির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছে তাই মোট কতটা দীর্ঘ হয়েছে আর বোঝা গেল না।

ভদ্রলোক বললেন, “আধ মাইল হবে। এই মানব সারিকে সিনেমা ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে অন্তত তিন ঘণ্টা লাগবে।”

“ভাল লাগে এ রকম দাঁড়ানো?”

“বলেন কি! এই হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ—এইখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়ানো।”

আমি এর মধ্যে আকর্ষণ ঠিক কোথায় তা বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক সেটি হৃদয়ঙ্গম ক’রে বলতে লাগলেন, “সিনেমা হচ্ছে দিনের সকল কাজের শেষে, সকল কর্তব্যের বোঝামুক্ত অবসরের মুক্তি। এই মুক্তি আমাদের শুরু হয় এইখানে কোনরকমে একটি স্থান পাবার পর থেকেই। মুক্তি যে সময় থেকে ঠিক শুরু হয়, সেই সময় থেকেই কি তা উপভোগ্য হয়ে ওঠে না?”

“কথাটা ঠিক, কিন্তু তবু কোথায় ঘেন একটু ধাঁধা থেকে যাচ্ছে, আরও একটু বুঝিয়ে বলুন।”

ভদ্রলোক বেশ খুশিভাবেই বলতে লাগলেন “কথাটা অত্যন্ত সহজ। সিনেমা হচ্ছে লক্ষ্য, আর এই কিউ হচ্ছে সেই লক্ষ্যে যাবার পথ। শাস্ত্রে আছে যত যত তত পথ, কিন্তু এই নীতি সিনেমায় সম্পূর্ণ খাটে না, বিশেষ ক’রে মধ্যকিত্তদের বেলায়। এখানে যত যতই থাক, পথ এই একটিই—এই দশ আনার পথ। দেখুন না কেন, আমি এপিডেমিক ড্রপসির রুগী, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে আমার পা ফুলে যায়, কিন্তু তবু এই পথ আমার ছাড়বার উপায় নেই। শুধু যে আমি ছাড়তে পারি না তাই নয়, এই মাইল-দীর্ঘ কিউতে যত লোক আছে সবাই নাছোড়।”

“আপনি অল্প সবাইকে অস্থিরের কথা বলে কিছু আগে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো আপনার স্থবিধা হতে পারে।”

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন, “দান্না বেধে যাবে প্রস্তাব শুনলে। আমার

পা ফুলেছে, শুধু এই কৈফিয়তে পথ সংক্ষেপ করা চলবে না। এখানে ছোট-বড় সবল-দুর্বল সবাই এক, এখানে কেউ কারো চেয়ে ছোটও নয়, বড়ও নয়। ঐ দেখুন, মাঝে মাঝে দু'একটি স্থান খালি পড়ে আছে, কিন্তু আসলে খালি নয়। ঐ সব শূন্য স্থানে শুধু এক জোড়া ক'রে জুতো? কিন্তু এ পথের এমনই নিয়ম যে ঐ জুতো সরিয়েও সেখানে অন্য কেউ দাঁড়াতে পারে না।”

জুতোর মালিক কোথায় ভাবছি এমন সময় ভদ্রলোক বললেন “কেউ হয়তো বাড়িতে খেতে গেছে, ছেলের কারো হয়তো প্রাইভেট টিউটর বাড়িতে এসে গেছে, তাই জুতো দিয়ে জায়গার দখল চিরু একে বেরিয়ে গেছে লাইন থেকে। ওদের কাজ শেষ হলে ফিরে এসে আবার ঐ সব জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবে। ওদের অনুপস্থিতকালে জুতোই হচ্ছে ওদের প্রতিনিধি।”

আমি বললাম, “কিন্তু আপনাদের মুক্তি এইখান থেকে শুরু হলেও এর মধ্যে আনন্দ তো কিছু দেখছি না।”

ভদ্রলোক হেসে বললেন, “না দেখাই স্বাভাবিক, কারণ কিউতে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা আপনার নেই। কিন্তু আমরা এইখানে দাঁড়িয়ে চলমান সংসারের রূপ ভাল ক'রে দেখতে পাই। এইখানে দাঁড়িয়ে আমরা নিজেদের ছবি দেখি। আমরা যখন নিজেরা চলি, তখন অন্যদের চলা আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু একবার এই কিউতে এসে দাঁড়ালে সব দৃশ্য বদলে যায়। এখানে চলমান মানুষের রূপ দেখি। হাজার হাজার লোক ছুটে চলেছে বিচিত্র লক্ষ্য পথে। এক একপাশা ট্রাম ও বাস বোঝাই হয়ে চলেছে শত শত মানুষের স্বথ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সাধু বুদ্ধি দুঃস্থ বুদ্ধি। কেউ খেমে নেই, সবাই চলেছে। বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত এই পথে। কেউ উদাসীন ভাবে চলেছে, তার হয়তো এ সংসারে আশা করবার কিছু নেই, কেউ চলেছে গর্বিত পায়ে মচ্ছলতার ছাপ সর্বান্তে ফুটিয়ে, এই পথে এই মধ্যবিত্ত পাড়ার পথে সে বড়, হয়তো চলতে চলতে অভিজ্ঞত পল্লীতে গিয়ে সে নিজেকে হীন মনে করতে থাকবে। কিন্তু থাক এ সব কথা, এ সব আমাদের মনের চোখে দেখা ছবি, আপনি হয়তো এর রস গ্রহণ করতে পারবেন না।

আমি বললাম, “হয় তো তাই, কিন্তু আপনি আপনার নিজের দেখাকে সবার দেখা বলছেন কেন? সব সময়েই আপনি ‘আমরা’ বহু বচনটি ব্যবহার করছেন, কিন্তু মতাই কি এই কিউতে যত লোক দাঁড়িয়েছে তারা সবাই আপনার মতো দেখতে পায়?”

ভদ্রলোক উদাসীনভাবে জবাব দিলেন, “কি জানি, সবাই হয় তো এক রকম দেখে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস কিছু একটা আনন্দ তারাও এখানে পায়।”

আমি বললাম, “আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না, শুধু একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করব। আপনি বহু অসুবিধা ভোগ করছেন দৈহিক, স্মৃতরাং দৈহিক ক্লাস্তিও আপনার হচ্ছে। আবার মনের দৃষ্টি সব সময় জাগ্রত থাকায় মনও কিছু ক্লাস্ত হচ্ছে। স্মৃতরাং দৈহিক এবং মানসিক এতটা ক্লাস্তি ভোগ করার পরে সিনেমা ঘরে গিয়ে যদি দেখেন ছবিটি খারাপ, তা হ’লে কি সব পরিশ্রমটাই ব্যর্থ মনে হয় না?”

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, “কথাটা অন্তায় বলেন নি, কিন্তু আমার এবং আমার মতো আর সবার সম্পর্কে এ প্রশ্ন অবাস্তব।”

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম “কেন?”

ভদ্রলোক বললেন, “লক্ষ্যে পৌঁছে আমরা তো সিনেমা দেখি না—আমরা আসনে বসেই ঘুমিয়ে পড়ি।”

আমি বিদায় নিয়ে কিউ বরাবর চলতে লাগলাম, কোতূহল ছিল, শেষ প্রান্তটি গলির মধ্যে কতদূর বিস্তারলাভ করেছে তাই দেখব। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই থেমে যেতে হল। কিউতে দণ্ডায়মান এক ভদ্রলোক তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান এক তরুণ যুবককে গড় গড় ক’রে কি যেন বলে যাচ্ছেন। যুবকটি তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে (কিউতে যেমন থাকে) তার হাতে একখানা নোট বই ও পেন্সিল, আর ভদ্রলোকের একখানা মোটা বই।

ভদ্রলোক যুবকটিকে বলে যাচ্ছেন আর সে পেন্সিল দিয়ে খাতায় কিছু কিছু লিখে নিচ্ছে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার কোতূহল অদম্য হয়ে উঠল, আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, “আমাকে মাফ করবেন, আমি বিদেশী, আমি আপনার এই আলোচনা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম, কিন্তু সিনেমার কিউতে রাষ্ট্র-নীতির এমন সুন্দর আলোচনাটা একটু ব্যর্থ হচ্ছে না কি?”

ভদ্রলোক আমার দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, “আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার সম্মুখে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে সে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, আর আমি সেই কলেজের প্রোফেসর, মিডিক্স পড়াই। কিন্তু সেটাই সব কথা নয়, আমি গুর প্রাইভেট টিউটরও বটে। অথচ আমাদের দুজনেরই সিনেমা দেখার ঝোঁক খুব বেশি। তাই আমরা পরস্পর এই ব্যবস্থা করেছি যে, যে দিন আমরা সিনেমায় যাব সেই দিনের পড়াটা কিউতে দাঁড়িয়েই শেষ করব। এখানে সুবিধাও বেশি, কারণ বহু সময় এখানে নষ্ট হয় অকারণ, সেই সময়টা আমরা এই ভাবে কাজে লাগাই। কিন্তু সবাই যদি এভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করত, বিনা কাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে না থাকত, তা



হলে শত শত লোকের তিন-চার ঘণ্টার কাজ যোগ হয়ে সেটা জাতীয় লাভে পরিণত হত সহজেই। এ বিষয়ে মেয়েরা অনেক উন্নত। ধরুন সিনেমার জগৎ যদি মেয়েদের কিউ হত, তা হলে দেখতেন সেখানে তারা প্রত্যেকেই হয় উল বুনছে, কিংবা ক্রমাল তৈরি করছে, কিংবা জামা সেলাই করছে। আমি মশায় অর্থনৈতির ছাত্র, তাই এভাবে ম্যান-পাওয়ার এবং ম্যান-আওয়ার নষ্ট হতে দেখলে আমার গা জ্বালা করে।”

আমি বললাম, “কিন্তু সিনেমায় দু তিন ঘণ্টা বসে থাকার কি সময় নষ্ট নয়?”

ভদ্রলোক বললেন, “না। কারণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ঐখানে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিই।”

“আপনিও ঘুমোন?”

“বয়স্ক লোক মাঝেই ঘুমোয়। পরিণত বুদ্ধি যাদের, তাদের জাগিয়ে রাখবার মতো সিনেমা ছবি তৈরি হতে এখনো অনেক দেরি আছে।”

প্রোফেসরের কথা শুনে খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হল। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিলাম এবং কিউ অক্ষুণ্ণ ক’রে অল্পক্ষণের মাধ্যমে গলিতে গিয়ে প্রবেশ করলাম। কিন্তু এখানে দেখলাম একটি অতি বেদনাময় দৃশ্য। আমি ইতিমধ্যেই শহরের হালচাল সম্পর্কে এতটা বিজ্ঞতা লাভ করেছি যে, দৃশ্যটি দেখেই এখানে তাৎসম্য অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখলাম একটি উজ্জ্বল পোশাক পরা বারো-তেরো বছরের ছেলে কিউতে দাঁড়িয়ে আছে আর তার পাশে কিউ-এর বাইরে এক চশমা পরা বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে তাকে পড়াচ্ছেন। ধনীরা ছেলে পয়সা চুরি করে সিনেমা দেখতে এসেছে, কিন্তু দরিদ্র শিক্ষক, পাছে চাকরিটি যায় সেই ভয়ে, সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে কিউতে দণ্ডায়মান ছেলেকে যথা সময়ে পড়াতে এসেছেন। সিনেমায় গিয়ে ঘুমোনার মতো তাঁর পয়সা নেই, চেহারা দেখে মনে হল অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ঘুমোবেন, এবং সিনেমার বাইরেই।

লেখকের অন্যান্য বই

ট্রামের সেই লোকটি  
ব্র্যাক মার্কেট

ঘুঘু  
ডিটেকটিভ শিবনাথ

মারকে লেঙ্গে  
দুঃস্বপ্নের বিচার  
আধুনিক আলোকচিত্রণ